প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৫
অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রকাশক :
এস. দত্ত
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
দেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৫৭/২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

"জগতে আজ পর্য্যন্ত অতিবড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয় প্রকাশমান হয়।"—আত্মপরিচয়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ-ক্রোড়ে যে শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাঁহার ললাটে যে-কোন অল্পগণিতজ্ঞ বিধাতা-পুরুষ বিশেষ গণনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও, অতিনির্ভাবনায় অন্ততঃ এইটুকু লিখিয়া যাইতে পারিতেন—কালক্রমে এই শিশুর অনেক কিছু হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়: বিদ্যালয়ে না গেলেও বা বিদ্যালয় হইতে পালাইলেও বিদ্যার অভাব ইহার ঘটিবে না—বিদ্যাকে ছাড়িতে চেষ্টা করিলেও বিদ্যা ইহাকে ছাড়িবে না, আইন পড়িয়া ব্যারিস্টারের স্বাধীন ব্যবসায়ে মন না দিলে, অথবা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়-অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজসেবায় দেহমন সমর্পণ না করিলে, অথবা পিতৃদেবের বৈরাগ্য সংক্রামিত হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অকালে গৃহত্যাগ না করাইলে, শিশুটী কেবলমাত্র জমিদার হইয়া জীবন-যাপন করিতে পারিবে না,—ললিতকলার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিবেই এবং বড় একটা কিছু সৃষ্টি করিতে না পারিলেও অন্ততঃ 'তত্ত্ববোধিনী'র মত কোন একটা পত্রিকার সম্পাদক হইয়া

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হইয়া উঠিবে। বাস্তবিক, বিনা গণনাতেই রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য সম্বন্ধে এই ধরণের একটা অনুমান করা, যে কোনও জ্যোতিষীর পক্ষে সম্ভব ছিল এবং নিম্নলিখিত কারণেই সম্ভব ছিল।

তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই-ই বাঁধা এবং আশ্চর্য্যকর উভয়ের সম্প্রীতি। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু যে একজন বড় জমিদার ছিলেন তাহাই নহে, একদিকে ব্রহ্মধর্ম্মের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় পুরুষ,—ব্রহ্মের ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার শ্রীতে তাঁহার অন্তরাত্মা ছিল বিমণ্ডিত, অন্যদিকে তিনি ছিলেন সর্ব্ববিধ সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক—জ্ঞানে ও কর্ম্মে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার মহাব্রতে সুদীক্ষিত ব্রতচারী। অধিকন্তু তিনি ছিলেন—"প্রিন্স" দ্বারকানাথের পুত্র, সেই ঐতিহ্যের ধারাক্রমে তাঁহার পুত্ররা (দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতি) প্রতীচ্য মানস-অঙ্গনেই লালিত-পালিত। তাহার পরিবারের বহিরঙ্গনে প্রতীচ্য পরিবেশ। সত্যই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষের এক অদ্ভুত সমন্বয় এবং "যস্মিন জীবতি বহবো জীবন্তি" সেই ধরণের এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব।

ধর্ম্মান্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এই ঠাকুর পরিবার, সামাজিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক এই পরিবার, শিল্প সাধনার সাধনপীঠ এই পরিবার, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের "জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনীর" সাগর-সঙ্গম এই পরিবার—এক কথায় জ্ঞানের, ভাবের ও কর্ম্মের এক মহা-প্রেরণাক্ষেত্র এই পরিবার। —এই প্রেরণাময় পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম—রবীন্দ্রনাথের দেহ-মনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি।

এই পরিবেশের প্রভাবে—বাল্যকালীন দেহ-মনের অভ্যাস-অনুশীলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের সাধারণসত্তার পরিচয় রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন—'সেই সকল কাব্যই কবির

প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটীকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা—

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছে যেথায় সেথা সে নাহিরে।

...   .

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবন-চরিতে ?

কিন্তু জীবন-চরিতকে সূক্ষ্মদর্শী বিশ্লেষণালোকের রশ্মি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কবিকে একাধারে খুঁজিয়া না পাওয়া যায় এমন নহে। একথা যদি আপাততঃ স্বীকার করাও যায় যে "কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়"—তবুও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে প্রকাশ-ব্যাপারটী নিরাশ্রয়-নিরালম্ব নহে—প্রকাশের উপাদান ও আকার বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ। এই সাপেক্ষতার প্রকৃত পরিচয়ের মধ্যেই ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতিতে তাঁহার শৈশব এবং বাল্য শিক্ষাভ্যাসের প্রভাব,—এক কথায় বলা চলে—অসামান্য এবং অপরিহার্য্যরূপে উল্লেখযোগ্য। এই শৈশব এবং বাল্যপরিবেশের সাধারণ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের

নিজের কথায় দেওয়া যাক্—

(ক) "সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই''—যদিও "আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ীর ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই চালচলনেও।" (খ) "আমাদের বাড়িতে আর একটা সমাবেশ হইয়াছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগে ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায়ই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।" (গ) "অন্যদিগে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরাজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ীর হাওয়া শেক্সপীয়রের নাট্যরস সম্ভোগে আন্দোলিত, স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল!" (ঘ) সন্ধ্যা বেলায় জলতো তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসার কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক নীরব নিশ্চল।" (ঙ) "আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে আকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল…" (চ) "ইতিপূর্ব্বেই কোন একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ মেলানো মিলকরা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে।……পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম।……এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পেছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটী বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে।" (আত্মপরিচয়) (ছ) "আমার অতি বাল্যকালেই মা মারা গিয়াছিলেন—তখন বোধহয় আমার বয়স ১১।১২

বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ড্যালহৌসী পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে যান।......... সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজী ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতাম এবং মুখে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র পরিচয়ে অনেক সময় কাটিত। এই যে স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তিনমাস স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছিলাম, ইহাতেই ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।" (শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র) (জ) তারপর "ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি (গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) কোনমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জ্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন।" (ঝ) "গান গাহিতে··· কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না, তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা তাহার শতকরা বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে।"*

উল্লিখিত বিষয় কয়টি চোখের উপর থাকিলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উৎস-পরিচয় স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাইবে। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত এবং ইংরেজী সাহিত্যের শব্দসম্ভারের তথা প্রকাশক্ষমতার উপর অধিকার এবং ধ্বনিতরঙ্গের বা ছন্দের সহিত হৃদয়ের

* "এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল।" (রবীন্দ্রনাথ কেন "গীতিকবি" হইয়াছিলেন সেই "কেন" এখানে পাওয়া যায়।)

যোগের ফলে ছন্দসংস্কার, বাল্যকালেই কাব্য-রচনার প্রেরণা এবং কল্পনা-প্রবণতা---এক কথায় ভাবুকতা, বিশ্বের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের চেতনা—সমগ্র বিশ্বসত্তার সহিত নিজের অন্তরঙ্গ যোগের উপলব্ধি -এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণ দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথের শৈশব শিক্ষাভ্যাসের মধ্যেই— বাল্যকালের অবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে।

এই অবস্থাগুলির প্রভাবের অথাৎ নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক পটভূমি হইতে রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেখিলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জন্মভূমি অলৌকিক জগতে নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উপাদান সম্পূর্ণই ইহলৌকিক এবং প্রতিভাব উন্মেষ ঘটিয়াছে লৌকিক কার্যকারণতত্ত্বের নিয়ন্ত্রণাধীনেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় লইলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা কল্পনা বিষয়, এক কথায় তাঁহার সাহিত্যের বিষয় (Content) এবং আকার (Form) অলৌকিক প্রেরণার ফল নহে এবং তাঁহার রচনার কালক্রমিক বিকাশও বাহ্য পরিবেষ্টনীর আকর্ষণের ফলেই প্রধানতঃ ঘটিযাছে। নিম্নলিখিত পত্রখানি (শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র—আত্মপরিচয় উদ্ধৃত) পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে কবিকেও অবস্থার দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে—"আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। বাল্যকালে ইস্কুল পালাইয়াই কাটাইয়াছি, নিতান্তই লেখার বাতিক ছিল বলিয়া শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি। যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী পত্রিকা বাহির হয়। প্রধানতঃ এই পত্রিকাতেই আমার গদ্য লেখা অভ্যস্ত হয়। আমার ১৭ বছর বয়সে মেজ দাদার সঙ্গে বিলাত যাই—এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপক হেনরী মর্লির ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য চর্চা করিয়াছিলাম··· · সোনার তরীর কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ

তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল। এই সময়েই বিষয়কর্ম্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্ব্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত এইখানেই। ছয় সপ্তাহ কাল লিখিয়াছিলাম. সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে একবৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম. এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিত হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। তরুণ বয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম, ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।…ইতি ২৮ শে ভাদ্র, ১৩১৭।”

এই পত্রখানির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য এই যে ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায় এবং ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় এবং অন্যান্য পত্রিকার তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। রচনা প্রবৃত্তির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের

অন্তর্মুখী তথা কল্পনাপ্রবণ (introvert) ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রকাশের চেষ্টার এবং উহার বৈশিষ্ট্যের মাত্রা যাহাই থাকুক বাহ্য পরিবেশের চাহিদার মাত্রাও কম নহে; এবং এই কথাই বলা সঙ্গত যে বাহ্য পরিবেশের চাহিদার প্রেরণায়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আন্তর অনুভূতিকে—তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির প্রবণতাকে রূপায়িত করিবার উদ্দীপনা এবং সুযোগ পাইয়াছেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। সুতরাং, রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে,—প্রথমেই জানিয়া লইতে হইবে তাঁহার ব্যক্তি-মানসের প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হইবে রচনাকালীন যুগ-প্রভাবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই প্রভাবের প্রতি ব্যক্তি-মানসের স্বভাবগত আসক্তি বা অনাসক্তি—অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গী।

এই আলোচনার পরে সহজেই এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মানসের বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্দেশ করিতে পারি। কেন তিনি শৈশব কালেই ভাবুক বা কল্পনা বিলাসী হইয়াছিলেন, কেন তিনি স্বেচ্ছায় এবং অনেকক্ষেত্রে অনিচ্ছায়ও বটে কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেন বাল্য কালেই শব্দে ছন্দে ও ভাবে তাঁহার কবিতা বিশিষ্টতার দিকে আগাইয়া গিয়াছিল—এবং কেন বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরহস্যের ধ্যানে তাঁহার মন একাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল—এই সকল 'কেন'র সন্তোষজনক উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজেই সুন্দর-ভাবে দিয়া গিয়াছেন (জীবন-স্মৃতি, আত্মপরিচয় এবং চিঠি-পত্রাদি দ্রষ্টব্য)। আমরাও এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছি যে বাল্যকালের শিক্ষাভ্যাসের এবং পারিবারিক সংস্কার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবি প্রকৃতির অনেকখানি জড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দিলেই এই প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে—সীমার সহিত অসীমের মিলনের কথাই তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা, আবার এ কথাও নিজেই বলিয়াছেন—"আবাল্যকাল

উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" এই স্বীকৃতির মূল্য রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় যে কত বড় তাহা এইটুকু স্মরণ রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানার মধ্যেই প্রকাশিত। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের আজন্ম ব্যাপিয়া এই বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে নানাভাবে এবং নব নব রূপে আস্বাদন, রবীন্দ্রনাথের চরম দার্শনিক মুহূর্তে এই "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা"রই অখণ্ড অনুভূতি এবং তাঁহার মধ্যে আবদ্ধদ্বন্দ্বের যে অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাহা এই অখণ্ড অনুভূতির সহিত খণ্ড অনুভূতির দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন—এমন কি, সামান্য কোন গ্রাহ্য বিষয়কেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতার দার্শনিকরসে রসিত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতিশৈশবেই উপনিষদের আবহাওয়ায় এবং ব্রাহ্মীয় সাধন-ভজনার পরিবেশে লালিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈদান্তিক অনুভূতি ও দর্শন এমন ওতপ্রোতভাবে স্বভাবের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল যে, উহার ফলে তাঁহার চিত্ত বিশ্বের অণু-পরমাণুর মধ্যেও নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছে এবং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মসত্তার—চৈতন্যস্বরূপের "লীলাকৈবল্য" ছাড়া আর কোন সত্যকে স্বীকার করিতে চাহে নাই—পারেও নাই। এই সংস্কার-বশেই রবীন্দ্রনাথে ভাব-সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গী—ভাব-সত্যের প্রতি অত্যধিক আসক্তি (এবং ঐ আসক্তির চরম পরিণতি—'রূপক' সৃষ্টিতে)। বস্তু-সত্যের প্রতি উপেক্ষা শিল্পী রবীন্দ্রনাথে ভাব-সত্যের প্রতি অনুরাগের রূপে এবং দেশ-কালের সীমার-মধ্যে-আবদ্ধ খণ্ড-প্রকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধের বাস্তব রূপের ও উহার যাথার্থ্যের প্রতি অবজ্ঞার রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফলে, দেশ-কাল-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ ভাবের মাহাত্ম্য প্রকাশের প্রতি অধিকতর ঝোঁক—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইয়া

১৩ ।	১৯০৮	মুকুট নাটিকা *(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে ‘বালক’ পত্রে (১২৯২) প্রকাশিত ‘মুকুট’ নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত)	পৃঃ ৬০
১৭ ।	১৯০৯	প্রায়শ্চিত্ত ঐতিহাসিক নাটক (“বৌ-ঠাকুরাণীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল” ।)	পৃঃ ১১৬
১৫ ।	১৯১০	রাজা নাটক (রূপক)	পৃঃ ১২৮
১৬ ।	১৯১২	ডাকঘর নাটক (রূপক)	পৃঃ ৬৯
১৭ ।	”	মালিনী নাটিকা	পৃঃ ৭৯
১৮ ।	”	বিদায় অভিশাপ নাট্যকাব্য	পৃঃ ২০
১৯ ।	”	অচলায়তন নাটক (রূপক)	পৃঃ ১৩৮
২০ ।	১৯১৬	ফাল্গুনী নাট্যকাব্য (রূপক)	পৃঃ ৮৭
২১ ।	১৯১৮	গুরু রূপক নাটক (অচলায়তনের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ)	পৃঃ ৫১
২২ ।	১৯২০	অরূপ রতন নাটক (রূপক) (এই নাট্যরূপকটি ‘রাজা’ নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত)	পৃঃ ৭৩
২৩ ।	১৯২১	ঋণশোধ নাটিকা (শারদোৎসবের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ)	পৃঃ ৯৬
২৪ ।	১৯২২	মুক্তধারা রূপক নাটক	পৃঃ ১৩৬

		(মুক্তধারা নূতন নাটক হইলেও ইহার একটি প্রধান চরিত্র—প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, সেইজন্য ইহার কথোপকথনের কিয়দংশ এবং কয়েকটি গান 'প্রায়শ্চিত্ত' হইতে গৃহীত)	
২৫।	১৯২৩	বসন্ত গীতিনাট্য	পৃঃ ৩
২৬।	১৯২৫	গৃহপ্রবেশ নাটক	পৃঃ ১০২
		(গল্পসপ্তক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ)	
২৭।	১৯২৬	চিরকুমার সভা নাটক	পৃঃ ২২০
২৮।	,,	শোধবোধ নাটিকা	পৃঃ ৮২
		(কর্মফল গল্পের নাট্যরূপ)	
২৯।	,,	নটীর পূজা নাটিকা	পৃঃ ৮২
		['পূজারিণী' কবিতার গল্পাংশ পরিবর্তিত আকারে (ঋতু উৎসবে—নাট্যসংগ্রহ) —নাট্যীকৃত]	
৩০।	,,	রক্তকরবী নাটক	পৃঃ ১০৩
৩১।	১০২৭	ঋতুরঙ্গ গীতিনাট্য	
৩২।	১৯২৮	শেষ রক্ষা প্রহসন	পৃঃ ১৩৩
		(গোড়ায় গলদ-এর অভিনয়যোগ্য সংস্করণ)	
৩৩।	১৯২৯	পরিত্রাণ নাটক	পৃঃ ১৪১
		(প্রায়শ্চিত্ত নাটকের নূতন পরিবর্তিত সংস্করণ)	
৩৪।	১৯২৯	তপতী নাটক	পৃঃ ১৮৫+পরিশিষ্ট ৩

		(রাজা ও রাণী নাটকের গল্পাংশ পরিবর্ত্তিত আকারে নূতন করিয়া নাট্যীকৃত)	
৩৫।	১৯৩১	নবীন গীতিনাট্য	পৃঃ ২৮
৩৬।	১৯৩২	কালের যাত্রা নাট্য	পৃঃ ৩৯
		সূচী :—(১) রথের রশি (২) কবির দীক্ষা	
৩৭।	১৯৩৩	চণ্ডালিকা নাটিকা	পৃঃ ৪৫
৩৮।	"	তাসের দেশ নাটিকা	পৃঃ ৬৯
৩৯।	"	বাঁশরী নাটক	পৃঃ ১৩০
৪০।	১৯৩৬	চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য	পৃঃ ৩৩
৪১।	১৯৩৮	চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য	পৃঃ ৩১
৪২।	১৯৩৯	শ্যামা নৃত্যনাট্য	পৃঃ ৯২

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বতোমুখ—সার্বভৌম ও অসামান্য; একাধারে তিনি কবি-গল্পলেখক-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-সমালোচক-প্রবন্ধকার-সম্পাদক,—এক কথায় 'কি-নহেন' এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি 'একাই-একশো'; সত্যই, তাঁহার একমাত্র এবং অতিসঙ্গত উপাধি—বিশ্বকবি। এই বিশ্বকবির অন্যতম নাট্যকার-ব্যক্তিত্বটি নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি এবং কতরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে, এস্থলে তাহাই আমাদের আলোচ্য—অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কি কি দান করিয়াছেন এবং সে দানের মর্য্যাদা কি?

প্রথমে দেখা যাউক—রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে কি পরিমাণ দান করিয়াছেন। তাঁহার দানের সামান্য পরিচয় এই—নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য, নাটক-নাটিকা-প্রহসন, ব্যঙ্গ-কৌতুক-সংগ্রহ, এবং রূপক প্রভৃতি

জড়াইয়া তাহা মোট সংখ্যায় বিয়াল্লিশ। ইহাদের মধ্যে নাট্যকাব্য = ২, গীতি-নাট্য = ৬, নৃত্যনাট্য = ৩, নাটক = ৭, নাটিকা = ৯, প্রহসন = ৩ ('চিরকুমার-সভা'কে কমেডি নাটক বলিলে), ব্যঙ্গনাটিকা সংগ্রহ = ২, রূপক নাটক-নাটিকা = ৮, এই মোট সংখ্যা হইতে নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য এবং ব্যঙ্গকৌতুকাদি বাদ দিলে অবশিষ্ট পাওয়া যায়—সাতখানি নাটক (অবশ্য ছোট আকার), নয়খানি নাটিকা (আরো ছোট আকার), তিনখানি প্রহসন এবং আটখানি রূপক নাটক-নাটিকা। †

এই হিসাব হইতে প্রথমেই যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথ নূতন এক জাতীয় নাট্যসাহিত্য প্রবর্তন করিয়াছেন—রূপক-নাটক-নাটিকার দানে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্য-সাহিত্যের এই রীতি বাংলায় রবীন্দ্রনাথই প্রবর্তন করিয়াছেন। (অবশ্য গিরিশচন্দ্রের 'মহাপূজা'কে—১৮৯০ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ষ্টারে অভিনীত - রূপক নাটকের প্রথম নিদর্শন রূপে গ্রহণ করিলে—অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মতে "রূপক নাট্য"—সিদ্ধান্তটির পুনর্বিচার আবশ্যক হইতে পারে, কারণ রবীন্দ্রনাথের 'রূপক' নাটকের প্রথম আবির্ভাব ঘটে—১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে।

† নাটক :—(১) রাজা ও রাণী, (২) বিসর্জন, (৩) তপতী, (৪) প্রায়শ্চিত্ত, (৫) পরিত্রাণ, (৬) গৃহপ্রবেশ, (৭) চিরকুমার সভা।

নাটিকা :—(১) মুকুট, (২) মালিনী, (৩) ঋণশোধ, (৪) শোধবোধ, (৫) নটীর পূজা, (৬) চণ্ডালিকা, (৭) তাসের দেশ, (৮) কালের যাত্রা (দু'খানি ক্ষুদ্র নাটিকা), (৯) রুদ্রচণ্ড।

প্রহসন :—গোড়ায় গলদ, (বৈকুণ্ঠের খাতা, (৩) শেষরক্ষা।

রূপক নাটক-নাটিকা :—(১) রাজা, (২) ডাকঘর, (৩) অচলায়তন, (৪) ফাল্গুনী, (৫) গুরু, (৬) অরূপ-রতন, (৭) মুক্তধারা, (৮) রক্তকরবী।

এই উক্তিটি পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 'রূপক নাটক' লেখক হিসাবে একই পর্য্যায়ের লোক। আমার বক্তব্য এই—রূপক-রীতিটির স্খলিত-পদক্ষেপ গিরিশচন্দ্রে প্রথম দেখা যায়)। এই রূপক নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির অক্ষয় সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহাদের জনক রূপে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবর্ত্তকের' মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ রূপক নাটক নাটিকা রচনার পথে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একটি নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, তবে বাংলা নাট্য সাহিত্যের অন্যান্য ধারা তাঁহার হস্তে আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই—ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামীদের প্রতিভাকে ম্লান করিয়া দিতে পারেন নাই। খাঁটি ঐতিহাসিক এবং খাঁটি সামাজিক নাটক বলিতে যাহা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা লেখেন নাই এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবতাশূন্য এবং বলা চলে –ভাবকে কোন রকম একটা রূপের মধ্যে অঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা। (তাঁহার "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন", "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতিকে পরমোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নাটক বলা যেমন সঙ্গত নহে, তেমনি "গৃহপ্রবেশ", "শোধবোধ" প্রভৃতিকেও উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক বলাও যুক্তিসঙ্গত বলা চলে না।) (রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য সাহিত্যে গীতিনাট্যকার হিসাবে অতুলনীয়, রূপক-নাট্যকার রূপে অদ্বিতীয়, কিন্তু সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তাঁহার দান এবং স্থান অতুলনীয় নহে। গীতিকাব্যে বাস্তবতার বিচার অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে, 'রূপক' নাটকে বাস্তবতার প্রশ্ন অবান্তর হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে বাস্তবতার প্রশ্ন অপরিহার্য্য এবং এই প্রশ্নের মুখে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটক—'এঁ্যা-উ' করিতে বাধ্য ; তবে 'প্রকৃত নাটক'-এর লক্ষণ হইতে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যের, বাস্তব-অবাস্তবের হিসাবের অংশগুলি

বাদ দিয়া—কেবলমাত্র প্রকাশের অংশ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হইবে বলাই বাহুল্য।*

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যে ভাবরস ও রূপরস

রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রেই একই কাজ করিয়াছেন—ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ দিতে যেটুকু আবশ্যক তদপেক্ষা রূপের আর কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই—'ভাব-সত্য'কে প্রকাশ করাই তাঁহার মুখ্য কাম্য ও উদ্দেশ্য হইয়াছে। ফলে রূপ-সত্যের মধ্যে যে বাস্তবতা, সে

* ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—

"সেইজন্য নাটক বলিতে সাধারণতঃ যে ঘটনা-বহুল, বৈচিত্র্য-বহুল সাহিত্যের রূপ আমরা বুঝিয়া থাকি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সে-নাটকের সৃষ্টি নাই।...কিন্তু ঘটনার লীলাবৈচিত্র্যই যাহার প্রাণ, যেমন সাধারণ নাট্য ও উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেইখানে সার্থক হইতে পারে নাই।"—(রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ১০৪ পৃ)

স্বর্গীয় অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কেও স্মরণ করা যাইতে পারে—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র খেলা আছে,........তবে তাঁর মানব-সৃষ্টিতে সেই বৈচিত্র্য কোথায়, সে বাস্তবতা কোথায়, সে অভিজ্ঞতার স্তরপর্য্যায় কোথায়, সে উত্থানপতনের তরঙ্গমালা কোথায়, সে পাপপুণ্যের ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়, যাহা সমুদ্রের মত য়ুরোপীয় সাহিত্যকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে। এই জন্য লিরিক কাব্যে যেখানে বস্তুর বালাই নাই, শুধু ভাবের লীলা সঙ্গীতে তিনি ক্রন্দমান, সেখানে তিনি অতুল। এই জন্য ছোট গল্পে যেখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার মর্মনিহিত সুরটিই রচনার যোগ্য সেখানেও তাঁর তুলনা নাই; কিন্তু নাট্যোপন্যাসে নয়, অবশ্য রূপক নাট্য বাদে।"

বাস্তবতা তাঁহার নাটকে পাওয়া যায় খুব কমই। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে 'রস' শব্দটি প্রয়োগ করিলে বলা চলে—রবীন্দ্রনাথে রচনা-রস অতুলনীয়, 'ভাব'-রস অসামান্য, কিন্তু 'রূপ'-রস সন্তোষজনক নহে। এই 'রূপ'-রস-হীনতা রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের একটা বড় লক্ষণ এবং ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের স্বভাব—'ভাব'কে অদ্বৈত সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করার ফলে ভাবের প্রতি একাগ্র অভিনিবেশ বা প্রসক্তি (fixation)। এই স্বভাবেরই প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হইতে কাব্যিক নাটকের স্ফূর্তি (Poetic Drama)।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের নাটকের পরিপাটি বিচার করিবার পূর্ব্বে কাব্যিক নাটকের নাটকত্ব যাচাই করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা মত-বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য (অবস্থাও তাহাই)। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে সংশয়ের দোলা দেখা যায়। বিসর্জ্জন নাটকের উৎসর্গে ক্রিটিকদের 'এক হাত' লইতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথের বিসংবাদের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—"কেহ বলে ড্রামাটিক, বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি" এবং 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভূমিকায় (আশ্বিন ১৩৪৬ লিখিত) নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—"এর নাট্যভূমিতে র'য়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা শোচনীয়রূপে অসংগত।" সাহিত্য বিচারক্ষেত্রে এই প্রশ্নের আলোচনা কম হয় নাই এবং এখনও এই প্রশ্নকে জীবন্তই বলা চলে। ১৯১২ খ্রীঃ Lascelles Abercrombie মহাশয় '*The Poetry Review*'-পত্রে—'The Function of Poetry in the Drama" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া নাটকে কাব্যের স্থান নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন—think we ought to agree that if thorough imitation is a

crucial point, the poetry play does better than the prose play." কারণ—"a prose play can not absolutely imitate life in its conception, in its plan."

অধিকন্তু অ্যাবারক্রোম্বি মহাশয়ের মতে—"The innermost reality, the one with which art is most dearly concerned, is what is commonly called the spiritual reality"—অর্থাৎ "emotional reality"। আর এই emotional realityকে যথার্থ প্রকাশ করা যায়—কাব্যের ভাষায়ই। সম্প্রতি নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত আধুনিক কবি টি.এস্.এলিয়ট মহাশয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "Rhetoric and poetic Drama" প্রবন্ধে এবং ১৯২৮ খ্রীঃ লিখিত A Dialogue on Dramatic poetry নিবন্ধে এই প্রশ্নটিকেই পুনরালোচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধে তিনি 'লিরিকের বড বাড়াবাড়ি'কে বাড়াবাড়ি বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন, তবে কাব্যিক মুহূর্তে কাব্যিকতাকে সমর্থনই করিয়াছেন আর দ্বিতীয় নিবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"And is not the question of verse drama versus prose drama a question of degree of form ?" এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে চাহিয়াছেন যে "He (অর্থাৎ William Archer) was wrong......... in thinking that drama and poetry are two different things —আর intensityর জন্ম verse rhythmই অধিকতর উপযোগী; তাঁহার মতে—"A cntinuous hour and a half of *intense* interest is what we need. No intervals, no chocolate-sellers or ignoble trays. The unities do make for intensity, as does verse rhythm."

কিন্তু যাঁহারা বাস্তব-প্রিয়—সমালোচক-রূপে 'রিয়ালিষ্ট'—তাঁহারা এই মতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে—বাস্তব-নিষ্ঠা

নাটকের অন্যতম লক্ষণ এবং কাব্যিক উচ্ছ্বাস—অর্থাৎ কাব্যময়তা বাস্তবতার পরিপন্থী। এই শ্রেণীর কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটক খুব উচ্চাঙ্গের নাটক বলিয়া গৃহীত হইবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে ভাব-জগতের অশরীরী অধিবাসীদের নাগরিকতা যে-পরিমাণে দেওয়া হইযাছে, তাহাতে বস্তু-জগতের আবহাওয়া একেবারেই হালকা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ "ভাবে ভরা ফানুস" লইয়া খেলা করিতে বাস্তববাদীরা কুণ্ঠা দেখাইবেন এবং অস্বস্তিবোধ করিবেন—অস্বাভাবিক নহে।*

তাই রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে—রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকাদির সাধারণ ধর্ম—ভাবতান্ত্রিকতা এবং কাব্যিকতা বা কবিত্বময়তা। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ দৃশ্য-অঙ্কাদি বিষয়ে গতানুগতিকতার সীমা অতিক্রম করিযাছেন,—ইহা অপেক্ষাও বড় কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ 'ঐক্যের' (unity) বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে অনুগত থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সবক্ষেত্রে তাঁহার সতর্কতা অক্ষুন্ন না থাকিলেও এ কথা স্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ টি.এস্.এলিয়ট-বাঞ্ছিত "more concentration" এর অভিমুখেই অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কম ঐক্য-নিষ্ঠ। ঐক্যানুগতা রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

* তবে এক্ষেত্রেও 'ভাব-সত্য' এবং 'রূপ-সত্য'এর আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং কাম্যত্ব লইয়া প্রশ্ন তুলিয়া জল অনেক দূর ঘোলাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। কেহ হয়ত প্রমাণ করিতে পারেন—রূপ-সত্য আসল-সত্য ভাব-সত্যের দেহ মাত্র, এই হিসাবে ভাব-সত্যই আসলে বাস্তব (Real) এবং রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাস্তব।

রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

স্বভাবো অতিরিচ্যতে—এ কথাটি সর্বক্ষেত্রেই সত্য, এবং রবীন্দ্রনাথেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ ভাবুক কবি এই কথাটি যত সত্য, তদপেক্ষা অধিকতর সত্য এই যে তিনি ভাববাদী—বিশেষতঃ অধ্যাত্মবাদী কবি। ফলে ভাবকেন্দ্রিকতা বা ভাবতান্ত্রিকতা রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষণ। এই স্বভাবের কেন্দ্রানুগত আকর্ষণের ফলে রবীন্দ্রনাথ কখনও বাস্তব পরিমণ্ডলে নামিয়া যাইয়া মাটিকে মাটি বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারেন নাই। বস্তুর টানে রবীন্দ্রনাথ কখনও বাস্তবের উপর আসিয়া দাড়ান নাই, ভাসমান ভাবলোককেই "বাস্তব"রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিশেষ মনোভঙ্গীর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে সহজেই দেখা যাইবে, কেন রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রধান নাটক-নাটিকা লিখিয়াছেন, কেন তিনি রূপক নাটক-নাটিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন,—কেন তিনি খাঁটি সামযিক, বা খাঁটি ঐতিহাসিক লেখার প্রেরণা পান নাই।

এই মনোভঙ্গীর বা প্রবৃত্তির পর নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট—বচন-বিন্যাসের মাহাত্ম্য। যেমন শ্লেষ-বক্রোক্তি-উপমা-উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার প্রয়োগে, তেমনি শব্দের লাক্ষণিক এবং ব্যঞ্জনা-শক্তির খেলাতেও রবীন্দ্রনাথ সমান সিদ্ধহস্ত; এক কথায়—রবীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বময়। (ইংরাজিতে বলিতে গেলে—"রোমান্টিক"।)

তৃতীয়তঃ, অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তবে এ বিষয়ে যে তিনি নিখুত এবং অদ্বিতীয় তাহা নহে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের কথা—"নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলা-কৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই"—সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সমসাময়িক

নাট্যকারদিগের দুই এক জনের মধ্যে না পাওয়া যায় এমন নহে। অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবে ও ভাষায় পশ্চাৎপদ আছেন—একথা বলা চলে না। বরং এই কথাই বলা যায় এবং বলা সঙ্গত—দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রিয়া তীব্রতা যত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথে এমন অনেক চরিত্র আছে যাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই।—এক কথায় যাহা জীবন্ত নহে।

তারপর চরিত্র সৃষ্টির কথা। অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকে এবং চরিত্র সৃষ্টিকে পৃথকভাবে দেখা অসঙ্গত। কারণ চরিত্র সৃষ্টির মহিমা তখনই সুস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে চরিত্র প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। ভাব ও ভাবদ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য-রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি বলিতে বাস্তবিক যাহা বুঝায় তাহা অপেক্ষা ভাবাদর্শের চলা-ফেরার দৃষ্টান্তই তাঁহার নাটকে বেশী। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাষার অনুকরণে বলা চলে—"প্রতি মুহূর্ত্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলায় জীবন্ত চরিত্রের অভিব্যক্তি তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথে খুব সুলভ নহে", সেখানে "চরিত্র অপেক্ষা আইডিয়ার রসমূর্ত্তি"র দেখাই বেশী পাওয়া যায়। ভূমিকা-প্রস্তুতির পর্য্যায় ছাড়াইয়া নাটক-নাটিকার বিশেষ সমালোচনাকালে—প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই এক-একটি চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 'প্রতিকূল' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিসর্জ্জন'-এর দুই একটি চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের মন্তব্য—"গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে; তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই, প্রতিমুহূর্ত্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা,

মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই।" অধ্যাপক অজিত ঘোষের মন্তব্য: "তাঁহাকে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব নিষ্ক্রিয় মনে হয়"। তারপর 'অর্পণা' সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন—"অর্পণা একটি আইডিয়ার রসমূর্ত্তি, কোনও জীবনের বিকাশ নয়, রক্ত মাংসের একটি মানবকন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। "বন্ধুবর অজিতবাবুও স্বীকার করিয়াছেন "তাহার চরিত্র আবেগ-চাঞ্চল্যের দ্বারা, ভাবের দ্বন্দ্ব দ্বারা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অব্যর্থ 'লক্ষ্য-ভেদ'-দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

তারপর এ কথাও সত্য নহে যে "রবীন্দ্রনাথ দর্শকের রুচি গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার নাটকের মধ্য হইতে স্থূল এবং রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন"। (অজিতবাবু)। 'একেবারে বাদ দিলেন' এর সহিত—"রাজা ও রাণীতে" নাট্যকার গতানুগতিক নাট্যধারা একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য অনেক স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা ইহাতে আছে"—এই উক্তির স্বতোবিরোধ রহিয়াছে। কুমারের কর্ত্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার পতন ও মৃত্যু এবং ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা—এই ধরনের মোলাড্রামাটিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথের নাটকে যখন দেখা যায়, তখন—"স্থূল এবং রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন" লেখা যুক্তিযুক্ত হয় নাই (রবীন্দ্রনাথে বাংলা নাট্যসাহিত্যের "Climax" করিতে যাইয়া বন্ধুবর নিজে স্বতোবিরোধের আবর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছেন—'বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ ঘটনা-বিন্যাসে স্থূলতা এবং রোমাঞ্চময়তা একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই এবং এ বিষয়ে তিনি একেবারে নিখুঁতও নহেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঘটনা উচিত্য বা সম্ভাব্য-নিয়মিত নহে—ঘটনা তত্ত্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ঘটনার সার্থকতা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সাফল্যে। এই ব্যবস্থা রোমাঞ্চকর নাটকেই

প্রধানতঃ দেখা যায় এবং সে-সব স্থলে ইহা নিন্দনীয়ই হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-নাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে তাঁহার দোষকে গুণ বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহাকে অসম্মান না করা হয় এ বিষয়ে সমালোচকদের সতর্ক থাকা উচিত।

সমসাময়িক নাট্যকার ও রবীন্দ্রনাথ

একই যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং অনেকটা একই পরিবেশের মধ্যে থাকিলেও, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে কত পার্থক্য হইতে পাবে—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে (নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের প্রকৃতি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিমানসের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পারস্পরিক পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিলেই প্রত্যেকেরই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা ও পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদড়ী মহাশয়ের কিছুদিন আগের এক বক্তৃতার কথা: শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না থাকায় রবীন্দ্রনাথ, অনন্যসাধারণ প্রকাশ-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, বড় নাট্যকার হইতে পারেন নাই ; রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না রাখিয়া রবীন্দ্র-নাথ বাংলাকে একজন শেক্সপীয়র হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বাস্তবিক, ব্রহ্মবাদের কেন্দ্রে আবদ্ধ হইয়া থাকায়, এবং বিশেষতঃ আভিজাত্যের চিলে-কোঠায় নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দী করিয়া রাখায়—সামাজিক হইয়াও অসামাজিক জীবন যাপন করায় রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে ভাব-লোক-বিহারী হইয়া পড়িয়া-ছিলেন—সামাজিক শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে যে সামাজিক জীবন সে-জীবনের মাহাত্ম্যকে ঐকান্তিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সহিত তাঁহার লক্ষণীয় পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথকে বলা যাইতে পারে "প্লেটো", আর দ্বিজেন্দ্রলালকে বলা

চলে "আরিস্টটল"; রবীন্দ্রনাথ ভাব-কৈবল্যবাদী আর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বস্তুর জগতেই ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথে বস্তুজগৎ নিমিত্তমাত্র, দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে বস্তুজগৎ তদ্রূপ নহে—বস্তু এবং ভাব সমান মুখ্য। এই কারণেই বিষয় নির্বাচনের মৌলিক পার্থক্য—বিষয় উপস্থাপনের ভিন্ন রীতি। বিষয় নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ—বলা যায় "ছিন্নবাধা পলাতক বালক"—শতকর্মে-রত সংসারের সহিত তাঁহার যোগ অন্তরঙ্গ যোগ নহে। সেই জন্য—রবীন্দ্রনাথে "কল্পনার centrifugal force"এর ক্রিয়া যত বিলক্ষণ, "অনুরাগের centripetal force" এর ক্রিয়া তত লক্ষণীয় নহে।*

তারপর, প্রকাশশক্তির তারতম্যের কথা। রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক পরিবেশ হইতে এবং শিক্ষাভ্যাস হইতে সংস্কৃত ভাব ও ভাষার যে সঞ্চয় অন্তর্নিহিত করিয়াছিলেন—অধিকন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রবচন ও বচনভঙ্গীর যে সংস্কার তাহার মধ্যে আহিত হইয়াছিল—তাহার ফলে তাঁহার ভাব কখনও ভাষার ও কল্পনার দৈন্য অনুভব করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত এখানেও তাঁহার ঐক্য ও পার্থক্য উভয় আছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভাবে-ভাষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় কোটিতেই সমান, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে অধিকতর পরিমাণে প্রতীচ্য-কোটিক। রবীন্দ্রনাথের জিহ্বায় প্রাচ্য সরস্বতীর ভরের পরিমাণ যদি দশ আনা কি বার-আনা হয় তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলালে ঐ ভর-পরিমাণ ছয়-আনার মত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব-ভাষার সঞ্চয়ের

* (অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য-কল্পনার centrifugal force Ideal এর দিকে Realকে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের centripetal force Real এর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।)

আনুপাতিক পরিমাণ-হার অনুসারেই এক একজনের প্রকাশ-শক্তি এক এক ধরণ পাইয়াছে। *

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে—রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ সমসাময়িক গিরিশচন্দ্রে ভাবানুভূতির সহিত শিক্ষাভ্যাসের তেমন যোগ ঘটিতে পারে নাই বলিয়া গিরিশচন্দ্রে না পাওয়া যায় প্রাচ্যের কবি-কল্পনার বা ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত অভিব্যক্তি না পাওয়া যায় প্রতীচ্যের কবি-কল্পনার বৈচিত্র্য ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা—তারপর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের শিক্ষাভ্যাস থাকিলেও, সহৃদয়তার মাত্রা ছিল কম, তেমনি ছিল না প্রতীচ্যের ভাব-ভাষার উপর সহজ সংস্কারের মত অধিকার। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে ছিলেন বিলক্ষণ দক্ষ। প্রাচ্য কবি-কল্পনার সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও ভাষার উপর অধিকার ছিল তাঁহার অসাধারণ এবং প্রতীচ্য ভাব ও ভাষা-ভঙ্গিমার সহিত ছিল অন্তরঙ্গ যোগ। এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের লক্ষণীয় ঐক্য দেখা যায়। অবশ্য এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে—দ্বিজেন্দ্রলাল (অকালেই) ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরবিদায় লইয়াছেন

---

* সাহিত্য-বিচারে সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রয়োগ অনেকেরই হয়ত মনঃপুত হইবে না। তবে, এ কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, কোন কবির মৌলিকত্ব নিরূপণ করিবার আগে, কবির কাব্যে যে যে কল্পনা যে যে অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার গোটা হিসাব করিবার পরে, পূর্ববর্ত্তী কবিদের দানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করা দরকার। এ পর্য্যন্ত এই ধরণের চেষ্টা কোন কবি সম্বন্ধেই করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কত রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, কতরূপ কল্পনা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অলঙ্কারে এবং কল্পনায় কতটি পুরাতন এবং কতটি নূতন উদ্ভাবন—এইরূপ হিসাব আজও হয় নাই। আশা করি, রবীন্দ্রভবনের গবেষকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

আর রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ের পরেও রচনাশৈলীকে আরো পরিপাটি করিবার অবসর পাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালে এবং রবীন্দ্রনাথে, ইংরেজী অলঙ্কার 'অক্সিমোরন', 'সিনেকডকি,' 'ট্রান্স্ফার্ড এপিথেট' প্রভৃতি প্রয়োগের প্রাচুর্য্যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে এবং এই সব বিষয়েই উভয়ের প্রকাশ শক্তির যথেষ্ট ঐক্য আছে ; কিন্তু শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রযোগ করিয়া wit এবং humour এর যে খেলা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, এবং রচনাকে যে অসামান্য সরসতা দান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালে খুব কমই দেখা যায়। বক্রোক্তি-বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

উপসংহারে এই কথাই বলিবার আছে যে—রবীন্দ্রনাথের হস্তে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে,—নতুন সম্ভাবনার দিকে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এ কথা কোন মতেই স্বীকার্য্য নহে যে—"রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা বাংলা নাট্যধারার climax লক্ষ করিয়াছি" এবং তাঁহার পরেই বাঙ্গালা নাটকের বিশেষ লক্ষ্যণীয় অবনতি ঘটিয়াছে। বরং এই কথাই সত্য যে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত রূপক নাট্যের ধারা এবং কাব্যিক নাট্যের ধারা, রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা নাট্যধারার সহিত অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া, নাটকের আদর্শস্থানীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এ কথা আংশিক সত্য যে, "রবীন্দ্রনাথের নাটকেই বাঙ্গলা নাট্যধারা বিশ্বনাট্যধারার সহিত যুক্ত হইল।"—ইহার সত্যতা এই পর্য্যন্ত যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি—তাঁহার আকর্ষণে বাংলা নাট্যধারার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে, এবং বিশ্বের নাট্যসমাজে রবীন্দ্রনাথকে যোগ্য প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করা চলে। কিন্তু বাংলা নাট্যকারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আর কাহাকেও যে প্রেরণ করা চলে না, এ কথা সত্য

নহে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান চিরস্মরণীয়। ভাব-শিশুকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার বন্ধনে সংহত করিয়া যে-রূপ দান করিয়াছেন, তাহার সঞ্চারণ-ক্ষমতা, তাহার আবেদন-শক্তি অসাধারণ।

তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই এ বিষয়ে বড় দিগদর্শনী : "মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোন কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি-অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে, "খাঁটি রসাত্মক বাণী ভাবের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না"।

রাজা ও রাণী

'রাজা ও রাণী' নাটক ১২৯৬ সালে ২৫শে শ্রাবণ প্রকাশিত এবং "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা শ্রীচরণকমলে" উৎসৃষ্ট, আর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর 'এমারেল্ড' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে এইরূপ নাটক রবীন্দ্রনাথের যে কয়খানি—'রাজা ও রাণী' তাহাদের অন্যতম এবং প্রথম (অবশ্য কালানুক্রমের দিক দিয়া)। এই অভিনয় ৩০শে নভেম্বর হইতে বোধ হয় ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কারণ 'রাজা ও রাণী'র পরে ১৩ই ডিসেম্বর হইতে 'এমারেল্ড'-এ 'গোপীগোষ্ঠ' (অতুল মিত্র) অভিনয় আরম্ভ হয়।

নাটকের বিষয়

রাজা ও রাণী করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত এবং বিষাদ-পরিণাম একখানি ~~চতুরঙ্ক~~ নাটক। বিক্রমদেব নামক জনৈক মোহ-স্বভাব রাজার বিপর্য্যস্ত বাসনার শোচনীয় পরিণতি এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য। রাজা বিক্রমদেব রাণী সুমিত্রাকে সঙ্কীর্ণ বাসনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়া নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আসঙ্গ-মোহে তিনি আবিষ্ট এবং যত আবিষ্ট তত তাঁহার অন্তর্দৈন্য এবং রাজশ্রীর প্রতি উপেক্ষা—এমন কি বিরাগ। এই মোহই তাঁহাকে রাণীর অন্তঃপুরে স্বেচ্ছাবন্দী করিয়া ফেলিল তথা অন্যান্য সত্তাগুলিকেও নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু করিয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তিটিকে করিয়া তুলিল বিকৃত। মোহের বিষম আকর্ষণে রাজার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গেল, রাজা আসঙ্গ-কামনার দিকে অন্ধ আবেগে ছুটিয়া চলিলেন—'রাজসত্তা' শক্তি হারাইতে হারাইতে অরাজকতার শেষ সীমায় যাইয়া দাঁড়াইল। কর্তব্যের যোগে সকলের

সহিত যেখানে কল্যাণের যোগ, সেই যোগ হারাইয়া রাজা অকল্যাণের বাহক হইয়া দাঁড়াইলেন। রাণী সুমিত্রা—আপন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশ-সত্তার চেতনায় যিনি মহিমময়ী, যিনি প্রকৃতই ধর্মপত্নী—পত্নী ও মহিষী যাঁহার পূর্ণ পরিচয়—রাজার সমগ্র আকর্ষণের লক্ষ্য বা শোষণ-স্থল হইয়া পড়ায় নিজেকে অপরাধী মনে না করিয়া পারিলেন না। রাজার প্রেমেই তিনি একদিন রাজাকে আঘাত দিলেন—রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মোহগ্রস্ত রাজাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিরাট সুষমায়—রাজমহিমায়—প্রতিষ্ঠিত করিতে আত্মত্যাগের দুর্গম পথে দুঃসহতম সাধনায় ব্রতী হইলেন। রাজার দুর্বার এবং একাগ্র মোহ আঘাতের বাধা পাইয়া উন্মত্ত হিংসার রূপে সম্ভোগ-মেরু হইতে শক্তি-মেরুতে যাইয়া ভর করিল। বাসনার ধ্যানের-ধন সুমিত্রাকে না পাওয়ার অবদমিত অনুতাপ এবং অবসাদকে রাজা শক্তির উত্তপ্ত মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া প্রশমিত করিতে ব্যগ্র হইলেন। রাজমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে যাইয়া রাজা যুদ্ধের-জন্য-যুদ্ধের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উত্তেজনার মদিরা তাঁহার চাইই চাই। এখানেও সেই অন্ধ আবেগ উত্তেজনা-লিপ্সায় অন্ধ আঘাত করিবার আনন্দে উন্মত্ত-অধীর। উদ্যত-আঘাতের সম্মুখে তাঁহার আত্ম-পর কোনও বিচারই নাই। যে রাজ-মহিমাকে উপেক্ষা করায় সুমিত্রা তাঁহাকে নিদারুণ আঘাত দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই মহিমার পূর্ণপাত্র এক চুমুকে পান করিতে না পারিলে তাঁহার স্বস্তি নাই, দীপ্ততম রশ্মি প্রপাত দিয়া কলঙ্কের দূরতম ছায়াকেও তাঁহাকেও জ্বালাইয়া দিতে হইবে। এই অন্ধ বিক্ষোভে তিনি আপন শ্যালক কুমারসেনকে শুধু যুদ্ধে হারাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—পাছে "গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান"—সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ কাশ্মীর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন। "জীবিত কি মৃত" কুমারসেনকে তাহার চাইই চাই। কারণ, "রাজার প্রধান কাজ আপনার মান রক্ষা করা"। প্রচণ্ড প্রেমের মতো "অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী

উদ্দাম উন্মাদ দুর্নিবার" প্রবল জ্বালা লইয়া রাজা বিক্রমদেব বিদ্রোহী কুমারসেনকে বন্দী করিতে ত্রিচূড় রাজ্যে মৃগয়ার ছলে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—"হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা। এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও, নেবাও এ চিতা"। আর ত্রিচূড রাজকন্যা ইলা প্রবল প্রেমের মাধুর্য্যের আকর্ষণে রাজাকে প্রেমোন্মুখ করিয়া তুলিল—প্রেমের সম্মোহন স্পর্শে শক্তিমত্ত প্রেমতৃষ্ণার্ত্ত রাজা আবার প্রেমস্বর্গের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির আলম্বন সুমিত্রার বিদায়ের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; অগত্যা পরোক্ষ পরিতৃপ্তি লইয়া মন সন্তুষ্ট, প্রকৃতিস্থ হইতে চাহিল।

ইলার সহিত কুমারসেনের মিলন ঘটাইয়া মিলনের তথা প্রেমের মাধুর্য্যকে পরোক্ষতঃ উপলব্ধি করিযা অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিতে অগত্যা চেষ্টা করিলেন। তাঁহার কামনা হইল—"প্রেম স্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে ধন্য হই।" কিন্তু সংহার-খেলায় মত্ত হইয়া কুমারসেনকে যে পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ না দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোন উপায় কুমারসেনের ছিল না। কুমারসেন নিজের শির দিয়া কাশ্মীরের মান ও প্রাণ রক্ষার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ভগিনী সুমিত্রা শোক-মূর্চ্ছিতা হইলেও কাশ্মীর রাজকন্যা সুমিত্রা শেষ পর্য্যন্ত রাজকুমার যুবরাজ কুমারসেনের 'ছিন্ন শির' বহনের কঠিনতম দাবিত্বভার বহনে সম্মত হইলেন। স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রা কাশ্মীর রাজসভায় প্রবেশ করিলেন; এদিকে বিক্রমদেব কুমারকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সুমিত্রার প্রবেশ তাঁহাকে শুধু অপ্রস্তুত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিল তাহাই নহে, সুমিত্রা আতিথ্যের যে উপহার স্বর্ণথালে উপস্থিত করিল, তাহা তাহাকে অপরাধের সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ করিয়া দিল—আর সুমিত্রার "পতন ও মৃত্যু" তাহার হারানো স্বর্গকে নাগালের মধ্যে আনিয়াও

চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে অপসারিত করিয়া দিল। রাজা বিক্রমদেব রাণীকে—তাঁহার হৃদয়ের রাণীকে—পাইয়াও হারাইলেন—রাণীর হৃদয় অধিকার করিবার যোগ্যতা যেক্ষণে সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিলেন, সেইক্ষণেই প্রেমের প্রতিমার বিসর্জ্জন ঘটিল। অতৃপ্ত কামনার অন্তর্দাহের জালা নিবু নিবু হইতে না হইতেই অনুতাপের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—চির-অপরাধের 'পুটপাক' তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

নাটকের জাতিপ্রকৃতি

এইরূপ এক ব্যক্তির জীবন-কথা ট্র্যাজেডি নাটকের উপযুক্ত বিষয় এবং রাজা বিক্রমদেবের জীবন বাস্তবিক অতি শোচনীয়। অতএব এমন চরিত্র যে-নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সে-নাটককে ট্র্যাজেডি-করুণ নাটক বলা অন্যায় নহে। কিন্তু নাটকখানিকে বিনা আপত্তিতে ট্র্যাজেডি বলিবার উপায় নাই। নাটকখানির ঘটনা-বিন্যাস খুবই আপত্তিকর—এক কথায়, মেলোড্রামাটিক। নাটকের কয়েকটি ঘটনা যেমন অসম্ভাব্য, তেমনি রোমাঞ্চময়।

সুমিত্রা চরিত্রের গতি ও পরিণতি সম্ভব কি না এ প্রশ্নের অবতারণা না করিয়াও কয়েকটি আকস্মিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বর্ণথালে কুমারের কর্ত্তিত শির প্রদর্শন, সুমিত্রার "পতন ও মৃত্যু" এবং ইলার আকস্মিক আগমন ও মূর্চ্ছা—এই ঘটনাগুলি অতি নাটকীয় (মেলোড্রামাটিক) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রশ্ন আসিবে—যে নাটকের কাহিনী অসম্ভাব্য ঘটনার সমবায়ে রচিত, যেখানে আকস্মিক ও অতিনাটকীয় ঘটনা দ্বারা রস সৃষ্টির চেষ্টা পরিস্ফুট, সেই নাটককে "মেলো-ড্রামা" বলা হইবে না কেন ?

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে 'মেলোড্রামা'-সুলভ ঘটনা থাকিলেই যদি কোন নাটককে মেলোড্রামার শ্রেণীতে নামাইয়া দিতে হয় তাহা হইলে

'রাজা ও রাণী'কে স্থায়ত মেলোড্রামাই বলিতে হইবে। কিন্তু এখানেই উল্লেখ করিতে হইবে যে—মেলোড্রামা-সুলভ ঘটনা থাকা সত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে এবং পারে বিশেষ একটি গুণের জন্য বা ধর্ম্মের জন্য। এই ধর্ম্মটি—Universality অর্থাৎ "an insistence upon somhting deeper and more profound than mere outward events"। এই সার্ব্বজনীনতা—গভীরতা এবং মহিমময়তা না থাকিলে কোন নাটকই উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পারে না। সমালোচক এলারডাইস্ নিকল মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Whenever a tragedy lacks the feeling of universality, whenever it presents merely the temporary and the topical, the detached in time and in place, then it becomes simply sordid or never aspires to rise above melodrama. If we have not this, however well-written the drama may be, however perfect the plot, and however brilliantly delineated the characters, the play will fail". উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির প্রধান বৈশিষ্ট্য—সার্ব্বজনীনতা, আবেদনের গভীরতা এবং গম্ভীরতা। এই ধর্ম্মটি থাকিলে, রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকা সত্বেও নাটক ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। (Even a high tragedy, such as *Hamlet*, may have decidedly melodramatic or sensational elements in the plot.—*The Theory of Drama*—P. 89.)

"রাজা ও রাণী" নাটকে আবেদনের সার্ব্বজনীনতা, গভীরতা এবং গম্ভীরতা এত লক্ষণীয় যে ঐ বিষয়ে কোনরূপই সন্দেহ করা যায় না। এই কারণেই নাটকখানি ট্র্যাজেডির মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্বেও,—সার্বজনীনতা গুণে ট্র্যাজেডি-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। অর্থাৎ

আঙ্গিক-এর দিক দিয়া আপত্তি করা চলিলেও, 'ভাবিক'-এর দিক দিয়া নাটকখানির ট্যাজেডিত্বে আপত্তি করা চলে না। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় নাটকখানির আঙ্গিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ কথা সত্য, 'রাজা ও রাণী' নাটকীয় গঠন ও ঘটনা-বিন্যাসে শিথিল, একটু মেলোড্রামাটিক, চমকপ্রদ; এবং ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি কবিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই।" (কবি 'তপতী' লিখিয়া চিন্তা দূর করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু "রাজা ও রাণী একটু মেলোড্রামাটিক, চমকপ্রদ" এই সিদ্ধান্ত দ্বারা 'রাজা ও রাণী'কে 'মেলোড্রামা'র শ্রেণীতে নামাইয়া দিলেন কি না স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ও নাটকখানির বিশ্লেষণ করিবার সময় নাটকে "অনেক স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা" স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ঐ স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকায় নাটকখানির যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে যে সন্দেহ স্বাভাবিক, সেই সন্দেহের নিরসন করিতে চেষ্টা করেন নাই—অর্থাৎ 'রাজা ও রাণী' ট্র্যাজেডি কি মেলোড্রামা এ প্রশ্নের মীমাংসা অজিতবাবু করেন নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নাটকখানির ত্রুটির দিকে স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন—লিখিয়াছেন, "এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি"।

সুতরাং স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে যে নাটকখানিতে মেলোড্রামা-সুলভ স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা আছে, উচ্ছ্বাসময়তা আছে; নাটকখানির আঙ্গিক ত্রুটি বিষয়েও সমালোচকগণ আস্তিক (positive) এবং একমতাবলম্বী, অতএব, নাটকখানি ট্র্যাজেডি কি মেলোড্রামা, এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নাটকের যথার্থ পরিচয় নির্ভর করে। আমরা এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা পূর্বেই যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত করিয়াছি এবং সে সিদ্ধান্তএই যে নাটকখানির মধ্যে মেলোড্রামার লক্ষণ থাকিলেও একটি বিশেষ ধর্মের জন্য—আবেদনের

সার্ব্বজনীনতার এবং গভীরতার জন্য নাটকখানি ট্র্যাজেডির শ্রেণীতেই উন্নীত হইয়াছে।

'নাটক-তত্ত্ব' বিচার বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থগুলিতে ট্র্যাজেডি এবং মেলোড্রামার যে লক্ষণাদি নিরূপিত করা হইয়াছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত অগত্যা করিতেই হইবে। কারণ, শেষ পর্য্যন্ত আবেদনের সার্ব্বজনীনতা, গভীরতা এবং গম্ভীরতার দ্বারাই ট্র্যাজেডি ও মেলোড্রামার পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—কেবল মাত্র ঘটনার আকস্মিকতা, স্থূলতা, উচ্ছ্বাসময়তা এবং রোমাঞ্চকরতা দ্বারা নহে। *

নাটকের গঠনগত দোষ-গুণ

প্রথমেই নাট্যকারের উপলব্ধিকে বিবৃতি করা যাউক : নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিতেছেন—

"এর নাট্যভূমিতে র'য়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্ব্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলা-ভূমি, ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দ্দান্ত প্রেম

* নাটকের জাতি-নিরূপণে ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা বিভাগ প্রতীচ্য সাহিত্য-শাস্ত্রের বিধান—সুতরাং প্রতীচ্য মতবাদের সূত্র দ্বারাই বিচার কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা না বলিয়া উপায় নাই যে, সূত্রকারগণ অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছাইতে পারেন নাই। বাংলা নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া অনেক সমলোচকই এই অস্পষ্টতার জালে জড়াইয়া মতি স্থির রাখিতে পারেন না। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।"

তারপর "তপতী" নাটকের ভূমিকায়ও নাট্যকার বিবৃতি দিয়াছেন— 'রাজা ও রাণীর' আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা"। "সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো। এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।

"রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ ক'রেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হ'য়েছে ভাবগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকেই অন্তিমে কুমারের মৃত্যুর দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়"।

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ও (রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকায়) লিখিয়াছেন—

"বিক্রমের বিপুল প্রেমাবেগ প্রতিহত হইয়াছে সুমিত্রার স্থির অবিচল সত্যবুদ্ধি ও প্রেমের কাছে এবং প্রতিহত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে দুর্দ্দম হিংসায় ও হিংস্রতায়; যে-প্রেম আঘাত করিতেছিল নিজেকে সে-প্রেম প্রতিহত হইয়া এইবার আঘাত করিল সকলকে; তাহার মধ্যে নাই ক্ষমা, নাই বিচার-বুদ্ধি। নাটকীয় সম্ভাবনা এই রূপান্তরের মধ্যে নিহিত; কিন্তু তাহার পরেই ইলা ও কুমারের সে গীতিকাব্যিক উপাখ্যান নাটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা যে শুধু জলীয় তাহাই নহে নাটকীয় সম্ভাবনার দিক

হইতে অবান্তরও বটে।"

আমার মনে হয়—নাট্যকার এবং ডাঃ রায মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক দিয়া বিচার করিযা দেখেন নাই এবং দেখিলে দেখিতে পাইতেন যে নাট্যকারের 'নাট্য-পরিণতি' এবং ডাঃ রায়ের 'নাটকীয সম্ভাবনা' নাটকের 'গর্ভ-সন্ধি' মাত্র। মধ্যপথকে পথের শেষ মনে করায, উভয়ের দৃষ্টিই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ফলে কুমারসেন-ইলা কাহিনী (নাট্যকারের কাছে) "শোচনীয়রূপে অসঙ্গত" এবং (ডাঃ রায়ের কাছে) "নাটকীয় সম্ভাবনার দিক হইতে অবান্তরও বটে" হইযা দাঁড়াইযাছেন। ইলা ও কুমারের গীতিকাব্যিক উপাখ্যান জলীয় কি গাঢ়-রসীয এই প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে এক্ষেত্রে প্রবেশ করা অনাবশ্যক, কিন্তু নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবে, কাহিনীটির তাৎপর্য্য উপেক্ষণীয় কিনা—এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই অংশে আমাদের প্রথম আলোচ্য—'নাট্য-পরিণতি' বা নাটকীয় সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয় আলোচ্য—কুমারসেন-ইলা উপাখ্যানের নাটকীয় উপযোগিতা। এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা না করিলে নাটকখানির প্রকৃত বিচার সম্ভব নহে। গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে—নাট্যকারের এবং ডাঃ রায়ের মতের সহিত আমি এই দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই।

প্রথম বিষয়—নাটকের যথার্থ নাট্য-পরিণতি। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিলেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না যে "এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী"। এই নাটকের যে 'বীজ' তাহার একমাত্র এবং স্বাভাবিক পরিণতি—বিশ্বঘাতী হইযা উঠা নহে। বিক্রমের বিশ্বঘাতী হিংস্রতা চরিত্রটির অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা মাত্র আর এই অবস্থা চরিত্রটির স্বাভাবিক পরিণতির অন্যতম একটি 'পর্য্যায' হইলেও নাটকীয় পরিণতি নহে। কারণ এই অবস্থাটি

—দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা—একই বা সমানভাবে অগ্রসর হইযা চরিত্রটিকে না করিতে পারে আনন্দ-পরিণাম, না করিতে পারে দুঃখ-পরিণাম। এই দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা, নিক্ষিপ্ত 'ব্যুমেরাঙে'র মত নিক্ষেপকারীর বুকে আঘাতরূপে ফিরিয়া আসিযা অথবা অন্য কোনরূপে আপনার গতিবেগ হারাইয়া ফেলিযা—যুযুধান ব্যক্তিত্বের তীব্র বিবোধের সমাধান সৃষ্টি করিযা এক শান্ত সমন্বয়ের মধ্যে আত্মপরিণাম তথা নাটকীয় পরিণাম লাভ করিতে পারে—এই কারণেই দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়া দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায় যেখানে পরিণত হইযাছে, সেখানেই নাট্যপরিণতি ঘটিযাছে এ কথা সত্য নহে। সত্য কথা এই যে, দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হইয়া হিংস্রতায় পরিণত হইয়া, বিশ্বঘাতী হইতে হইতে যেখানে আত্মঘাতী হইযা পড়িয়াছে, সেখানেই এই নাটকেব যথার্থ নাট্য-পরিণতি—যথার্থ ট্র্যাজিক পরিণতি। এই ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটাইতে যাইযা নাট্যকার চরিত্রটি যে-পরিস্থিতির মধ্যে লইযা গিযাছেন, তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু এ পরিণতি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তাহা বলা চলে না। চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটনার সম্ভাবনা একেবারে না পাওযা যায এমন নহে। যাহাই হউক, নাটকের যথার্থ নাট্যপরিণতি সম্বন্ধে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং 'রবীন্দ্র-সাহিত্যেব ভূমিকা'-লেখক ডাঃ রায় যে সিদ্ধান্ত করিযাছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে—দুর্দ্দান্ত হিংস্রতা নাটকের 'ভাব-যতি' হইতে পারে, 'রস-যতি' (ছন্দের পরিভাষায বলিলে) নহে।

দ্বিতীয় আলোচ্য—কুমারসেন-ইলার কাহিনীর নাটকীয় উপযোগিতা। নাট্যকারের নিজের মত এই—"লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ আর সেটা শোচনীয় রূপে অসঙ্গত"। আমার মনে হয়, এই মন্তব্য করিবার সমযে ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। দুর্দ্দান্ত প্রেমকে প্রতিহত করিয়া দুর্দ্দান্ত

হিংস্রতায় পরিণত করার পরে নাট্যকারের সম্মুখে এই সমস্যাই দেখা দিয়াছিল—কি উপায়ে নাটকের কাহিনীটিকে নাট্য-পরিণতি দান করা চলে, বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে 'ট্র্যাজিক' করিয়া তোলা চলে। নাটকীয় ঘটনার স্বাভাবিক গতি রাণীর পিত্রালয়ের অভিমুখে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু সমস্যা এই যে, কিরূপে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া বিক্রমের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটানো যায়। ঘটনা এমন হইতে পারিত যে, রাজা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া নির্ব্বিচার হিংসায় মত্ত হইলেন।—রাণীর পিতৃভূমিতেই পুরুষকারের প্রমাণ দিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত রাণীকেই হত্যা করিয়া বসিলেন। ("তপতী" নাটকে এইভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন।) তাঁহার অতৃপ্ত কামনা চিরদিনের জন্য অতৃপ্তই রহিয়া গেল। কিন্তু নাট্যকার এইরূপ পরিকল্পনার মধ্যে যান নাই, তিনি রাজাকে আরো জটিল পরিস্থিতির মধ্যে রাখিয়া পরিণামকে আরো শোচনীয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত হিংস্রতার বশেই রাজাকে চিরক্ষণ রাখেন নাই, রাজার যে মূল-প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সহিত সঞ্চারী হিংসা-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া চরিত্রটিকে আরো গভীর ও দ্বন্দ্বকরুণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই প্রয়োজনেই কুমারসেন-ইলার কাহিনী আসিয়াছে। ইলার "প্রবল প্রেম" "প্রেমস্বর্গচ্যুত" রাজাকে আবার প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শে হিংসামুক্ত করিয়া তুলিয়াছে; রাজার দুর্দ্দান্ত হিংস্রতাকে প্রশমিত করিয়া দিয়াছে; তাই রাজা বলিয়াছেন—"যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে"। কিন্তু রাজা যাঁহাকে পাইবার জন্য অশান্ত চিত্তে—'অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ' লইয়া জয়ধ্বজা স্কন্ধে বহিয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতেছেন সেই "প্রেমময়ী" কোথায়? তাই তাঁহার কাছে—"শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ"। এই শান্তিই তাঁহার আন্তরিক কামনা, এবং এই শান্তি পাওয়ার উপায় সম্মুখে না থাকাতেই—"শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ"। ইলার প্রবল প্রেমের আকর্ষণে রাজাকে আবার প্রেমের রাজ্যের দিকে টানিয়া লইয়া

গিয়াছে। তাই রাজার মধ্যে বিষণ্ণ শ্রান্তি—তাই কুমারসেনকে চাহেন প্রেমে বন্দী করিতে আর—"আর-কেহ"র জন্য অন্তরে তাঁহার হতাশ ক্রন্দন।

কিন্তু পরোক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য রাজা যে আয়োজন করিলেন তাহাও বিপর্যস্ত হইয়া গেল। না ঘটাইতে পারিলেন কুমারসেনের সহিত ইলার মিলন, অধিকন্তু নিজের রাণীর সহিত মিলনের সম্ভাবনাও চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল। অন্তর্দাহের তীব্র জ্বালার সহিত চির-অপরাধের গ্লানি মিশিয়া রাজার শোচনীয়তাকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। এখন, এই পরিকল্পনা করা সঙ্গত হইযাছে কি অসঙ্গত হইযাছে, পরে বিচার করা যাইবে; কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে কুমারসেন-ইলার উপাখ্যানের উপযোগিতা যে অস্বীকার করা যায় না—ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় (আর এই বিষয়টি যুক্তি সহকারেই প্রতিপাদিত হইয়াছে)। উপাখ্যানটিতে গীতিকাব্যিক উচ্ছ্বাসই থাকুক, আর যাহাই না থাকুক, কাহিনীটি বর্ত্তমান পরিকল্পনায় একেবারে অবান্তর নহে। ডাঃ রায় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"প্রেম-স্বর্গচ্যুত বিক্রম আপনাকে বুঝি বহুদিন পরে ফিরিয়া পাইলেন, বহুদিন পরে বুঝি সত্য প্রেমজ্যোতির একটু আভাস পাইলেন, ইলার মুখে বুঝি তাহার উদগ্র হিংস্র যুদ্ধোন্মত্ততা শীতল হইয়া আসিল, বুঝি 'শিশির-শীতল প্রস্ফুটিত শুভ্রমেঘের' একটি বিন্দুলাভ করিবার জন্য আবার সেই পুরাতন দিনগুলিকে তাহার সব সুখদুঃখভার লইয়া পাইবার জন্য সমস্ত অন্তর তৃষিত হইয়া উঠিল।" আশ্চর্য্য! এত 'বুঝি বুঝি' করিয়াও শ্রদ্ধেয় নীহারবাবু কাহিনীটির উপ-যোগিতা বুঝিলেন না কেন, ভাবিবার বিষয়। ইলার 'প্রবল প্রেমের' সহিত হিংসোন্মত্তগতি রাজাকে ধাক্কা লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য হইলে বা ধাক্কা লাগানো অসঙ্গত পরিকল্পনা না হইলে—কাহিনীটিকেও অবান্তর বলা যুক্তিযুক্ত নহে। এই কাহিনীকে অবান্তর বলিবার আগে প্রথমেই বলা উচিত যে, যে-পরিকল্পনার সাহায্যে নাট্যকার নাট্য-পরিণতি ঘটাইয়াছেন,

সেই পরিকল্পনাই অ-মনস্তাত্ত্বিক এবং অসঙ্গত। রাজাকে উন্মত্ত হিংসায় অবিরামভাবে মাতাইয়া রাখিয়া নাট্য-পরিণতি ঘটানো উচিত ছিল, বর্ত্তমান পরিকল্পনা অস্বাভাবিক তথা অসঙ্গত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে এই কাহিনীকে অবান্তর বলা উচিত নহে। আমার মনে হয়—নাট্য-পরিণতির যথার্থ রূপটি চোখে না পড়াতেই ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ এবং ডাঃ নীহারবাবু স্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথকে ঠিক অনুসরণ করিতে পারেন নাই। স্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথ যে মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দিকে কাহিনীকে প্রসারিত করিয়াছেন তাহার প্রতি উপেক্ষা না থাকিলে দেখা যাইবে যে কুমারসেন শেষাংশে প্রাধান্য লাভ করিলেও রাজা বিক্রমদেবের ট্র্যাজেডির অন্যতম 'নিমিত্ত' রূপেই করিয়াছে। রাজার দুর্দ্দান্ত হিংস্রতার আঘাত কুমারসেনকে নিহত করিয়া আত্মঘাতরূপে নিজের বুকে ফিরিয়া আসিল এবং এই ফিরিয়া আসাই বিক্রমদেবের ট্র্যাজেডিতে পূর্ণাহুতি। গর্ভসন্ধির উচ্চচূড়া হইতে কাহিনীটিকে বা চরিত্রকে উপসংহারের দিকে সরলরেখায় লইয়া না যাওয়াতেই—ইলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। "তপতী" নাটকের পরিণামের সহিত এই নাটকের পরিণামের তুলনা করিলেই ধারণা স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

'রাজা ও রাণী' নাটকের ত্রুটি নাট্যকারকে খুবই পীড়া দিয়াছিল এবং ঐ ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। 'তপতী' নাটকখানি সেই চেষ্টার ফল। কিন্তু 'তপতী' নাটকখানিকে 'রাজা ও রাণী'র উন্নততর বা বিশুদ্ধতর সংস্করণ বলা যে চলে না, রবীন্দ্রনাথ নিজেও খানিকটা স্বীকার করিয়াছেন। 'তপতী' যথার্থই ঢালিয়া সাজা আয়োজন। ('রাজা ও রাণী'র দোষ এড়াইতে যাইয়া নাট্যকার স্বভাবদোষে লিরিক-দোষ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে যেমন পারেন নাই, তেমনি 'রাজা ও রাণী'র অন্তর্দ্বন্দ্ব-মহিমার গুণটিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।) 'রাজা ও রাণী'র বিক্রমদেব এবং

"তপতী"র বিক্রমদেব প্রধান ভাব-বন্ধের তথা অন্তর্দ্বন্দ্বের দিক দিয়া এক ব্যক্তি নহে। তদ্রূপ সুমিত্রাও এক নহে। "রাজা ও রাণী"র বিক্রমদেব যেখানে প্রেমের ধাতু দিয়া গড়া, "তপতী"র বিক্রমদেব সেখানে রাজ-অভিমানে গড়া। তেমনি "রাজা ও রাণী"তে সুমিত্রা মূলতঃ যেখানে প্রেয়সী ও মহিষী, সেখানে "তপতী"তে সুমিত্রা 'কাশ্মীর-কন্যা' এবং কাল-ভৈরবের মানস-কন্যা। আসলে পরিকল্পনার দিক দিয়া "রাজা ও রাণী" এবং "তপতী" দুই খানি ভিন্নধর্ম্মের নাটক।

কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণ

এক্ষণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কাহিনীটির যে রূপ প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা সতর্কতার সহিত অনুসরণ করিলেই 'রাজা ও রাণী' নাটকের উপস্থাপ্য বিষয় সম্যক জানা যাইবে। এই জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্রটির (বিক্রমদেব) বিশ্লেষণই যথেষ্ট।

রাজা বিক্রমদেব জালন্ধরের অধিপতি আর প্রেমিক বিক্রমদেব কাশ্মীর-কন্যা জালন্ধর-মহিষী রাণী সুমিত্রার প্রণয়-ভিখারী। বিক্রমদেবের এই দুই ব্যক্তিত্বের নির্ব্বিরোধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই। প্রেমিক বিক্রমদেব মোহ-স্বভাব, প্রেম তাহার মধ্যে মোহের অন্ধ আবেগে পরিণত হইয়া অতৃপ্তির অনির্ব্বাণ অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। সুমিত্রাকে তিনি বাসনার মাকড়সার-জালের মধ্যে বাঁধিয়া ভোগ করিতে চাহেন,—সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যের বন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইয়া সুমিত্রাকে তিনি অন্তর-নিবাসিনী করিতে চাহেন। তাঁহার একান্ত বাসনা—"সংসারের কেহ নয়, অন্তরের তুমি; অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।" সুমিত্রা যতই তাঁহাকে স্মরণ করাইতে চাহেন—"অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী" ততই ক্ষুব্ধ হন—তাহার 'রাজ'-সত্তাকে তিনি অস্বীকার করিতে উদ্যত হন,

বলেন "নহি আমি রাজা"। এইরূপ মোহময় প্রেমে বিক্রমদেব আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ফলে, "রাজ্যের বক্ষের পর সগর্বে দাঁড়ায়, বধির পাষাণরুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর। রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কাঁদে হাহা রবে"। অধিকন্তু, এই মোহের সুযোগে "রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ ভাগ করি লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি······বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভা মাঝে মিলায় ক্রন্দন।" কিন্তু রাণী যত তাঁহাকে রাজ-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, রাজা তত রাজ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন—রাজ্যকেই বাসনা পূরণের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করেন—রাণী যত বলেন, 'যাও রাজকাজে,' রাজা বিক্রমদেব তত বলেন—"কোন কাজ নাই, প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব। ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে, রাজকার্য্য চলিছে অবাধে"—কর্তব্যপালন তাঁহার কাছে আজ আত্ম-পীড়ন,—কর্ত্তব্য কারাগার। মুগ্ধ রাজার আজও এক কথা—'সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর।' প্রেম 'এই হৃদয়ে স্বাধীন কর্ত্তব্য'।

রাণী যত বলেন—"এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু, পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা সন্তানের করুণ ক্রন্দন।····· যুদ্ধ করো।" কিন্তু বিক্রমদেব মোহে একান্ত অটল—'ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু, তার আগে তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা, ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মপর সংসারের কাজ সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল্'। রাণী নিরুপায় হইয়া আজ্ঞা চাহেন—"মহিষী হইয়া আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ"। রাজার মধ্যে আত্ম-বিশ্লেষণ জাগে—রাজ-সত্তার তন্দ্রাচ্ছন্ন জাগরণ ঘটে, রাজা বলেন "সুখী হোক সুখে থাক, এ রাজ্যের সবে! কেন দুঃখ, কেন পীড়া······কেন মানুষের পরে মানুষের এত উপদ্রব। দুর্ব্বলের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পরে সকলের শ্যেনদৃষ্টি কেন? যাই দেখি যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়"। রাজা আদেশ দেন—"এই দণ্ডে রাজ্য হ'তে দাও দূর করে যত সব বিদেশী দস্যুরে"।

কিন্তু কী বিড়ম্বনা—সেনাপতি নিজেই বিদেশী। রাজা নিরুপায়। রাণী সুমিত্রা উপায় স্থির করেন—"কালভৈরবের পূজোৎসবে কুর নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে। গর্ব্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার, সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিবো প্রস্তুত।'' কিন্তু রাজার মধ্যে মোহর ঘোর তেমনি প্রবল। রাণীর দুয়ারে তিনি—"ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙ্গাল বাসনা।"। রাণীর উপেক্ষার অশরীরী কশাঘাতে রাজার বিক্ষুব্ধ চিত্তে আত্মসমীক্ষা জাগে—'অপদার্থ আমি। দীন কাপুরুষ আমি! কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী! কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার। ...... নহে তাহা। জানি আমি আপন ক্ষমতা। রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি এ হৃদয়মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা দিয়েছি তোমারে।" কিন্তু তবু রাজার মোহ কাটে না। দেবদত্ত নায়কগণের বিদ্রোহের সংবাদ লইয়া প্রবেশ করিলে রাজা বিরক্ত হইয়া বলেন—"দেবদত্ত অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।" রাণী কর্ত্তব্যে-জাগ্রত রাজাকে বলেন—''মন্ত্রণার কী আছে বিষয়। সৈন্য লয়ে যাও অবিলম্বে·· রক্তশোষী কীটদের দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।" রাজা কিন্তু রাণীর এই কর্ত্তব্য-সচেতনতাকে সুস্থ চিত্তে গ্রহণ করিতে অক্ষম। রাণীর আচরণ তাঁহার কাছে উপেক্ষা রূপে প্রতীয়মান—রাজা ক্ষুব্ধ অভিমানে বলেন—''আমি কি তোমার উপদ্রব-অভিশাপ। দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্নকাঁটা। হেথা হতে একপদ নড়িব না রাণী। পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব—।" রাজা সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিতে চাহেন।

অগত্যা রাণী রাজার প্রেমেই রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, রাজার হৃদয় শূন্যতায় হাহাকার করিয়া উঠে। 'বৃহৎ প্রতাপ' লোকবল অর্থবল শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো মনে হয়—ক্ষুদ্র পাখীর মতো ক্ষুদ্র হৃদয়ের অভাবে—সব শূন্য, সব নিরর্থক হইয়া যায়। এই শূন্যতার বেদনা অভিমানে গুমরিয়া উঠে—''এমনি কি চিরদিন কাটিবে জীবন। সে দিবে না ধরা, আমি ফিরিব পশ্চাতে?''···রাণীকে অন্তর হইতে বিদায় দিতে চাহেন—কিন্তু

'পলাও পলাও নারী' বলা এক কথা, আর হৃদয় হইতে হৃদয়-বাসিনীকে বিদায় দেওয়া আর এক কথা। রাজা রাণীর চোখের এক বিন্দু জলের জন্য ব্যাকুল,—অন্তর্বেদনা তাহার অসহ্য। আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত হয়—"অন্তর্যামী দেব, তুমি জান, জীবনের সর্ব অপরাধ ঢেকে ভালোবাসা, পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল, রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল।" ক্রমে আক্ষেপ বেদনার চাপে উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়—ক্ষাত্রধর্মের জন্য, রাজধর্মের জন্য রাজা প্রস্তুত হন। কিন্তু আসলে এই প্রস্তুতি অবিমিশ্র পুরুষকারের জন্য নহে—ইহা যেন আত্মকৃত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা। রাজা যতই বলুন—"আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর, আপনারে পেযেছি কুড়ায়ে। আজি সখা আনন্দের দিন।" কিন্তু এই কথা অন্তরের কথা নহে, ইহা সম্পূর্ণ মৌখিক—রাজাই স্বীকার করেন—"বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান! থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে, বিঁধিছে মর্ম্মে।" এই জ্বালাই রাজার মধ্যে তীব্র উত্তেজনা-বুভুক্ষা হইযা দেখা দিযাছে। তাই তিনি চাহেন—'উদগ্র সংগ্রাম, বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে—অতিতীব্র প্রেমালিঙ্গন সম।" "রক্তে রক্তে মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি।" এই উদ্দীপ্ত উত্তেজনার প্রেরণা—"আগে আমি আপনারে করিব মার্জ্জনা, অপযশ রক্ত-স্রোতে করিব ক্ষালন।" তাঁহার তৃপ্তির স্বরূপ—"কে বলিবে আজি মোরে দীন কাপুরুষ! কে বলিবে অন্তঃপুরচারী।" তাঁহার মৌখিক সান্ত্বনা—দুর্ব্বল আত্ম-সমর্থন, "হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা?"

একদিন শক্তি-সত্তা ছিল প্রেম-সত্তার দ্বারা আচ্ছন্ন, আজ 'প্রেম-সত্তার' প্রত্যক্ষ প্রকাশ ব্যাহত, তাই শক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই উহা আজ হিংসার আকারে প্রকাশ খুঁজে। যে তেজ একদিন প্রেম-রূপে একান্ত আবেগে রাণীর দিকে ধাবিত ছিল, তাহাই আজ বিকৃত শক্তিরূপে—অন্ধভাবে,

কাপুরুষতাকে ক্ষয় করিতে, অন্তঃপুর-চারিতাকে নিঃশেষ করিতে উন্মত্ত। এই উন্মত্ততাই যুদ্ধের আকারে অভিব্যক্ত। রাজমহিমাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াই তিনি নিজেকে মার্জ্জনা করিতে পারেন। তাই রাণী সুমিত্রা সোদর শঙ্করের সাহায্যে যুধাজিৎ ও জয়সেনকে বন্দী করিয়া যখন রাজার শিবিরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর রাজা বিক্রমদেব সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন। যে অপযশকে রক্তস্রোতে ক্ষালন করিতে তিনি বাহির হইয়াছেন, সেই অপযশের ডালি লইয়াই রাণী দর্শনপ্রার্থী। (যুধাজিৎ জয়-সেনকে বন্দী করিয়া রাণী রাজার রাজমহিমাকেই দীন করিয়া দিয়াছেন।) এই দীনতা তাঁহার অসহ্য। এই রাজমহিমার দৈন্যেই রাণী রাজাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন;—দৈন্যের ছায়াটুকু আজ তাঁহার অসহ্য—সে দৈন্য যেই ঘটাক—এমন কি রাণীর হাতের দেওয়া হইলেও তাহা অগ্রাহ্য—বোধ হয় আরো অসহ্য। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে যাহা বলিয়াছে—"আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দিবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্য অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে।"—এই কথা না বলিলেও রাজা রাজমহিমাকে খর্ব্ব করিতে পারিতেন না। দেবদত্ত ঠিকই ধরিয়াছেন—"একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না।" তাই যুধাজিৎ যেই বলিয়াছেন—"পলাতক অপরাধী সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি রাজদণ্ড ব্যর্থ হয় তবে।" জয়সেন যুক্তি দিয়াছেন—"সিংহাসনে দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।" রাজা চিন্তার হাত এড়াইবার জন্যই—"কার্য্যস্রোতে আপনারে ভাসাইয়া" দেন, কার্য্যবেগের স্পর্শে অবিশ্রাম গতি-সুখ লাভ করিতে চাহেন। কুমারসেনকে তাঁহার চাইই চাই—"সে না হলে সুখ নাই নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তাকে সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড

দীর্ণ করি দেখিব সে কোথা আছে।" রাজা তাহার কামনার স্বরূপ বুঝিতে পারেন না তাই বিস্মিত হইয়া ভাবেন—"এ কী দৃঢ়পাশে আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক।" তাঁহার "সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল, এই এল, ওই দেখা যায়··।" কুমারসেনকে পাওয়ার জন্য রাজার এই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা এবং ব্যাকুলতার সহিত চাপা বেদনার রেশ যেন মাখানো রহিয়াছে। কুমারসেনের সহিত নিশ্চয়ই "আর-কেহ"কেও পাওয়া যাইবে—এই অব্যক্ত কামনাই যেন ঐ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃঢ়পাশে রাজাকে বন্দী করিয়াছে।

রাজার হিংস্র উত্তেজনা প্রথম চমকিত বাধা পায়—শাশুড়ী রেবতীর "গুপ্ত লোভ বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা"-কলুষিত চরিত্র দর্পণে আপনার বিকৃত রূপের আভাস দেখিয়া। তাঁহার অন্তরাত্মা অপরাধে—হীনতাবোধে সঙ্কুচিত হইয়া হাহাকার করে—"হে বিক্রম ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা, এ শ্মশান-নৃত্য তব থামাও থামাও নিবাও এ চিতা।" বিক্রমদেব নিজের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করেন—উপলব্ধি করেন "এ হিংসা আমার চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।" আপনার হিংস্রতাকে ব্যাখ্যা করেন—'প্রচণ্ড প্রেমের প্রবল এ জ্বালা, অভ্রভেদী সর্ব্বগ্রাসী উদাম উন্মাদ দুর্নিবার।' এবং ঘোষণাও করেন—"একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই গুপ্ত লোভ বক্র রোষ দীপ্ত হিংসাতৃষা।" রাজার এই আত্মোপলব্ধি, তাঁহার হিংসার গতিবেগকে যেন রুদ্ধ করিয়া দেয়। যে রাজা একদিন বলিয়াছেন—"যুদ্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের ধ্বনি", সেই রাজা বলেন—"একা আমি যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।"

তারপর, ত্রিচূড়ের প্রমোদবনের মধুর শান্তি তাঁহার মধ্যে শান্তি-অনুভব-বক্ষকে স্পন্দিত করিয়া তুলে—রাজা স্মরণ করেন—"শান্তি যে শীতল এত,

এমন গম্ভীর, এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে ছিনু যেন।" এই শীতল শান্তির স্পর্শেই হারানো শান্তির স্মৃতি এবং আক্ষেপ জাগে—"এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের, গেল কার অপরাধে। আমার কি তার যার-ই হোক—এ জনমে আর কি পাব না।" রাজার প্রেমতৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় কেবল অনুতাপ বহন করিয়া দিন যাপন করিতে চাহে না—নব—প্রেমের স্পর্শ চাহে (এই চাওয়াটুকু রাজা বিক্রমদেব-চরিত্রটিকে খুবই খেলো করিয়া দিয়াছে); ইলাকে দেখিযা তিনি মুগ্ধ হন—কিন্তু ইলার হৃদয়কেও তিনি জয় করিতে পারেন না। জানিতে পারেন—ইলার প্রেমাস্পদ কুমারসেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ইলার প্রেম ঐকান্তিক—'প্রবল প্রেম'। ইলার ঐকান্তিক প্রেমের মহিমা তাঁহার প্রেমিক-সত্তাকে আবার জাগাইয়া তুলে। "প্রেমস্বর্গচ্যুত" স্বর্গের ভ্রান্তি দিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির উপায় হাত-ছাড়া বলিয়া পরোক্ষ পরিতৃপ্তির পথেই আত্মতৃপ্তিকে কুড়াইতে চাহে—নিরুপায় পরিতৃপ্তি-কামনা জাগে—প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি তোমাদের দেখে ধন্য হই।'' রাজা যুদ্ধের মধ্যে আর উত্তেজনা পান না—"যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে।'' কিন্তু যুদ্ধবিরতিজনিত যে শান্তি সে শান্তিও যে তাঁহার দ্বিগুণ অসহ্য। গতি আজ আর সুখ দেয় না, অথচ স্থিতির মধ্যে ফিরিয়া যাইতেও তাঁহার মন চাহে না, কারণ স্থিতি তাঁহার শূন্যতার হাহাকারে পরিপূর্ণ। যাঁহাকে লইয়া স্থিতির মাধুর্য্য সেই প্রেমময়ীর জন্য তাঁহার অন্তর করুণ আক্ষেপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—"

''আমি কোন্ সুখে ফিরি দেশ দেশান্তরে স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা—অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।'' অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—"কোথা আছে কোন স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে—প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল। ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।" তাঁহার

অন্তর্জ্বালা, বহির্মুখী হিংসা-শিখায় আর কাহারো দিকে ধাইয়া যাইতে চাহে না,—নিজের অন্তরকেই গোপন দহনে ঘিরিয়া রাখে। রাজা যেন দেহে-মনে পরিশ্রান্ত—অবসন্ন। এই করুণ অবসাদে—অতৃপ্তি এবং নৈরাশ্যের শূন্যতায় —রুদ্ধকণ্ঠ অভিব্যক্তির মত রাজার কারুণ্য মৌন-মুখর। এই নৈরাশ্যের অকূলতার মধ্যে শেষ আশ্রয়ের মত জাগিয়া আছে—ইলা ও কুমারসেনের মিলনের আকাঙ্ক্ষাটুকু। তাই দেবদত্তের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ,—"বন্ধু ফিরে চলো দেশে।·····এক কাজ বাকি আছে······অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া······সখে তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে, আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে।" কিন্তু তাঁহাকে না পাওয়ার বেদনায়—হিংসাতপ্ত অভিশপ্ত প্রাণ লইয়া তিনি দেশ দেশান্তরে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহাকে পাওয়ার একান্ত কামনা আজ অভিমানের অন্তরালে বসিয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছে, তাঁহার কথাকেও রাজা চাপিয়া রাখিতে পারেন না; নিরুদ্ধ আবেগে বলেন —"আর, সখা—আর-কেহ যদি থাকে সেথা—যদি দেখা পাও আর-কারো—।"দেবদত্তকে দেখিয়া রাজার নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার কেমন যেন পাতলা হইয়া যায়। রাজার মধ্যে আশার আলো জ্বলে—"আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখভার।" এই গোপন আশা লইয়াই রাজা কাশ্মীরে গমন করেন—কুমারসেন-ইলার মিলনকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য,—"আর কেহ"কে পাওয়ার আশাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বিক্রমদেব তাই আশা-উদ্দীপনায় উৎসাহী—মন তাঁহার নূতন চরিতার্থতার আনন্দে অনেক পরিমাণে প্রসন্ন। রাজা সোৎসাহে দেবদত্তকে বলেন— "করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে।······পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার আয়োজন"। রাজা এই পরোক্ষ পরিতৃপ্তির মধ্যেই কৃতার্থতার আস্বাদ পান। শিবিকার আগমন সংবাদে

রাজা আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে নির্দ্দেশ দেন—'বাদ্য কোথা বাজাইতে বলো।' অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিজেও অগ্রসর হইয়া যান। কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফল বজ্রপাতের ভীষণতা এবং আকস্মিকতা লইয়া দেখা দেয়।

মোহময় প্রেম তাঁহার মধ্যে অনির্ব্বাণ অতৃপ্তির অন্তর্দ্দাহ হইয়া আছে, আর সেই মোহময় ভালোবাসা ব্যাহত হইয়া যে অন্ধ হিংসার রূপে বিশ্বকে আঘাত করিয়া আত্মতৃপ্তি খুঁজিয়াছে, তাহারই এক আঘাত 'চির-অপরাধের' আত্ম-গ্লানি রূপে রাজাকে গ্রাস করিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্ধ হিংসার আঘাত কুমারসেনকে 'আত্মহত্যা' করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে। সুমিত্রা-কুমারের কর্ত্তিত শির স্বর্ণথালে লইয়া প্রবেশ করিয়া—রাজার উৎসব-আয়োজনের দীপগুলিই নিবাইয়া দেয় না—অপ্রত্যাশিত আঘাতে রাজাকে বিস্ময়ে ও বিষাদে নির্ব্বাক করিয়া দেয়। যে গোপন-আশার উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া রাজা কাশ্মীরে আসেন সেই আশার আলোও এক ফুৎকারে নিবিয়া যায়। সুমিত্রাও রাজাকে ক্ষণপ্রভার মত আশার আলোয় আলোকিত করিয়া অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করেন। অনুতাপ এবং চির-অপরাধের গ্লানিতে রাজার হৃদয় আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া যায়। এমনি করিয়া নিবিবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার আশার-আলো ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে—এই বিক্রমদেব এবং তপতীর বিক্রমদেব ভাবে ও পরিকল্পনায় এক নহে)।

নাটকের এই পরিকল্পনা ভাবসত্যের দিক দিয়া আপত্তিকর হইতে পারে না, বরং ইহাই সত্য যে পরিকল্পনাটির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধির বিশেষ একটি জটিল রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তবু এ কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক যে উপ-আখ্যানটি অনাবশ্যক না হইলেও, যে-ভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে অনাবশ্যক ভাবে জায়গা জুড়িয়াছে—অর্থাৎ ইলা-কুমারসেনের দৃশ্যগুলি 'প্রত্যক্ষ-নেতৃচরিত্র' না করায় নিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—নাটকীয়

প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া ইহা নিরপেক্ষ স্বকীয়তা বিস্তার করিয়াছে, এই বিস্তারটুকুই অবান্তর বলা যাইতে পারে। মোটকথা, ইলা-কুমারসেনের প্রেমকে অত প্রত্যক্ষবৎ না করিয়া পরোক্ষ বিবৃতির সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই উচিত ছিল। তাহা হইলে—সমগ্র উপ-আখ্যানটিই পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত না। এই কারণেই—তৃতীয় অঙ্ক হইতে ঘটনা-বিন্যাসে বেশ খানিকটা শিথিলতা বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়াছে। প্রধান ঘটনার অভিমুখী করিয়া ঘটনা স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উপখ্যানটি এক-কেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়ায় নাই—মূল কাহিনীটি শেষদিকে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দ্বিধা-বিভক্তি একেবারে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত যেমন নহে, তেমনি ইহা নাটকীয় উপযোগিতায়ও কম শক্তিমান নহে। শাখা নদীটি মূলস্রোতে আসিয়া মিশিবার স্থানে যেমন একটা আলোড়ন ও ব্যাপকতা সৃষ্টি করে, উপ-আখ্যানটিও সেইরূপ নাটকের উপসংহারকে ভাব-তীব্র করিয়া তুলিয়াছে।

চরিত্র-পরিকল্পনা।

(ক) রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রের রূপ-রেখা যাহাই হউক, চরিত্রটির মধ্যে দুই একটি অসঙ্গতি বা ত্রুটি না পাওয়া যায় এমন নহে। প্রথমেই যে পুরোহিত-বিরাগ এবং নিন্দা দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহার উপযোগিতা একটুও দেখানো হয় নাই। তারপর প্রথমেই রাজার মুখে—"বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী"—চরিত্রটির আসল প্রবৃত্তির বিরোধী, এবং বাক্যটি চরিত্রের কোন ধর্ম্মকেই ব্যক্ত করিতে পারে নাই। এমন কথাও বলা চলে না যে, ঐ কথাটির দ্বারা চরিত্রের মূল ভাবটিকেই গোপন করিবার চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ ঐরূপ পরিকল্পনা ব্যক্তই হয় নাই। তৃতীয়তঃ রাণীর প্রতি ঐকান্তিক আসক্তির সত্তাটি আসংজ্ঞান স্তরে যাইয়া দাঁড়াইলেও তাহার ক্রিয়া আভাসিত

না রাখিয়া অন্ততঃ দুই একটি স্খলিত শব্দে আভাসিত করা উচিত ছিল—অবশ্য দ্বন্দ্বের রূপেই। চতুর্থতঃ ত্রিচূড়ের উপবনে নব প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেওয়ায়, 'রাণী-কামনা'-বন্ধের জোর বেশ খানিকটা হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থলটি রাজার চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্ব্বলতা এবং অসঙ্গতি।

(খ) রাণী সুমিত্রা চারিটি ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত। সুমিত্রা প্রেয়সী, সুমিত্রা মহিষী, সুমিত্রা কাশ্মীর-কন্যা, সুমিত্রা ভগিনী। চরিত্রে এই ব্যক্তিত্ব-সমূহের সন্তোষজনক সমবায় ঘটিতে পারে নাই। সুমিত্রা প্রথম দিকে অতি-সামান্য প্রেয়সী এবং অসামান্য মহিষী এবং শেষ দিকে ভগিনী এবং কাশ্মীর-কন্যা। প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে—"সঁপিলাম এ জীবন মোর তোমার লাগিয়া" বলিয়া ভ্রাতার কাছে আত্মসমর্পণ করিলেও, এ কথা সকলেই বলিবে যে, রাণীর প্রেয়সী-চেতনা বা 'প্রজার-জননী'-চেতনা নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। "রাজারে মার্জ্জনা করো"—এই অনুরোধটুকু ছাড়া প্রেয়সীর কোন পরিচয়ই আর পাওয়া যায় না। মহিষী তো একেবারেই নীরব। হিংসোন্মত্ত রাজাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রেয়সী-সুমিত্রা কোন সন্তোষজনক চেষ্টা করেন নাই, তেমনি প্রজাদের জন্যও মহিষী-সুমিত্রার হৃদয় ভুলিয়াও কাঁদে নাই, একবার মাত্র সামান্যা নারী সুমিত্রাকে আক্ষেপ করিতে শোনা যায়—

> "আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
> অন্তঃপুর ছাড়ি।......................"

কিন্তু এখানে সুমিত্রা বুদ্ধিহীনা—ব্যক্তিত্ববিহীনা এবং ভ্রাতার "পদপ্রান্তে মৌন ছায়া"। ভগিনী-চেতনাই এখানে প্রবল। কিন্তু ভগিনী এবং কাশ্মীর-কন্যার চেতনার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মত কারণ নাটকে খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই।

তারপর চরিত্রটিতে স্ব-বিরোধী ভাবও দেখা যায়—তিনি নিজে রাজ-কার্য্যে হাত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, বরং মহিষীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কিছুই করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন রেবতী (খুড়ী) রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ধিক পাপ! চুপ করো মাতা! নারী হয়ে রাজকার্য্যে দিয়ো না দিয়ো না হাত……হেথা হতে চলো ফিরে দয়ামায়াহীন ওই সদা-ঘূর্ণমান কর্ম্মচক্র ছাড়ি।……যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য্য নহে।"

এই হিসাবে সুমিত্রা খুব সুগঠিত নহে—সব কয়েকটি ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে চরিত্রটি একক শক্তিক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই চরিত্রটি 'কিন্তু'র অধীন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং চরিত্রটিকে খুব পরিস্ফুট বলা চলে না। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য লিখিয়াছেন—"সমগ্র নাটকটিতে প্রায় সবগুলি চরিত্রই সুপরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বিক্রম ও সুমিত্রার……।" ডাঃ রায়ের সহিত সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না এবং এই কারণেই যায় না যে রাণী সুমিত্রা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাঁহার অতীত সত্তাকে একেবারেই যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শৈশব-স্মৃতির সম্মোহনের আওতায় আবদ্ধ হওয়ায় সুমিত্রা প্রেয়সী ও মহিষী-সত্তা সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। এই চেতনাহীনতা চরিত্রের পরিস্ফুটতার পরিপন্থী।

(গ) দেবদত্ত 'রাজা ও রাণী' নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। দেবদত্ত "রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ"। তাই বয়স্যের স্বাধীনতা তাঁহার আচরণে সর্ব্বদাই পরিস্ফুট। ইহা ছাড়াও তাঁহার বড় বৈশিষ্ট্য—চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য—শ্লেষ-বক্রোক্তি-পটুতা। যাগ-যজ্ঞবিধি শ্রুতি-স্মৃতি বিস্মৃতির জলে চালিয়া দিলেও ভাষা ও ভাবের উপর শাসনটি খুবই আছে। এই শ্লেষ-বক্রোক্তির রচনা-রসে ভরপুর থাকে বলিয়া দেবদত্তের বচন অপ্রিয় সত্যকেও

প্রীতিকর করিয়া তুলে। এই মুখের বা মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য আছে ; এই বৈশিষ্ট্য—বুকের বা হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। রাজাকে সে হৃদয় দিয়া ভালবাসে এবং সত্যই সে সম্পদে-বিপদে বন্ধু এবং অকৃত্রিম বন্ধু। দেবদত্ত রাজাকে হৃদয় খুলিযাই আপনাকে দেখাইয়াছে—

"সখা, এ হৃদয় মোর জানিও তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তা
সে ও আমি সব অকাতরে, রোষানল
লব বক্ষ পাতি......... . ..."

তাহার এই প্রকৃতি হইতেই স্ত্রী নারাযণীর কাছে এই উক্তি বাহির হইয়াছে—"রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পাচ্ছিনে—আমি চল্লুম।" দেবদত্ত উচিত বক্তা কিন্তু হৃদয়বান রসিক। সে শুধু রাজাকেই উচিত কথা বলে না, 'রাস্তা থেকে কুড়িযে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুকও জুটাইয়া আনে।

(ঘ) চন্দ্রসেন কাশ্মীর-রাজ—যুবরাজ কুমারসেনের এবং সুমিত্রার খুল্লতাত। চন্দ্রসেন এককথায ধার্ম্মিক-সুজন এবং—কর্ত্তব্যপরায়ণ। স্বার্থবুদ্ধি তাঁহার ধর্ম্ম-বোধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই এবং তাঁহার হৃদয়কেও পৈশাচিক প্রবৃত্তি অধিকার করিতে সক্ষম হয নাই। খুল্লতাতের স্নেহ হইতে তিনি কুমারসেনকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাই তাঁহার স্নেহময আদেশ—"দর্পমদে ইচ্ছা করে বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্ব্বাদ করি, ফিরে এসো জযগর্বে অক্ষত শরীরে পিতৃসিংহাসন পরে।" স্ত্রী রেবতীর মত পাপীয়সী এবং পিশাচী নারীর অবিরাম প্ররোচনা ও এই চন্দ্রসেনের স্বভাব-সৌজন্যকে বিকৃত করিতে পারে নাই—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা। রাজার প্রতিটি কার্য্যকে এবং আচরণীকে রাণী রেবতী ষড়যন্ত্রের দৃষ্টিকোণ

হইতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলে, চন্দ্রসেন নিজেকে প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই—রাণীকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

"ছি ছি রাণী, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে !
মনে হয়, সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি। আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে। কর্ত্তব্যের পথ হতে
ফিরায়ো না মোরে।"

কিন্তু দুর্ব্বলতার স্পর্শ কি তাহাতে একটুও নাই ? রেবতী যখন বলিলেন --"তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি···করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ" চন্দ্রসেন রাণীকে অনুরোধ স্বরে—"যেয়ো না চলিযা" বলিলেন কেন ? এই কথাটি নিষ্ঠুর কথা বলিযাই কি রাণীর মুখ দিয়া তিনি বলাইতে চাহেন ? অথবা—উহা একটা কথার-কথা মাত্র ? যাহাই হউক, চন্দ্রসেন কুমারকে মনে বা বাক্যে কোন আঘাতই দিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য —আক্রমণকারী "জামাতা", আর নিজে শুধু কুমারের খুল্লতাতই নহেন, তিনি রাজা, এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া খুব সহজ কাজ নহে। তাঁহার প্রশ্ন—"বিক্রম কি নহে বৎস কাশ্মীর-জামাতা। সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে, অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ।' অন্যদিকে—"রাজকার্য্য মনে রেখো সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ কেমনে করিব স্থির মুহূর্তের মাঝে।" এই বিচার-বুদ্ধির জন্য কুমারসেন তাঁহাকে ভুল বুঝিল—বিদায়ও গ্রহণ করিল। কিন্তু চন্দ্রসেনের কথা এখানে যেন কেমন একটু শুষ্ক আন্তরিকতার মত শোনায়! তাঁহার স্নেহ খুব নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি প্রায় নাই। আরো 'কিন্তু'র বিষয় এই যে—চন্দ্রসেন বিক্রমদেবের নিকট কুমারের যে শাস্তি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা খুব নির্দ্দোষ হৃদয়ের কথা হইয়া

উঠে নাই এবং তাহাতে তাঁহার নিজেরও দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রসেনের অনুরোধ—

"ক্ষমা তারে করো, বৎস—
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়া বঞ্চিত, কেড়ে নিও
সিংহাসন-অধিকার। নির্বাসন সেও
ভালো, প্রাণে বধিয়ো না।"

এই উক্তিটিকে স্নেহ এবং অ-স্নেহ দুই দিকেই বাঁকানো যাইতে পারে। তারপর রাণী রেবতীর কথা বুঝাইয়া বলিতে যাইয়াও চন্দ্রসেন সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করিযাছেন। কুমারসেনকে রাজবিদ্রোহী প্রমাণ করিবার চেষ্টা চরিত্রের সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছে বইকি। চন্দ্রসেন শেষ দৃশ্যে যে 'নীরবতা' দেখাইয়াছেন তাহা খুবই জটিল। তবে কি রাণীর কথাই সত্য—"আপনার কাছ হতে, রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন"। তবে কি কুমারসেনের আগমনকে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না? যিনি কিছুকাল আগে শুধু "প্রাণে বধিযো না"—অনুরোধ জানাইয়াছেন, কুমারের আত্মসমর্পণে আঘাত লাগা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এস্থলে চন্দ্রসেনের ব্যক্তরূপ এই—"বিদ্রোহী সে মোর কাছে"···"সিংহাসন হতে তারে করিব বঞ্চিত।" কিন্তু কুমারসেনের প্রতি—যুবরাজের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিমান? কুমারসেন ভিক্ষা-স্বরূপ পিতৃসিংহাসন লাভ করিবে—এ চিন্তা অসহ্য বলিয়াই কি চন্দ্রসেন কুমারকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? চন্দ্রসেনের ক্ষোভ—"নহে ইহা কুমারসেনেব মতো কাজ। দৃপ্ত যুবা সিংহসম; সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া এতই কি বলবান।" কুমারসেনকে ভালবাসেন বলিয়াই তাঁহার এই ক্ষোভ, এই অভিমান।—চরিত্রটি ক্রমেই ব্যক্ত হইয়া উঠে—কুমারসেনের প্রতি

সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, রাজাকে তিনি অনুরোধ করিলেন—"মহারাজ, শোনো নিবেদন গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও। এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার।"

শেষ পর্য্যন্ত—

সমস্ত সন্দিগ্ধ চক্ষুকে নিরসন করিলেন চন্দ্রসেন, যখন সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া মাথা হইতে মুকুট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং রাণী রেবতীকে তীব্রতম ভৎ'সনা করিলেন—"রাক্ষসী পিশাচী—দূর হ' দূর হ'—আমারে দিসনে দেখা পাপীয়সী।" চন্দ্রসেন যথার্থই 'ধার্ম্মিক সুজন।'

(ঙ) রেবতী চন্দ্রসেনের বিবাহিতা স্ত্রী বলিয়াই নামতঃ ধর্মপত্নী বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ—"রাক্ষসী পিশাচী—পাপীয়সী। চন্দ্রসেনের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মের উপাসিকা। বিক্রমদেবের মনোদর্পণে রেবতীর যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—তাঁহার ললাটে "শাণিত ক্রুর বক্র জ্বালারেখা" তাঁহার অধরের দুই প্রান্ত রুদ্ধ হিংসাভারে নুইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার উষ্ণ তিক্ত বাণী তীক্ষ্ণ ও "খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষমাখা"। রেবতী স্বার্থপরতায় অন্ধ এবং নিষ্ঠুর।—লেডী ম্যাকবেথের স্নায়ু দিয়াই যেন সে গঠিত। কিন্তু এই অন্ধতা এবং নিষ্ঠুরতাই চরিত্রটির আপাদমস্তক পরিচয় নহে। এই অপ্রশংসনীয়—এমন কি ঘৃণ্য আচরণের অন্তরালে যে প্রেরণা কাজ করিয়াছে, তাহাকে কিন্তু নিরপেক্ষভাবে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রেবতীর মধ্যে অত্যুগ্র আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কামনা—স্বাধীনতা-কামনা এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তা সত্যই একান্ত। পুত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তাই রেবতীকে রাক্ষসী—পিশাচী এবং পাপীয়সী করিয়া তুলিয়াছে। রেবতীর সুস্পষ্ট আত্ম-প্রকাশ—

"আমি ও পালিব তবে
কর্ত্তব্য আপন।........

রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো—
রিক্ত-হস্তে পরের সম্পদ-ছায়ে ফেরা
ধিক্ বিড়ম্বনা।...... ....
.. ..আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ।"

এই কারণেই পুত্রের জন্য সিংহাসনখানি নিষ্কণ্টক করিতে রেবতী বদ্ধপরিকর। তাই হৃদয়ে তাহার হিংসাতৃষ্ণা। এই অতি-তৃষ্ণা মরীচিকা সৃষ্টি না করিয়াও পারে নাই। স্বামীর প্রতিটি কার্য্যকে—প্রতিটি আচরণকে সে কুমার-বিরোধী যড়যন্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছে। হিংসা-দীপ্ত অন্তরের প্রতিফলনই সে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইয়াছে। আর একটি বৈশিষ্ট্যও চরিত্রে লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয় বটে—রেবতী স্বার্থান্ধ, কিন্তু অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস-এর মতো অসাধারণ এবং দুর্লভ গুণও তাঁহার আছে। রেবতী নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা তাঁহার অকৃত্রিম স্বীকৃতি—"পারিনে লুকাতে আমি হৃদয়ের ভার। স্নেহের ছলনা করা অসাধ্য আমার।" বস্তুতঃ চরিত্রটি কখনও চরিত্রহীন হয় নাই।

(চ) শংকর চরিত্রটি অপূর্ব্ব ভাব-সমৃদ্ধ একটি চরিত্র। ডাঃ নীহাররঞ্জন ঠিকই বলিয়াছেন—"এই বৃদ্ধ ভৃত্যটির স্নেহপ্রাণ তেজোদীপ্ত চরিত্রটি বহুবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, কিন্তু তাঁহার এই একটুখানি পরিচয়ই আমাদের চিত্তের সমস্ত সম্ভ্রমকে আকর্ষণ করে.........।" শংকর স্নেহপ্রবণ

বৃদ্ধ ভৃত্য বটে, কিন্তু তাঁহার এই স্নেহ স্নেহাস্পদের দেহটিকে বা প্রাণটিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মিক-সত্তা বা মহিমা-সত্তা পর্য্যন্ত প্রসারিত। স্নেহাস্পদের মহিমা-দীপ্ত সত্তাটিকেই শংকর হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া সেবা করিতে চাহে। তাঁহার স্নেহ দুর্ব্বলের অল্পপ্রাণ স্নেহ নহে, স্নেহাস্পদকে বড়ো করিয়া রাখিতে যে স্নেহাস্পদকেই হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে। শংকর কুমারসেনকে ভালোবাসে—কাশ্মীরের রাজ-বংশধর রূপেই ভালোবাসে। বীর কুমারসেনকেই সে ভালোবাসে—কীর্তিমান কুমারসেনকেই সে সেবা করিতে চাহে। "আমি কি সহিতে পারি তব অপমান"—এই ভাবটাই শংকরের স্থায়ীভাব। তাই কুমারসেন যখন ক্ষমাকে 'বীরত্ব অধিক' বলিয়া কাশ্মীরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন, শংকর অস্থির বেদনায় কহিল—"হায়, এ কী অপমান, পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি।" কিন্তু শংকর একেবারে হৃদয়হীন আত্মাভিমানী নহে। হৃদয়ের কাছে আবেদন করিলে—বিশেষতঃ শংকর বা সুমিত্রা—যাহাদের সে ("কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে") স্নেহপাশে কোলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—কোন আবেদন জানাইলে সে তাঁহার সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারে না। তাই সুমিত্রা ছেলেবেলার কথা স্মরণ করাইয়া যখন সেই পুণ্য স্নেহতীর্থে ফিরিয়া যাইতে চাহিল, শংকর আত্মাভিমানের হিসাব ভুলিয়া গেল, শংকর বলিল—

"চলো দিদি, চলো ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকালমাঝে।"

কিন্তু শেষ দৃশ্যে শংকর প্রকৃত স্নেহের অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছে। তাঁহার স্নেহের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। কুমারসেন আত্মসমর্পণ করিবে—কাশ্মীরের রাজ-মহিমাকে ধুলায় লুটাইয়া দিবে—আত্মাবমাননার শেষ ধাপে যাইয়া দাঁড়াইবে—শংকর কি তাহা সহ্য করিতে পারে? শংকরের বুকে এক অনির্ব্বচনীয় অন্তর্দ্দাহ জাগিল—তাঁহার হৃদয় যেন ছিঁড়িয়া যাইতে

চাহিল এবং হৃদয় চিরিয়া আর্ত্তনাদ বাহির হইল—"চিরভৃত্য তব, আজি দুর্দ্দিনের আগে মরিল না কেন।" বিক্রমদেবের আন্তরিক উক্তিকে ব্যঙ্গোক্তি মনে করিয়া দৃপ্ত তেজে শংকর উত্তর করিল—"রাজন্, তোমার কাছে আসিনি কাঁদিতে।" সত্যই স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ ছাড়া তাঁহার হৃদয়বেদনা কে বুঝিবে? বিক্রমদেবের মার্জ্জনা-লব্ধ মুক্ত জীবন অপেক্ষা দণ্ড-পীড়িত দুঃসহ জীবনই যে তাঁহার কাম্য—তাই কুমারসেনের ছিন্ন শির লইয়া যখন শিবিকা প্রবেশ করিল শংকর লজ্জায় ক্ষোভে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শংকর যখন দেখিলেন কুমারসেন প্রাণভয়ে মান বিলাইয়া দেন নাই, মরিয়াই খাঁটি রাজার মত সিংহাসনে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন করুণতম আনন্দে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া মহাপ্রাণ স্নেহরাশি উৎসারিত করিয়া দিল—

"প্রভু, স্বামী
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো।...... ...
.... এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে।"

কুমারসেনের প্রেমেই শংকর কুমারসেনকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিল—ছিন্ন শিরকেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিল।

এইবার চরিত্র-পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে "রাজা ও রাণী" নাটকের চরিত্র-সৃষ্টিতে 'প্রকাশ' অপেক্ষা 'বিকাশ'ই লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং চরিত্রগুলি ভাব-স্ফীত হইলেও, স্থিতিশীল নহে—গতিশীল—অর্থাৎ একই ভাব-বন্ধের আকর্ষণে আবর্ত্তিত হয় নাই। তবে, অনেকস্থলে নাট্যকার আপন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে পারেন নাই,

এবং পারেন নাই. বলিয়াই চরিত্রগুলি অনেকস্থলে জৈবিক-প্রায় একক (organic whole) হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং কয়েকস্থলে উহাতে অসঙ্গতিও দেখা দিয়াছে।

নাটকখানির ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পরে এইবার নাটকখানির ভাব ও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

নাটকের ভাব ও ভাষা

(ক) নাট্যকার নাটকখানির মুখ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন—"বিক্রম···প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। ·· ···এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।"

তারপর, 'তপতী' নাটকের ভূমিকাতেও লিখিয়াছেন—

"বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা।"

(খ) দ্বিতীয়ত, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় "রাজা ও রাণীর অন্তরের রহস্যটি" এইরূপ ধারণা করিয়াছেন—

"বিক্রমদেবের চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া একটি সত্য একটি

'আইডিয়া' এই নাটকটির মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।……যতদিন বিক্রম সুমিত্রার প্রতি প্রেমে আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইযা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি সত্য প্রেমের আভাস লাভ করিতে পারেন নাই; তারপর, একদিন সুমিত্রাকে নিজেই যখন পথে বাহির হইযা যাইতে হইল, তখনই তাহার স্বপ্ন টুটিল, আপনাকে জানা সম্ভব হইল, এবং নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে-তিনি জাগ্রত হইলেন। কিন্তু এ জাগরণও সত্য জাগরণ নয়……যেন এক মোহের আচ্ছন্নতার ভিতর হইতে মুক্তিলাভ করিযা আর এক আচ্ছন্নতার ভিতর নিজকে ডুবাইয়া দেওয়া! জীবনের রহস্য প্রেমের রহস্য এত সহজে তাঁহার কাছে ধরা দিল না, তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দিতে যে এখন ও বাকী…জীবনের যে-সন্ধান লাভের জন্য এই উন্মত্ত অভিযান সে-সন্ধান কোথায়?……ইলার…সর্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের পরিচয়ের সম্মুখে বিক্রমের আচ্ছন্নতা যেন সূর্য্যোদযে কুয়াসার মত কোথায উবিয়া গেল, তাঁহার সমস্ত চৈতন্য এক মুহূর্ত্তে যেন ফিরিয়া আসিল।…কিন্তু তাহার পরও প্রেমের রহস্য, জীবনের রহস্য যে এখনও অনেক দূরে—এখনও যে তাহার জন্য অনেকখানি মূল্য দেওযা বাকী।……আক্ষেপ অনুতাপের আগুনে নিজেকে পোড়ানো হইল কোথায়?…দুঃখের অগ্নি পরীক্ষার প্রয়োজন তাহার বাকী ছিল; সুমিত্রাকে আত্মদান করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে হইল……।"

আমার মনে হয়—নাটকের রূপ হইতে উল্লিখিত মর্ম্মার্থ সন্তোষজনকভাবে পাওয়া যায় না। যাহা পাওযা যায় তাহা এই যে, মোহগ্রস্ত প্রেম আপন গতিবেগেই আপনার মধ্যে বিকার সৃষ্টি করে—বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া বিশ্ব হইতে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং সে শুদ্ধ যে প্রেমাস্পদকেই আত্মসাৎ করিয়া বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তৃপ্তি পাইতে চাহে তাহা নহে, তাহার ভোগে ব্যাঘাত ঘটিলেই সে ক্রোধেও অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং বিশ্বকে আঘাত করিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেকেই আঘাত

করিয়া বসে। মোহ্-স্বভাব ব্যক্তি নিজের ভার-সাম্য রক্ষা করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই অতৃপ্তির এবং অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহ তাহার অবশ্যম্ভাবী সহচর এবং পরিণাম হয়। মোহ অতি-ইচ্ছার অতি-বেগে অন্ধ, তাই "দেখিতে না পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।" আর এই প্রেমেরই বিপরীত আত্মোৎসর্গ-মহিমান্বিত উদার-শান্ত মোহ্-মুক্ত প্রেম, যে প্রেম প্রেমাস্পদকে পূর্ণমহিমার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতেই দেখিতে ভালবাসে এবং প্রেমের মহিমা রক্ষা করিতে যে প্রেমাস্পদকেও ছাড়িয়া যাইতে বা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বলা যায় যে—চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বগুলির কোন একটির অতি-বৃদ্ধি, সমগ্র ব্যক্তিটির ভার-সাম্য নষ্ট করিয়া ফেলে এবং ব্যক্তিটি কখনও পরিবেষ্টনীর সহিত সুষমভাবে অভিযোজন করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই নিজের সবনাশ নিজেই সৃষ্টি করিতে থাকে।

এই গেল নাটকের মুখ্য ভাবের আলোচনা—প্রেমতত্ত্বের আলোচনা। ইহার পাশেই, নাটকখানিতে আরো একটি ভাবব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

টমসন্ সাহেব যে বলিয়াছেন—"It will be at once grasped that the play has a double meaning, it has a political reference, which helps to explain its very considerable measure of popularity on the stage"—তাহা এই পর্য্যন্তই সত্য যে নাটকখানির মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত এবং প্রতিকারের ইঙ্গিতও বেশ পাওয়া যায়—বৈদেশিক শাসনের স্বরূপের এবং স্বাভাবিক ফলের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। মন্ত্রী, দেবদত্ত এবং প্রজাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হইয়াছে। মন্ত্রী যখন বলেন—'বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত বসে

বসে হাসে…', তখন ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপটাই আভাসিত হইয়া উঠে; আবার, দেবদত্ত যখন—'জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল'কে উপেক্ষা করিতে বলেন, সেখানেও দীন ভারতীয় জনসাধারণের মূর্ত্তি চোখের উপর আসিয়া দাঁড়ায় এবং রাজা, অমাত্য প্রভৃতির সমালোচনা করিতে যখন বলেন—"এসেছে বিদেশ হতে রিক্তহস্তে সে কি শুধু দীন প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে"—তখন ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবের উপরই তীব্রালোক ফেলিয়া উহাকে আলোকিত করা হয়। মোটকথা, ইহাদের উক্তির মধ্যে, শোষণ এবং শাসনের স্বরূপকে খুবই সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। আর প্রজাদের মধ্যে—কুঞ্জরলাল স্পষ্টভাষায় বলে—"ভিক্ষে করে কিছু হবে না—আমরা লুট করব"। সকলেই—"আগুন" প্রস্তাব গ্রহণ করে, 'রাজা যদি শাস্তর না শোনেন', তখনকার উপায়ও কুঞ্জর স্থির করে—"শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগৃহীতদের স্বরূপও প্রকাশ করে—"রাজবাড়ির সিধে খেযে খেয়ে ফুলছ।" ধনবণ্টন বৈষম্যের বিরুদ্ধেও কাশ্মীরের হাটে বেশ উত্তেজনা দেখা যায়। মহাজনদের নির্দ্দয় সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পায়—"তুমি রাখতে গম জমিয়ে আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায় সেইটে হবে না।"—এই ভাব…এই ভাবগুলি তদানীন্তন রাজনৈতিক চেতনার প্রণেতার অনুকূল এবং সেই কারণেই চিত্তাকর্ষক। রাজা ও রাণীর মঞ্চ-সাফল্যের নানা কারণের মধ্যে এই ভাবগুলিও অন্যতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রাজনৈতিক ভাবগুলি থাকাতেই টমসন্ সাহেব—'political reference' দেখিতে পাইয়াছেন।

তারপর—রচনার কথা।

রবীন্দ্রনাথ যে রচনা-রসের রাজা এ নাটকেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদত্তের বক্র-উক্তিগুলি, শ্লেষের খোঁচাগুলি যেমন তীক্ষ্ণ

তেমনি রসালো। তারপর বিক্রমদেব, সুমিত্রা, কুমারসেন প্রভৃতি গম্ভীর চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে যে আলঙ্কারিক কল্পনায় উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার শিল্প-চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়; ভাব ও ভাষার কারুকার্য্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা রস-রুচির; এ ক্ষেত্রেও তাহার কোন দৈন্য দেখা দেয় নাই।

উপসংহারে সংক্ষেপে বলা চলে—'রাজা ও রাণী' একখানি রসোত্তীর্ণ নাটক, ঘটনা-বিন্যাসে রোমাঞ্চকরতা থাকিলেও আকস্মিক পতন ও মৃত্যু প্রভৃতি স্থূল ও রোমাঞ্চকর ঘটনা থাকিলেও, আবেদনের গভীরতা এবং সার্বজনীনতা-ধর্ম্মের গুণে নাটকখানি মেলোড্রামার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তারপর উপআখ্যানটী অবান্তর না হইলেও যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়াছে এবং যে পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে নাটকের বিষয়-ঐক্য বেশ একটু আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টি বিষয়ে এই বলা যায় যে, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হইয়া উঠায় কয়েকটি চরিত্র চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্র সাম্প্রতিক ভাবের প্রাধান্যে ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জটিলতা তথা গভীরতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভাবসমুজ্জলতা, বাগ্‌বিভবতা এবং আবেগ-শক্তি প্রশংসনীয় পরিমাণেই নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যিক নাটক (poetic drama) হিসাবে 'রাজা ও রাণী' একখানি সার্থকসফল নাটক।

রক্তকরবী

(মুখবন্ধ)

'Symbolism may be defined as the representation of a reality on one level of reference by a corresponding reality on another'.

—*Dictionary of World Literature*

ভাবানুভূতিকে ভাষার মাধ্যমে উপভোগ্যরূপে সৃষ্টি করিবার প্রেরণা হইতে কাব্য-শিল্পের জন্ম। এই সৃষ্টির এক প্রান্তে আছে—ব্যক্তির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, যাহা স্থানে-কালে বিস্তৃত নহে, এবং অন্য প্রান্তে আছে—মহাকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকতা—স্থানবিস্তার ও কাল-ব্যাপ্তির সমবায়ে গঠিত ব্যাপক আয়তন। (মহাকাব্য—উপন্যাসাদি) দৃশ্যকাব্য বা নাটক যেমন আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নহে বা কোন একটি কাহিনীর সরস বর্ণনা মাত্র নহে, ~~তেমনি মহাকাব্যের মত বহুপটিক ব্যাপকতা—স্থান-বিস্তার ও কাল-ব্যাপ্তির সমবায়ে গঠিত ব্যাপক আয়তন। (মহাকাব্য ও উপন্যাসাদি) দৃশ্যকাব্য বা নাটক যেমন আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নহে~~ তেমনি মহাকাব্যের মত বহুপটিক রচনাও নহে। ইহা সেই অনুভবাত্মক জীবন-কথারই প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশ যাহা স্থানে-কালে সুবিন্যস্ত তথা সুবিস্তৃত হইয়া কাহিনীর রূপায়তন লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ নাটক নানা-সম্বন্ধে-সম্বদ্ধ ব্যক্তির ব্যাপ্তিমান জীবন-কথারই প্রত্যক্ষ রূপায়ন। 'রূপ' মাত্রই দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হইতে বাধ্য বটে, সেই দিক হইতে প্রত্যেক রূপেরই দেশ-কাল-সাপেক্ষতা জনিত একধরণের ভাবগত বাস্তবতাও আছে। কিন্তু বাস্তবতা বলিতে আমরা

সেই দেশ-কালের সাপেক্ষতাই বুঝি যে, দেশ-কাল কল্পিত নহে—অন্ততঃ বিশ্বাসের মণ্ডলে যাহার সত্তা সুবিদিত। নাটক বলিতে সাধারণতঃ আমরা এইরূপ দেশ-কাল-সাপেক্ষ জীবনেরই রূপায়ন বুঝিয়া থাকি। ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকে এই বাস্তবতার মাত্রা ষোল আনা না থাকিলেও উহার কাছাকাছি থাকে—পৌরাণিক নাটকে কম থাকিলেও, না-থাকে এমন নহে অর্থাৎ সেখানেও দেশকাল-সাপেক্ষতা থাকে এবং সে দেশ-কালের সত্তা কল্পনায় বা বিশ্বাস-ভূমিতে। মোট কথা এই যে, সাধারণ নাটকে ভাব যে-রূপের মাঝারে অঙ্গ পায়, সেই রূপের বাস্তব গুরুত্ব থাকে যথেষ্ট।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, রূপ ভাবপ্রাধান্যের চাপে দেশ-কাল-সাপেক্ষতা হারাইয়া ফেলিতে পারে—লৌকিকতা যুক্তিযুক্ততা বা সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভাবকেই বিলক্ষণ প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। এই রীতিরই বিশেষ পরিণাম রূপক নাটক। রূপক নাটকে আরোপ অপেক্ষা আরোপ্যেরই প্রাধান্য। ভাব-সত্যকে অভিব্যক্ত করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। রূপের বাস্তবতা—অর্থাৎ লৌকিকতা, কার্য্যকারণনিয়মানুগত্য প্রভৃতি নানাবিধ ঔচিত্য রূপক নাটকে অতীব গৌণ। ভাব-সত্যের ব্যঞ্জনার জন্য যতটুকু রূপস্পর্শ দরকার, এই রচনায় রূপের সংযোগ ততটুকুই। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী "সিম্বলিস্টরা" রূপক কবিতা সম্বন্ধে যে ইস্তাহার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ভাষায়—"Symbolist poetry seeks to clothe the Idea with a sensory form which, however would not be its own end,······Thus in this art······all concrete phenomena are mere sensory appearances designed to represent their esoteric affinities with primordial Ideas."

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাষায়—"সে সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব নরনারীর সত্যকার কোন স্থান নাই; নাটকের প্লটের, তাহার

নরনারীর গতির বা কর্ম্মের কোন প্রাধান্য সেখানে নাই বলিলেও চলে।" রূপকের বড় এবং প্রধান ধর্ম্মই রূপের ব্যঞ্জনা দ্বারা ভাব-সত্যের উপস্থাপনা। এ সম্পর্কে এইরূপ অনুসিদ্ধান্ত করা যায়—

(ক) রূপক নাটকের বিষয়-বস্তুভাব-রহস্য বা ভাবতত্ত্ব (The Ideas)। এই ভাবতত্ত্ব শুধু আধ্যাত্মিকই হইবে এমন কথা নাই, সামাজিক বা প্রাকৃতিক ভাব-রহস্যও হইতে পারে ; এই বিষয়বস্তু এই অর্থেই অরূপ যে, ইহা একটা ভাব (Idea)—ভাবলোকেই ইহার জন্ম।

ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় রূপকের বিষয়-বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আমাদের চিত্তে এক এক সময়ে এক একটা কল্পনা-ভূতির স্পর্শ আসিয়া লাগে, এমন একটা রাজ্যের আভাস আমরা পাই যাহাকে এই দৃশ্য বাস্তবজগতের সংস্পর্শে আনিয়া কিছুতেই রূপ দেওয়া যায় না, যে-রাজ্যের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিদিনের সংসারের কোন মিল, কোন যোগ নাই, অথচ মনের মধ্যে এই অনুভূতি এত তীব্র, এত প্রবল, এত সত্য যে কিছুতেই এড়ান যায় না, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, এই যে কল্পনাভূতি ইহার আভাস মানুষকে দিতে হইবে।" ডাঃ রায়ের এই মন্তব্যটি আধ্যাত্মিক ধারণা বা কল্পনাভূতি সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু রূপক নাটক কেবল আধ্যাত্মিক সত্যেরই প্রতিভাত রূপ, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। যে-কোন ভাব-সত্যকেই রূপে সুবিন্যস্ত করা যাইতে পারে—রূপ-পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবায়িত করা যাইতে পারে। বড় বড় রূপক-কাব্য আধ্যাত্মিক বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত হইলেও উহাই রূপক-কাব্যের একমাত্র বিষয়-বস্তু নহে। রাশিয়ার বিখ্যাত সমালোচক ডি· মেরেজকোভ্স্কি সিম্বলিজমের পক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও বড় কথা—"mystical content." অবশ্য—"The aridity for that which has never before been experienced, the pursuit of elusive shades, of the

obscure and unconscions in our sensibility……"-র কথাও তিনি লিখিয়াছেন। যাহা হউক, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং ঐন্দ্রিয় অনুভূতি উভয় প্রকার অনুভূতিই রূপকের বিষয়-বস্তু হইতে পারে—এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন।

(২) তারপর, রূপক নাটকের চরিত্র এক একটা ভাবাদর্শের প্রতীক—সুতরাং ভাবাদর্শের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে পারাই চরিত্রের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিমাণের তারতম্য অনুপাতেই উহাদের সার্থকতা। এই নাটকের চারিত্রিক আকর্ষণ দ্বন্দ্বময়তায় নহে ভাবপ্রাণতায়—ভাবব্যঞ্জনার ক্ষমতায়। ইহারা দেহ ধারণ করে বটে, কিন্তু দেহগুলি বাস্তব বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষা ভাব-বায়ুরই বেশী অধীন। ইহারা নামে বাস্তব, কার্য্যে অবাস্তব। এক কথায়, ইহারা "ভাবে-ভরা ফানুস"।

(৩) ঘটনা-সংস্থাপনে এখানে কোন কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের বাধ্য-বাধকতা নাই। ভাবটিকে অভিব্যঞ্জিত করিতে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা ঘটাইতে পারিলেই ঘটনা-সংস্থাপনের উদ্দেশ্য সার্থক। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ভাবোপস্থাপনায় উহার কার্য্যকারিতা কতটুকু তাহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য।

(৪) রূপক নাটকের রস সাধারণ রস নহে, ভাবানুভূতিজনিত এক-প্রকার বিশেষ আনন্দই উহার আত্মা, এক কথায় বলা চলে—'ভাব'-রস। এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে, "কতকগুলি রস—যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে—তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই রসগুলির মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত তাহা নহে, প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট নহে।"

রূপকবাদের ক্রমধারা

অলঙ্কার হিসাবে রূপকের প্রয়োগ খুবই প্রাচীন, তেমনি প্রাচীন রূপক-কাহিনী ও কাহিনীর রূপক-ব্যাখ্যা। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা হইতে, সুপরিচিতের মাধ্যমে অপরিচিতকে চিনাইবার চেষ্টা হইতে—বাস্তবের সাহায্যে অবাস্তবের রূপায়িত করিবার চেষ্টা হইতেই রূপকের জন্ম।

সাহিত্য-রচনারীতির শাখারূপে মতবাদটি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিঘোষিত হয় ('Figaro'-তে) ; সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা "ডেকাডেণ্ট" নামে পরিচিত ছিলেন (২০ বছর আগে থেকেই) তাঁহারাই এই ঘোষণা প্রকাশ করেন। *

ফরাসী দেশকেই এই আন্দোলনের জন্মভূমি বলা যাইতে পারে কারণ এই দেশেই (ক) বুদেলেয়ারের সনেটে (Les Correspondences) সুইডেনবর্গের মতবাদ (Theory of Correspondences) পরিপোষিত হয়। তারপর বুদেলেয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন (খ) আর্থার রিম্‌বুদ (Arthur Rimbaud) এবং তাঁহাকে অনুসরণ করেন (গ) ভারলেন্ (Verlaine) ও (ঘ) ম্যালার্সে (Mallarsie)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সাহিত্যিকরা এই ম্যালার্সে এবং ভারলেন্‌কে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং নিজেদের নেতৃ-পুরুষরূপে দাঁড় করান। এক দল হইলেন "ম্যালার্সে-পন্থী",

* "Symbolist poetry seeks to clothe the Idea with a sensory form which, however, would not be its own end,··· Thus is this art···all concrete phenomena are mere sensory appearances designed to represent their esoteric affinities with primordial Ideas." (৬৭ পৃঃ দ্রঃ)

আর এক দল হইলেন—"ভারলেন্-পন্থী"। ভারলেন্-পন্থীদের মধ্যে (১) Le Cardonnel, (২) Somiain, (৩) Mikhael, (৪) Ridenbach, (৫) Maeterlink অগ্রগণ্য, আর ম্যাল্যাসে'-পন্থীদের মধ্যে অগ্রগণ্য (১) Ghil, (২) Dubus, (৩) Mockel, (৪) Manclair, (৫) Merrill, (৬) Verherren, (৭) Kahu, (৮) Laforgne প্রভৃতি।

এই আন্দোলনে নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িল অতি অবিলম্বেই। এক এক দেশে এক এক নামে দেখা দিল। ইংলণ্ডে ইহাদের নাম 'ডেকাডেণ্ট', আমেরিকায় 'ইমেজিষ্ট এবং সিম্বলিষ্ট', স্প্যানিশ আমেরিকায় এবং স্পেনে 'মডার্নিস্ট্যাস্' (Modernistas)।

রাশিয়াতেও এই আন্দোলন প্রসারিত হইতে বিলম্ব করে নাই। 'নবম দশকে' এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক হইয়া উঠিয়াছিল। ডি. মেরেজ-কোভ্স্কি (জন্ম ১৮৬৫) প্যারিস হইতে দেশে ফিরিয়াই "নতুন রীতি"র পক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিলেন, এই নূতন রীতি "which reflects the vague longing of an entire generation arising from the depths of the modern European and Russian spirit···we are witnessing the great and significant struggle between two views of life, two diametrically opposite conceptions of the world. In its ultimate demands, religious feeling clashes with the latest deductions of experimental science, and modern art is characterised by this principal elements : mystical content, symbols, and the development of artistic sensibility—which the French writers have rather cleverly called—*Impressionism.* The aridity for that which has never before been experienced, the pursuit of

elusive shades, of the obscure and unconscious in our sensibility is a characteristic feature of the ideal poetry of the future (*Russian Literature*—page 187).

রাশিয়ায় (1) Merezkovsky, (2) Constantiv Balmont, (3) Vyacheslar Ivanov, (4) Bryusov (I873-1924), (5) Andrei Byely (1880-1934), (6) Alexander Block (1880-1921) প্রভৃতি এই আন্দোলনের প্রবক্তা।

আয়ারল্যাণ্ডে এই আন্দোলন ইয়েটস্ (Yeats), সিন্‌জ (Synge), পলভিনসেণ্ট, ক্যারল্ প্রভৃতির নাট্য-রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা Anton Chekhov, Eugene O'Neil, Philip Barry প্রভৃতির নাট্য-রচনায, জয়েস্ (Joyce), জুলিস্ রোমেন্স (Jules Romains) প্রভৃতির উপন্যাসে, এবং ইলিয়টের কবিতাদিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের নাটিকায এই রচনা-রীতির চমৎকার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে রূপক-নাটক লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্ট্রীণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্ আন্দ্রিফ, হাউপট্-ম্যান, জেরোম্ কে জেরোম্, চার্লস ব্যান কেনেডি, পারসি ম্যাকেণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এক না হইলেও, অদ্বিতীয়।

রক্তকরবী নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য

যদিও রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায় (১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি অভিভাষণ) নাট্যকার "পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা" করতে—"গোপনে যে অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি"

করতে নিষেধ করেছেন, তবু,—কৌতুককর ব্যাপারই বলতে হবে,—নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নাট্যকার স্বয়ং এবং প্রবীণ নবীন সমালোচকগণ ঐ গোপন অর্থের ঝুঁটি ধরে হদ্দমদ্দ টানাটানি করে এসেছেন। এখনও টানাটানি বন্ধ হয়নি—একাধিক সমালোচনাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ তার বড় প্রমাণ। এই সব সমালোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করবার কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই, কারণ এই আলোচনার অধিকাংশই কবি-কৃত প্রস্তাবনারই অনুলেখন অথবা সম্প্রসারণ, অথবা কোন স্বাধীন চিন্তাশীল সমালোচকের মৌলিক চিন্তার চর্বিতচর্বণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সমালোচকের নাম উল্লেখ না করেই অন্যের চিন্তাকে—'আমার মনে হয়' চালিয়ে দেওয়া। এই সমস্ত সমালোচনাকে শ্রেণী বিভক্ত করতে গেলে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সব সমালোচনা যাতে এই কথাই জোরের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে যে নাট্যকার রক্তকরবী নাটকে মানবাত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্যতৃষ্ণার, আনন্দবোধের এবং প্রেমতৃষ্ণার ব্যাকুলতাকেই ব্যক্ত করেছেন—সৌন্দর্য-আনন্দ-প্রেমানুভূতিকেই মুক্তির আসল উপায় ব'লে প্রচার করেছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সব সমালোচনা যাতে দেখানো হয়েছে যে রক্তকরবী নাটক মুখ্যতঃ একখানি সমাজ-সমস্যার নাটক—শোষণজীবী সভ্যতার বা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা।

প্রথম শ্রেণীর সমালোচকরা দেখাতে চেয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ মানুষের মুক্তির সমস্যাকে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন, দেখিয়েছেন—সৌন্দর্য-আনন্দ ও প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে মাধুর্য ব্যক্ত হয় সেই মাধুর্য্যের উপলব্ধিতেই মুক্তি এবং তার অভাবেই বন্দী দশা—স্বভাবের বিকৃতি। অন্য পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকরা দেখাতে চেয়েছেন এই নাটকে নাট্যকার মানবের মুক্তি-সমস্যার সমাজনৈতিক তথা বাস্তবিক

সমাধান দিয়েছেন, বলতে চেয়েছেন—জীবনে সৌন্দর্য্য-আনন্দ-প্রেমকে অবাধ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই পীড়ন ও মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে শোষণ-পীড়নের বন্দীশালা ভাঙ্‌তে হবে এবং যে শক্তিমদমত্ত শোষক প্রাণের রস নিংড়ে নিয়ে মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে, সেই শোষকের শক্তিদম্ভের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম ক'রেই তবে মুক্তি অর্জন করতে হবে এবং ঐ বিপ্লবের সাহায্যেই জীবনের হারানো সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

এই দুই শিবিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি রক্তকরবী-নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনা করতে চাই এবং তা করতে চাই—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই। বাহ্যিক সাক্ষ্য বলতে আমি নাট্যকারের অভিভাষণ, প্রবন্ধ এবং মন্তব্যাদি এবং আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য হিসাবে রক্তকরবী নাটকের বৃত্ত, চরিত্রকল্পনা এবং নাটকের উপসংহার বা 'ক্লট এ্যাকশন'কে গ্রহণ করছি।

এই প্রবন্ধে আমি প্রথমে নাট্যকারের নিজের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করছি এবং পরে ঐ সব মন্তব্য রক্তকরবী নাটকের বৃত্তে কি পরিমাণে প্রযোজ্য তা' বিচার করতে চেষ্টা করছি। নাট্যকারের নিজের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনায়, যাত্রী-গ্রন্থে রক্তকরবী প্রসঙ্গের আলোচনায় এবং "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় লেখা ইংরাজী প্রবন্ধে। প্রথমে দেখা যাক নাট্যকার রক্তকরবী নাটকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে প্রস্তাবনায় কি কি কথা বলেছেন। প্রস্তাবনায় (১৯২৪) তিনি যে-সব কথা বলেছেন তা' থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করতে পারি।

(ক) কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে যে বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এই নাটকে সেই দ্বন্দ্বই উপস্থাপিত হ'য়েছে। আহরণ বা শোষণজীবী সভ্যতায় কি করে মানুষ শোষণে পীড়নে জর্জ্জরিত ও লাঞ্ছিত

হয়, শোষক এবং শোষিত উভয় শ্রেণীই কি ভাবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে এবং 'কলিযুগের রাক্ষসের' সঙ্গে 'কলিযুগের বানরের' যুদ্ধ ও রাক্ষসের পরাজয়ের ফলে মানবতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়—এই নাটকে তাই প্রতিপাদিত হয়েছে।

(খ) এই আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতারই প্রতীক হচ্ছে রক্তকরবী নাটকের রাজা। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণের মতোই সে অমিতশক্তির অধিকারী—বৈজ্ঞানিক শক্তিতে শক্তিমান্। বৈজ্ঞানিক শক্তিবলেই সে অবাধে শোষণ ও পীড়ন করে।

(গ) দশানন রাবণ নানা দেশের ধন হরণ করে এনে 'স্বর্ণলঙ্কা' গড়েছিলেন, এই রাজাও পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে মাটির-নীচে-পোঁতা ধন হরণ করতে নিযুক্ত। এই রাজার স্বর্ণলঙ্কার চূড়া রাবণের স্বর্ণলঙ্কার চেয়েও উচ্চতর এবং 'হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে'। অর্থাৎ স্বর্ণলঙ্কা আজ আর একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, দেশে দেশে এই স্বর্ণলঙ্কা গড়ে উঠেছে। "বস্তুতঃ পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়।"

(ঘ) এই শোষণজীবী সভ্যতা চিরকাল টিঁকে থাকতে পারবে না, একদিন ধর্ম্ম জেগে উঠবেই। মানুষ আপন মনুষ্যত্বের গৌরব ফিরে পেতে চেষ্টা করবেই। কলিযুগের রাক্ষস ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্বে একদিন ভেঙ্গে পড়বেই এবং মানবতা তার ভারসাম্য ফিরে পাবেই।

(ঙ) এই রাক্ষসের একদিকে অর্থাৎ ভিতরে চলবে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে দেখা দেবে তীব্র বহির্দ্বন্দ্ব। কাল পূর্ণ হ'লে শোষিত-পীড়িতদের মরা প্রাণের গাঙে জোয়ার আসবে, মুক্তির জন্য তারা মরিয়া হ'য়ে উঠবে এবং শেষপর্যন্ত সব শক্তিকে এক করেও কলিযুগের রাক্ষস কলিযুগের বানরদের হাতে পরাস্ত হবে। শোষণ-পীড়নের অবসানে যক্ষপুরীর স্থানে লক্ষ্মীপুরী প্রতিষ্ঠিত হবে।

(চ) এই 'পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'। চিত্রপটে যে দানবের পটভূমিকা রয়েছে তা' "মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই।" অর্থাৎ নাটকে নন্দিনীর দ্বন্দ্বই উপস্থাপিত হয়েছে। শোষণজীবী সভ্যতার কবল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করবার জন্য মানবী নন্দিনী যে সংগ্রাম করেছে সেই সংগ্রামের মধ্যেই নাট্যরস রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, যাত্রী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যাক্। সেখানে লিখেছেন— "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা'হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, ভুলেছে—প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। (এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল। প্রাণের আবেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপরে, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্ত্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।")

তৃতীয়তঃ, "দি ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" এবং "দি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে নাট্যকার যা যা বলেছিলেন তা এখানে অনুবাদ

করে সজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া যাক।

(ক) এই নাটকের 'নির্দিষ্ট অর্থ' আছে এবং সে তত্ত্বকে অবশ্যই সাহিত্যে প্রকাশ করা চলে।

(খ) এমন সময় ছিল যখন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ ব্যবহার ব্যক্তিগত আচরণের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সমাজ-জীবনে ব্যক্তি ও সমাজসংস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। ফলে সাহিত্যেও ব্যক্তি-সম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুখ্য স্থান অধিকার করে ছিল। কিন্তু আজ জীবনে সংঘের বা দলের প্রাধান্য ঘটেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে প্রয়োজন সিদ্ধ করার দিকেই—স্বার্থসিদ্ধির দিকেই—সংঘের লক্ষ্য বেশী। সেই কারণে সংঘে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়ে, দলের সমস্ত সভ্যকে এক ছাঁচে ঢালাই করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ কখনই মরে না, সংঘবদ্ধ মানুষের বা দলের চাপে কেবল আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আজ পৃথিবী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে; তার এক ভাগে রয়েছে—'জ্যাক'—ব্যক্তি-মানুষ, অন্য ভাগে রয়েছে—'জায়াণ্ট'—সংঘবদ্ধ—মানুষ—প্রকাণ্ড একটা প্রতিষ্ঠান বা তন্ত্র (জায়গাণ্টিক সিসটেম্)।

(গ) ইয়োরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থায় সংঘশক্তি যে আজ এত প্রাধান্যলাভ করেছে তার মূলে রয়েছে—বিজ্ঞান। জানি না ইয়োরোপ এ সম্বন্ধে কি ভাবছে। তবে এ কথা ঠিক তার সবলচিত্ত 'জ্যাক' সংঘশক্তির চাপের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু মূক এশিয়ার পক্ষ থেকে আমি বলতে পারি—পাশ্চাত্যের ভয়ংকর অস্তিত্ব আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তাদের আচরণে মানবিকতার স্পর্শ কমই আছে; পারস্পরিক ব্যবহারে তার যেটুকু পরিচয় পাচ্ছি তাতে শুধু এই কথাই মনে হয়—সে হচ্ছে একটা বিরাট শক্তি যে শুধু বিশ্লেষণ করতে ও জানতে চায়, কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে কিছু বুঝতে চায় না, যে

অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে শুধু পীড়ন করে এবং শোষণ করে কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে উপলব্ধি ও আনন্দ করতে পারে না।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার নামে এই সংঘবদ্ধ লোভের রিপুটিই আজ চারদিকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের সংঘবদ্ধ লোভের মধ্যে মানুষের প্রকৃত মহদ্ধর্ম কিছুই থাকে না, এ ভয়ংকর প্রকাণ্ড রূপ ধারণ করে, এর ব্যক্তিগত পরিচয়—জটিল জালের আবরণে—বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থায় আচরণে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে থাকতে চায়—জাতিগর্বের ও শক্তিদম্ভের প্রাচীর তুলে দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে থাকে। অদৃশ্য অশরীরী চাপে সে আমাদের প্রাণের রস শুষে নিচ্ছে, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। একদিন আমাদের জনগণকে একজন আকবর বা একজন ঔরংজীবের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, আজ লড়তে হচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ লোভের বিরুদ্ধে—যে লোভের উদ্দেশ্য ভয়ংকর ও সরল, যার প্রক্রিয়া অতি জটিল। এর প্রতিনিধি—তিনি লর্ড বার্কেনহেড বা লর্ড কার্জন যিনিই হোন, কখনও আমাদের রক্ত-মাংসে-গড়া প্রতিবেশী হ'তে পারে না, তাঁরা আমাদের কাছে কতকগুলি অশরীরী সত্তা—কাছে থেকেও দূরবর্তী, সুতরাং ভয়ংকর।

(ঘ) অতএব, যে মহাদেশ ইয়োরোপের এই ভয়ংকর কালোছায়ার করাল গ্রাসে পড়েছে সেই মহাদেশের কোনো কবি যদি তাঁর নাটকে সেই ছায়াকে প্রধান চরিত্র করে রূপ দেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এ লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতির মতো কোনো ব্যক্তি নয়, এ হচ্ছে নিয়তির মতো নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। আমি মনে করি—যে লোভাতুর উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে বাহন ক'রে আমাদের জীবনের সমস্ত ফসল পদদলিত ক'রে অবাধে বিচরণ করছে সে এমন কোন তত্ত্ব নয় যাকে রসরূপ দেওয়া চলে না। এর তপ্ত নিশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগছে, এর স্পর্শে আমাদের আত্মাকে সংকুচিত করে

দিচ্ছে। মানব ইতিহাসের নাটকে আজ এই হচ্ছে প্রধান নায়ক। আমি মনে করি আমার নাটকে তাকে রূপ দেওয়ার অধিকার আমার আছে এবং সেই রূপ দিয়েছি আমি রাজনৈতিক কর্মীর অভিপ্রায় নিয়ে নয়, কবির বিশেষতঃ গীতিকবির অভিপ্রায় নিয়েই।

(ঙ) সমালোচকরা সকলেই স্বীকার করেছেন,—নন্দিনী ব্যক্তিরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে এবং সে কোনো নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণী-প্রতীক নয়। সে নৈর্ব্যক্তিক শোষণ-শক্তির দ্বারা আক্রান্ত এবং সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নাটকের প্রাণ নিহিত। নন্দিনী একজন খাঁটি নারী। সে জানে ঐশ্বর্য্য ও শক্তি মায়া, জীবনের চরম বিকাশ প্রেমে। নাটকে রঞ্জনের প্রতি অনুরাগে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রেমের বন্ধন নিষ্ঠুরভাবে লোভাতুরদের উচ্চাশা দ্বারা পদদলিত হয়। প্রেমের রহস্য এরা বুদ্ধি দিয়ে জানতে চায়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না।

(চ) "আমি পাঠকদের জানাতে চাই—এই বইখানি আমি কোনো কিছু প্রচার করবার জন্য লিখিনি। নৈরাশ্যের এক ঘন অন্ধকার-মুহূর্ত্তে এই ধ্যানটি (ভিশান) আমার মনে প্রতিভাত হয়েছিল। সঙ্ঘশক্তির চেয়ে ব্যক্তি-মানুষের উপরে আমার আস্থা বেশী। আমি মনে করি ব্যক্তি-আত্মা অসীম দৈবসত্তারই অসীম প্রকাশ এবং নারী-হৃদয় তার পরম অবলম্বন। আমি বিশ্বাস করি—নারীর প্রভাবই একদিন পুরুষকে এই লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বিকার থেকে উদ্ধার করবে, দুর্বলচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও নারী তার প্রেমের প্রভাবে লোভের এই অপবিত্র থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবে। এই বিশ্বাসের আনন্দই কালোছায়ার পটভূমিকায়—শয়তানী লোভের দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় মুক্তি-প্রাণা নন্দিনীর ছবি আঁকার প্রেরণা যুগিয়েছে।"

এবার এই তিনটি সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম সাক্ষ্য অর্থাৎ প্রস্তাবনা বা অভিভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—'সমস্ত পালাটি নন্দিনী

বলে একটি মানবীয় ছবি' এ কথা বলা হলেও, শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বের কথাই, আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে শোষিত-পীড়িত প্রাণের বিদ্রোহের সুর বড় স্থান অধিকার করেছে। আমরা দেখি—বিজ্ঞানসহায় শোষক শ্রেণীকে তিনি বলছেন—'কলিযুগের রাক্ষস' এবং শোষিত-পীড়িতদের বলছেন—'কলিযুগের বানর' এবং দেখিয়েছেন এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে, শেষ পর্য্যন্ত রাক্ষসের পরাজয় ঘটছে, দানব শক্তির বিরুদ্ধে মানব জয়ী হচ্ছে। মোটকথা এখানে আকর্ষণজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামের কথাটা বড় হয়ে উঠেছে। তবে এই দ্বন্দ্বের চেতনার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে আরো সব ধারণা মিশে আছে। যেমন (১) আকর্ষণজীবী সভ্যতা কৃষিকেন্দ্রিক পল্লীজীবনকে নষ্ট করেছে, (২) আকর্ষণজীবী সভ্যতা বিজ্ঞানবলে বলীয়ান—যন্ত্রবলে দুর্জয়। (৩) মানুষের স্বধর্ম একেবারে মরে যেতে পারে না। মানুষ যতোই বিকৃত হোক, তার স্বধর্ম যতোই আচ্ছন্ন হো'ক, একদিন-না-একদিন সে প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য ব্যাকুল হবেই, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য ফিরে পাবেই। (৪) শোষণজীবী সভ্যতা শুধু যে শোষিতকেই মনুষ্যত্বহীন করে বা পীড়া দেয় তা নয়, শোষককেও অমানুষ করে, পীড়িত করে। (৫) এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং তা ঘটবে শোষক-শোষিত উভয় শ্রেণীর জাগরণে অর্থাৎ শুধু শোষিতের বিদ্রোহের ফলেই পরিবর্তন ঘটবে না, তার সঙ্গে শোষকের মানবস্বভাবটির জাগরণও যুক্ত থাকবে।

এখানে 'রাজা' হচ্ছে ঐ শোষণজীবী সভ্যতার কেন্দ্রীয় সত্তার প্রতীক, সেই বিকৃত মানুষটি, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে যার হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে, যে প্রাণরস শোষণ করতে যেয়ে নিজের প্রাণ বা মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেছে, যে জীবনে প্রেমের চেয়ে প্রতাপকে, আনন্দের চেয়ে সোনাকে বেশী দামী মনে করেছে, যে স্বভাবকে হনন ক'রে অশান্ত ও অতৃপ্ত জীবন যাপন

করছে। যার মধ্যে আনন্দ-সৌন্দর্য ও প্রেমের আবেগ শুকিয়ে গেলেও একেবারে মরে যায়নি এবং যায়নি বলেই সে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ। যার ভিতরে প্রতাপ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, এবং বাইরে, যাদের মনুষ্যত্ব সে লেহন করে নিয়েছে, শোষণে-পীড়নে যাদের জর্জরিত করেছে তাদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য পরীক্ষা করলে দেখা যায়—এখানে 'নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তন'কেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের কথা একবারও উল্লিখিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চান—পুরুষের সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে 'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনার' অভাবেই। শেষ পর্যন্ত এই কথাই দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের এই সভ্যতায় যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে 'নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা'র অভাবেই এবং নারীশক্তির প্রভাবেই একদিন শোষণ-পীডন বন্ধ করবে। নারী জাগিয়ে তুলবে প্রাণের বেগকে এবং প্রেমের আবেগকে সেদিন যন্ত্রের চেয়ে প্রাণের মূল্য হবে বেশী এবং প্রেমের আবেগ লোভকে করবে বশীভূত। এই দিক থেকে দেখলে রক্তকরবী নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু—'নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা'-তত্ত্ব। প্রতিপাদ্য হবে—নারীর প্রভাবেই প্রাণ জাগে, প্রাণের বেগ আঘাত করে যন্ত্রকে এবং প্রেমের আবেগ আঘাত করে 'লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে এবং "পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত" হয়।

তৃতীয় সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যায়—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতাকে আরো সুনির্দিষ্ট পরিচয় দিয়েছেন—'শোষণজীবী সভ্যতা' বলতে তিনি ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে ধরেছেন। ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে তিনি শুধু বিজ্ঞানবলদৃপ্ত 'সংঘবদ্ধ লোভ' (an organised passion of greed) বলেই ক্ষান্ত হ'ননি তাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষক মূর্তি

রূপেও কল্পনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—এই বিজ্ঞানবাহন সংঘবদ্ধ লোভ এশিয়ায় এবং অন্যান্য মহাদেশে তার হিংস্র লোভের থাবা বসিয়ে শোষণে-পীড়নে জর্জরিত করে মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে। এই নিষ্ঠুর শোষক ইযোরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আজ ইতিহাসের প্রধান নায়ক; এই ইতিহাস-নাট্যের প্রধান নাযককেই আমি আমার নাটকে উপস্থিত করেছি। এই সাম্রাজ্যভোগী শোষণজীবীকে ঘিরে রয়েছে জটিল জাল—'সায়েন্টিফিক সিস্‌টেম'। জাতিগর্বের ও শক্তিদম্ভের প্রাচীর তুলে সে সমস্ত মানুষের স্পর্শ এড়িয়ে যায়। এই অশরীরী সাম্রাজ্যবাদের শরীরী প্রতিনিধি হয়ে যেসব সর্দার আসেন—লর্ড বার্কেনহেড্‌ বা লর্ড কার্জন যিনিই আসুন—তাঁরা কখনই আমাদের আপনার লোক হন না, তারা প্রাণহীন পীড়নযন্ত্রে পর্যবসিত।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলতে ভোলেননি যে তিনি মানুষের 'single personality'-র উপরেই অধিকতর আস্থা রাখেন এবং যে-যন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে দেয় তার প্রতি তার আস্থা নেই। তিনি বিশ্বাস করেন-এই শেষ 'treasure house' রয়েছে নারীর হৃদযে এবং নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনাই লুব্ধ দুশ্চেষ্টা থেকে একদিন পৃথিবীকে উদ্ধার করবে। (এই বিশ্বাসের আনন্দেই তিনি কালো ছাযার পটভূমিকায—শয়তানী লোভের দুঃস্বপ্নের পটভূমিকায় মুক্তিপ্রাণা সত্যমূর্তি নন্দিনীর ছবি এঁকেছেন।)

এই সব সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পরে সহজেই মনে এ প্রশ্ন জাগবে— রক্তকরবী নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি? প্রশ্ন জাগে—এই নাটকে নাট্যকার কি মুখ্যতঃ ইয়োরোপীয় সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের রূপ এবং তার বিরুদ্ধে শোষিত-পীড়িত জনগণের বিদ্রোহের বা মুক্তি সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন? অথবা সাধারণভাবে আকর্ষণজীবী সভ্যতায় কি করে শোষক ও শোষিত উভয় শ্রেণীর মনুষ্যত্ব হারিয়ে দেউলে হয়ে যায়, স্বধর্মের প্রেরণায়

উভয়েরই মধ্যে প্রতিক্রিয়া জাগে এবং উভয়ের দ্বন্দ্ব ও জাগরণের ভিতর দিয়ে শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটে, সেই প্রতিপাদ্যই কি প্রতিপাদন করেছেন? অথবা আকর্ষণজীবী সভ্যতার নতুনতর সংস্করণ পুঁজিতন্ত্রের শোষণ-পীড়নের রূপ এবং প্রাণের জাগরণের ফলে, মানবিক মূল্য ফিরে পাওয়ার জন্য, কি করে শোষিতরা বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে মুক্তি অর্জন করবে তা দেখানোই কি নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য? অথবা নাট্যকার পুরুষের উদ্যমে নারীশক্তির নিগূঢ় 'প্রবর্তনা' দেখানোর জন্যই কি এই নাটকখানি লিখেছেন?

এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রক্তকরবী নাটকের আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা দরকার। আমরা দেখি—যক্ষপুরীতে তিনটি পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষে রাজা ও তার অধ্যাপক, গোঁসাই সর্দার মোড়লরা, অন্য পক্ষে রয়েছে—কিশোর, ফাগুলাল, গোকুল, প্রভৃতি খোদাইকররা এবং আর এক পক্ষে রয়েছে—নন্দিনী ও তার পাগল ভাই বিশু। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে শোষক-শোষিত শ্রেণী সম্পর্ক। রাজা ও সর্দারগণ শোষক শ্রেণী, খোদাইকররা শোষিত শ্রেণী। উভয়েই অমানুষ। শোষণ-পীড়ন করতে করতে শোষকশ্রেণী যেমন প্রাণহীন, শোষণ-পীড়ন সইতে সইতে শোষিতেরাও তেমনি প্রাণহীন—অসাড়। রাজা আছে জালের আড়ালে। মানুষের সবটুকু বাদ দিয়ে তার মধ্যে শুধু প্রতাপটুকু জেগে আছে। সে সব কিছু জানতে চায় কিন্তু অনুভব করতে পারে না। যা বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় তার প্রতি তার আগ্রহ আছে, কিন্তু যাকে মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় তার প্রতি তার অনাসক্তি। অধ্যাপক নিয়োগ করে সে বস্তুতত্ত্ব জেনে নেয়, কিন্তু প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্যের সহজ অনুভূতির সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং বঞ্চিত বলেই—অন্তরে রিক্ত বলেই প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যের উপর বিরক্ত। যক্ষপুরীর এই পরিস্থিতিতে প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যময়ী নন্দিনী এসে উপস্থিত

হয়। সে চায় সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে এবং রাজার বিশ্রী জালটা ছিঁড়ে ফেলেমানুষটাকে উদ্ধার করতে। নন্দিনীকে নিয়ে দু' পক্ষেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—দু' পক্ষেই রসময় প্রাণের প্রবর্তনা সঞ্চারিত হয়। রাজার মধ্যে জাগে অন্তর্দ্বন্দ্ব—রাজসত্তা ও মানব-সত্তার দ্বন্দ্ব, শোষিত শ্রমিকদের মধ্যে জাগে প্রাণাবেগ—মুক্তির আবেগ—বিক্ষোভের সাহস। মুক্তপ্রাণের প্রতীক রঞ্জনের প্রাণ নেওয়ার পরে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়—রাজা চরম প্রাণের সন্ধান পান—আবার মানুষ হন তাঁর নিজেরই শক্তি প্রতাপাবশেষ সর্দার-শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষায় বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলান এবং সর্দার শক্তিকে পর্যুদস্ত করে 'শেষ মুক্তি'র লক্ষ্যে পৌঁছাতে নন্দিনীর সহচর হন।

বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য পরীক্ষা করার পর এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে রক্তকরবী নাটকের নাট্যরস রয়েছে—মানবী নন্দিনীর মুক্তি সংগ্রামেরই মধ্যে এবং সে কথা নাট্যকার বার বার বলেছেন। বলেছেন—এর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি—নন্দিনীই হচ্ছে—"the heroine of the play……She is not an abstraction, but is pursued by an abstraction, like one tormented by ghost. And this is the drama" বাস্তবিকই—নাটকের গোড়ায় নন্দিনী যে দু'টি ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে—(সুড়ঙ্গের অন্ধকারে ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দেওয়ার ইচ্ছা এবং রাজার বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করার ইচ্ছা) নাটকে সেই দু'টি ইচ্ছাই কার্যে পরিণত হয়েছে। একদিকে নন্দিনী খোদাইকারদের মধ্যে প্রাণের বেগ সঞ্চার করেছে, প্রাণের আগুন জ্বালিয়েছে, অন্যদিকে রাজার ভিতরে যে মানুষটি আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সেই মানুষটিকে জাগিয়েছে—মুক্তিযুদ্ধে নেত্রীর স্থান অধিকার করেছে। নন্দিনীর জয়ধ্বনিতেই নাটকের উপসংহার ঘটেছে—নন্দিনীর

শেষদান প্রেম ও প্রাণের প্রতীক 'রক্তকরবীর গুচ্ছ' বিশু হাতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে এবং পৌষের আহ্বানে নাটক শেষ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে নন্দিনীর এই প্রাধান্যে 'নারীর নিগূঢ় প্রবর্তনার তত্ত্বটি' নাটকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে কিনা অথবা নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেমের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে—"The highest expression of life is in the love" এই তত্ত্বটি প্রতিপাদন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য কিনা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করলে, পুরুষের জীবনে নারীশক্তির প্রভাব দেখানো অথবা যন্ত্রপ্রাধান্য-পীড়িত বিকৃত ও শোষিত জীবনের মুক্তিতে নারীশক্তির কার্যকারিতা দেখানো এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য কিনা? নন্দিনী ও রঞ্জনের প্রেমাবেগ এবং প্রেমের পরিণাম দেখানো এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য কিনা? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার সময় নাটকের 'root action'-এর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখলেই দেখা যাবে—নারীর নিগূঢ় প্রবর্তনার তত্ত্ব বা প্রেমতত্ত্ব এই নাটকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেনি। নারীর অভাবেই যক্ষপুরীতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটেছে—একথা কোনমতেই যুক্তিসহ নয়। যক্ষপুরী একেবারে নারীশূন্য একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। অবশ্য যদি এমন কথা বলা হয় যে আর যারা 'তারা সব স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু একা নন্দিনীই একমাত্র নারী' তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তাছাড়া নাটকের 'রুট এ্যাক্‌শান' লক্ষ্য করলে দেখা যায়—নিগূঢ় প্রবর্তনা বা প্রেম নয়, মুক্তিই নন্দিনীর মুখ্য কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নন্দিনী সৌন্দর্যময়ী আনন্দময়ী রঞ্জনপ্রেয়সী বটে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে সে মুক্তিপ্রাণা। সে রাজাকে এবং খোদাইকরদের সমানভাবে মুক্ত করতে চায়। রঞ্জনের সঙ্গে মিলনের কামনা তার যত উদগ্র, তার চেয়ে শোষিত-পীড়িতদের মুক্ত করার ইচ্ছা কম ঐকান্তিক নয়। নন্দিনী নিরাপদের নির্বাসনে যেতে চায়নি, মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছে।

এই নাটকের শেষে মৃত্যুপণ সংগ্রামের আবেগই তীব্র উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হয়েছে। রঞ্জনের মৃত্যুতেই সে সংগ্রাম শেষ হয়নি, রঞ্জনের মৃত্যুতেই নন্দিনী মরেনি—সে বেঁচে ছিল—ফাগুলালের দলকে নিয়ে সর্দারের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম করবার জন্য। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য—নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা বা প্রেমতত্ত্ব নয়, মুখ্য প্রতিপাদ্য —শোষণজীবি সভ্যতার বিরুদ্ধে মানবতার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—এককথায় মুক্তিতত্ত্ব। এই সংগ্রামের একপক্ষ 'কলিযুগের রাক্ষসরাজ, অন্য পক্ষে মানবতার বিগ্রহ নন্দিনী ও তার সহযাত্রীরা।' নায়ক বা নায়িকা নন্দিনী এবং প্রতিনায়ক রাজা ও তার অনুচর সর্দারগণ।

এখন যে প্রশ্নটি আসছে সেইটি সবচেয়ে জটিল—যে শোষণজীবী সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনায়ক করে মানবতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকরেছেন, তার প্রকৃতিটি কি? সে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ অথবা পুঁজিবাদ? প্রস্তাবনায় আমরা দেখেছি—রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে শোষণজীবী সভ্যতার কথা বলেছেন এবং ইংরেজী প্রবন্ধে ইয়োরোপীয় সভ্যতা তথা সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন।

প্রশ্ন—দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য কল্পনা করার প্রয়োজন আছে কি? প্রয়োজন আছে, কারণ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শোষণজীবী সভ্যতার আমরা দুই মূর্তি কল্পনা করতে পারি: একটি—সম্রাজ্যবাদী মূর্তি, অন্যটি—পুঁজিতন্ত্রের মূর্তি। সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রীর ঐক্য এখানেই যে উভয়েই শোষণজীবী। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ করে—বিজিত দেশগুলিকে আর পুঁজিতন্ত্রী শোষণ করে—নিজেরই দেশের শ্রমিকদের। দুই ক্ষেত্রেই ছোটদের খেয়ে খেয়ে বড়রা বড় হয়—"ছোটগুলো হতে থাকে ছাই আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখায়"। রক্তকরবীর রাজা কি ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক? অথবা সাধারণভাবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার

প্রতীক? এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে, আমাদের আগে বিচার করে দেখতে হবে—রাজার চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদীর প্রকৃতি অথবা পুঁজিতন্ত্রীর প্রকৃতি —কোন প্রকৃতি কি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজার চরিত্র পর্যালোচনা ক'রে আমরা দেখি—(১) রাজা আছেন একটা জটিল জালের আড়ালে। (২) রাজা সব কিছু জানতে চান, মর্ম দিয়ে বুঝতে চান না। (৩) রাজা যক্ষপুরীর রাজা, সেখানে সর্দারদের শাসনাধীনে খোদাইকররা সুড়ঙ্গ খুদে তাল তাল সোনা তুলছে। (৪) রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। বাইরের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ থাকা সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে সে রিক্ত ও ক্লান্ত। ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার প্রকৃতিতে আমরা দেখি—বিজ্ঞানের শক্তিতে সে শক্তিমান, তার চারদিকে বৈজ্ঞানিক শক্তির, জাতিগর্বের ও শক্তিদম্ভের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। বিজিতের সঙ্গে তার হৃদয়ের সম্পর্ক নেই, আছে শুধু শোষণের সম্পর্ক। বিজিত দেশের ধন সম্পদ হরণ করে সে তার ঐশ্বর্যের চূড়াকে গগনস্পর্শী করে তুলেছে। সে সব দেশের সবকিছু জানতে চায়, কিন্তু মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কে যুক্ত হয় না। সে শোষণ-পীড়নের প্রাণহীন যন্ত্র বিশেষ। এই সাদৃশ্যটুকু থাকা সত্ত্বেও এই প্রশ্ন মনে জাগে এবং জাগে এই কারণেই যে সাম্রাজ্যবাদীর মুখ্য লক্ষণটি এই যে সে যে দেশের ধন হরণ করে সে সেই দেশের অধিবাসী নয়।

এই নাটকের কোন জায়গাতেই এমন কথা নেই, বিশেষ ক'রে শোষিতরা কখনই এ কথা বলেনি যে রাজা বা সর্দাররা ভিন্ন দেশের লোক। তবে বিভিন্ন গড়কে বিভিন্ন দেশ কল্পনা করলে জোড়াতালি দিয়ে এক রকম সমাধান করা যায় বটে কিন্তু তা জোর করে করাই হবে। এই কারণে রাজাকে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বলতে আপত্তি উঠতে পারে। অন্যপক্ষে যেহেতু যক্ষ-পুরীর পরিবেশ একটা খনির পরিবেশ এবং শোষিতরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, রক্তকরবীর রাজাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক

ব'লে মনে হ'তে পারে। রাজার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মিল এই ভাবে দেখানো যেতে পারে। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যেমন বিজ্ঞানবাহন, পুঁজিবাদও তেমনি বিজ্ঞানাশ্রয়ী—বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান—বিজ্ঞানের শক্তিবাহুল্যের জোরেই সে হরণ করে, পীড়ন করে। বস্তুতত্ত্ববিদরা তার দ্বারে বাঁধা। সেও সব কিছু জানতে তথা আয়ত্তে আনতে চায়। তারও চারিদিকে শ্রেণীগর্বের, শক্তিদম্ভের প্রচীর ঘিরে রয়েছে। সেও হৃদয়হীন—নিষ্প্রাণ শোষক বিশেষ। তার কাছে—একমাত্র মূল্য শ্রম-মূল্য—প্রেম সৌন্দর্য প্রভৃতি মূল্যের আদর সে করে না। সে-ও অদৃশ্য থেকে সর্দার-শক্তির সাহায্যে হরণ-পীড়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গোসাঞি অধ্যাপক মোড়ল এইসব শ্রেণীকে সে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাজার পরিকল্পনায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বা পুঁজিবাদের সব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়নি। যৌবনকে বা প্রেমকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার মধ্যে যে ব্যাকুলতা দেওয়া হযেছে, নন্দিনীকে পাওযার জন্য যে নির্জ্জন আবেগ দেওয়া হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের বা পুঁজিবাদের প্রকৃতিতে তার কোন স্থান নেই।

সুতরাং এ কথা বলা চলে না যে রক্তকরবীর রাজা সর্বতোভাবে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক। রাজার পরিকল্পনায় এরা বড় অংশ অধিকার করেছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের সংস্কারের সঙ্গে আরো অনেক ভাব মিশে তবে রক্তকরবীর 'রাজা' তৈরী হযেছে। ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের চেতনায়—সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদ মানব-বিকৃতিরই বাহ্য লক্ষণ, আসল ব্যাধি—অখণ্ড মানবত্তার মধ্যে একাংশের বিকৃতি। আহরণজীবী বা শোষণজীবী সভ্যতা সেই বিকৃতিরই অভিব্যক্তি। মানুষের বিকৃতিই সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী

লোভের মূর্তি ধরে শোষণ পীড়নের নিষ্ঠুর আচরণে ব্যক্ত হয়ে থাকে। বাহ্যতঃ যা সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদ, আসলে তা' মানবতারই বিকৃতি। অর্থাৎ বিকৃতি ভিত্তিহীন কিছু নয়। মানবতার ভূমিতেই তার জন্ম—বিকৃতি মানেই আচ্ছন্ন মানবতা। এই কারণে কোন বিকৃতিই নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি নয়—মানবতা এবং তদ্‌বিপরীত অমানবতার দ্বন্দ্বক্ষেত্র। প্রত্যেক বিকৃতির মধ্যে একদিকে থাকে—অন্তর্দ্বন্দ্বের, অন্যদিকে থাকে বহির্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। এই চেতনা থেকেই রাজার ধ্যানটি (ভিশান) রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং করেছে বলেই—রাজা বহিঃপ্রকৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী হওয়া সত্ত্বেও, অন্তঃপ্রকৃতিতে—'মানুষ'—আচ্ছন্ন মানুষরূপে কল্পিত হয়েছে।

এই দিক থেকে রক্তকরবীর মুখ্য প্রতিপাদ্য খুঁজতে গেলে দেখা যাবে—রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের ও পুঁজিবাদের বিকৃতি থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার সংকল্প নিয়েই এই নাটকখানি লিখেছিলেন। (শোষণ-পীড়ন মুক্ত আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা—তথা মানবতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনাই—এই নাটক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।)

রক্তকরবী

১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ "যক্ষপুরী" নামে একখানি নাটক লেখেন। কিন্তু ''যক্ষপুরী'' পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই "নন্দিনী" মূর্তি পরিগ্রহ করিতে বিলম্ব করে নাই, আবার যখন ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংস্কৃত রূপে ইহা প্রকাশিত হয়, তখন উহা 'নন্দিনী'-বেশ ত্যাগ করিয়া "রক্তকরবী" রূপ ধারণ করে।

'যক্ষপুরী'—'নন্দিনী'—'রক্তকরবী', কোন্ নামটি ধারণ করিলে নাটকখানি সার্থকনামা হয়, এই প্রশ্ন সহজেই জাগিতে পারে, এবং নাম-পরিবর্ত্তন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের বেশী অবকাশ দিয়াছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় 'নাম লইয়া বিব্রত হইবার কিছু কারণ নাই' বলিয়াও—'তবু'-যোগে লিখিয়াছেন "আমার মনে হয় 'যক্ষপুরী' নামটি এই নাটকের পক্ষে সার্থকতর ছিল, যদিও 'রক্তকরবী' নাম অধিকতর কবিতাময়।" কিন্তু ডাঃ রায়ের মন্তব্যটি সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে নাই। নাটকখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলেই দেখা যাইবে যে 'যক্ষপুরী' 'দানবের পটভূমিকা' মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাউক—"এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।" 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই জানাইতে চেষ্টা করিযাছেন—"যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত।⋯ ⋯এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির

নিগূঢ় প্রবর্ত্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যেহেতু যক্ষপুরী নাটকের পটভূমি মাত্র, সেই হেতু পটভূমি অপেক্ষা 'উদ্দেশ্য' অনুযায়ী নামকরণই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে কি 'নন্দিনী'ই সার্থকতম নাম? তাই যদি হইবে তবে 'রক্তকরবী' নাম দিলেন কেন?—শুধু কি 'কবিত্বময়' করিবার জন্যই 'রক্তকরবী' নাম দেওয়া হইয়াছে? না। রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন—"সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি" এবং "আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপক-নাট্য নয়"—আসল কথা এই যে, নন্দিনী সামান্যই মানবী এবং অধিকাংশই 'কল্পনা', আর রক্তকরবী পালাটিও খাঁটি রূপক-নাট্য এবং সেই রূপক-নাট্যের মূল বিষয়—সহজ-যোগের আনন্দেই মুক্তি এবং সেই মুক্তিতেই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য, আর অফুরন্ত বাঁধনহারা রক্ত-রাঙা প্রাণই সেই মুক্তির বিজয়কেতন বাহন। 'রক্তকরবী' আনন্দময়ী ও সৌন্দর্য্যময়ী ও প্রাণময়ী মুক্তির বিজয়কেতন; তাই, আনন্দ-মুক্তির প্রতীক 'রক্তকরবী'ই রূপকনাট্যখানির সার্থকতম সংকেত।

নাট্য-পরিচয়

প্রথম সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা'য় কবি বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন— "আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক।.........এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে এটি সত্য"।—আরো বিশেষভাবে জানাইয়াছেন—"আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।.........এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার

আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা-হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন।”

অতএব বড় প্রশ্ন—নাটকখানি কি রূপক-নাট্য নহে? বাস্তবিক যাহা 'সত্যমূলক' তাহাকে 'রূপক' বলা কেন? আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কোন সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের নিবেদনে গুরুত্ব স্থাপন করেন নাই—নাটকখানিকে রূপক-নাট্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুব সঙ্গতভাবেই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ইহাকে 'সত্যমূলক' বলিয়াছেন সে অর্থ এই যে, ঘটনাটি 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে' এই অর্থেই সত্য, আর উহার জন্মস্থান কবির মনোভূমি এবং উহা প্রকৃত জগতের চেয়েও সত্য। নাট্যকার স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন—“এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে।” অর্থাৎ ইহা বস্তু-সত্য নহে, “কবির জ্ঞান-বিশ্বাস মতে” সত্য—ভাব-সত্য। এই ভাব-সত্যকে নাট্যকার যে রূপের আশ্রয়ে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বাস্তব রূপের মর্য্যাদা লাভ করে নাই—সংকেতটুকুর মধ্যেই উহার সমস্ত সম্ভাবনা আবদ্ধ হইয়া আছে। রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ভাবেরই প্রধান হইয়া পড়া—রূপক-নাট্যের এই প্রধান লক্ষণটিই নাটকের সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট। অধিকন্তু রূপক-নাটকে যে ধরণের কুহেলিকা ভাসিয়া বেড়ায়—চরিত্রগুলি যেরূপ “ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়” এই নাটকেও সেই কুহেলিকা সেই ছায়া কম নহে—। এখানে রাজা আছেন এই কুহেলিকার জালের ভিতরে। নন্দিনীর সঙ্গে তাহার আলাপ-আলোচনা, নন্দিনীর নিজের গতিবিধি—সবই ঠিক 'ছায়ায় যেন ছায়া'। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মৌখিক বারণ সত্ত্বেও নাটকখানিকে আমরা 'রূপক-নাট্য' রূপেই গ্রহণ করিব। কারণ নন্দিনীকে শুধু “মানবীর ছবি” রূপে দেখা অসম্ভব। তবে কি নাটকখানিতে ভাব-রস

ছাড়া রচনা-রস ছাড়া হৃদয়-রস পাওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন এবং রসের ফল্গুধারাটির প্রতি দৃষ্টিও আকর্ষণ করিয়াছেন—

"এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্তপালাটি 'নন্দিনী' বলে একটী মানবীর ছবি।.........সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন, তা-হলে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।" কিন্তু কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদিও দাবী করিয়াছেন—'আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর' তবুও এই প্রশ্নই বড় আকারে জাগে—নাটকখানি সত্যই কি ব্যক্তিগত মানুষের হইয়া উঠিতে পারিয়াছে? নন্দিনী ভৌগোলিক স্থিতিতে, ব্যবহারিক নীতিতে, মানসিক বা আনুভাবিক গতি-প্রকৃতিতে সত্যই কি 'ব্যক্তিগত মানুস' হইয়া উঠিয়াছে? মানুষের হৃদয় যে-ভাবে কাজ করে, নন্দিনীর হৃদয় কি সেই ভাবেই কাজ করিয়াছে? অবশ্য নন্দিনীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি না পাওয়া যায় এমন নহে।

নন্দিনী কিশোরের দুঃখ সহিতে পারে না, রাজার বিশ্রী জালটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মানুষটাকে উদ্ধার করিতে তাহার ইচ্ছা জাগে—সে কোন বাধাই মানিতে চাহে না, রঞ্জনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তাহার মনে পুলক জাগে—আনন্দে মন ভরিয়া উঠে, অনুপ-উপমন্যুকে কঙ্কুকে দেখিয়া বেদনায় তাহার অন্তর ফাটিয়া যায়, পালোয়ানকে বাঁচাইবার জন্য তাহার কত আন্তরিক সমবেদনা—বিশুর জন্য তাহার মন উৎকণ্ঠিত হয়, রাজার বিরুদ্ধে, সর্দারের বিরুদ্ধে সে নির্ভীক প্রতিবাদ করে—মৃত-রঞ্জনের জন্য তাহার করুণ শোকোচ্ছ্বাস জাগে। এতগুলি হৃদয়-ভাবের স্পন্দন নন্দিনীর মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্পন্দন যে-পরিমাণে থাকিলে স্থায়ী-ভাব-বন্ধ হইতে ভাবাবেগ উদ্রিক্ত হইয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া রাখে; সেই পরিমাণ স্পন্দন-আবেদন

নাটকে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহার যথার্থ পরিচয়—রস নহে, রসাভাস। তবে—

"রসভাবৌ তদাভাসৌ ভাবস্থ প্রশমোদয়ৌ।
সন্ধিঃ শবলতা চেতি সর্ব্বেহাপি রসনাদ্রসাঃ॥"

অর্থাৎ—রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাব প্রশম, ভাবোদয়, সন্ধি, শবলতা—সব কিছুই রসসৃষ্টির অংশ, অতএব রস বলিয়াই গ্রাহ্য—এই কথা স্বীকার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে নাটকখানিতে রস আছে। তাই প্রশ্ন, সেই রসের স্বরূপ কি? কেই বা সেই রসের অবলম্বন বিভাব? নাট্যকার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি নিজেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এবং নন্দিনীই সেই চরিত্র। সুতরাং অনুসন্ধান করিতে হইবে—কোন্ স্থায়ীভাব নন্দিনীকে অবলম্বন করিয়া রসপরিণতি লাভ করিয়াছে—নন্দিনীর মধ্যে কোন্ ভাবটি প্রধানতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা জানি, নন্দিনী ভাবের প্রতীক, কিন্তু আমরা ইহাও দেখি যে নন্দিনী হৃদয়ের যোগেও অনেকের সঙ্গে যুক্ত এবং বিশেষতঃ রঞ্জনের সহিত তাহার প্রাণের যোগ—প্রেমের যোগ। নন্দিনী প্রাণের স্পর্শ দিয়াছে অনেককেই, কিন্তু প্রাণ দিয়াছে সে কেবল রঞ্জনকে। সেই দিক দিয়া নন্দিনীর স্থায়ীভাব—রতি, এবং নাটকখানির রস—বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। কারণ রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর বাস্তবিক মিলন ঘটিতে পারে নাই।

বিচ্ছেদ-বেদনায় নন্দিনী ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছে—"তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছিনে।" বিচ্ছেদ-চেতনা ভাব-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেলেও করুণ-মূর্চ্ছনার রেশ শেষ পর্য্যন্তই পাওয়া যায়।

তত্ত্ব-পরিচয়

(ক) নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছেন—"যেটা

গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়"—এবং সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন—"রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হ'লে তার দায় কবির নয়। এক কথায় 'গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি' করিতে নাট্যকার নিষেধই করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকরা যে কত নিরুপায়, নাট্যকার তাহা উপলব্ধি করেন নাই, করিলেই দেখিতে পারিতেন যে, গূঢ়কে প্রকাশ করিতে পারাই তাহার বড় সার্থকতা—গোপনে যে-অর্থ আছে, তাহার ঝুঁটি ধরিয়া টানাটানি না করিলে সমালোচকের নিজের ঝুঁটিই থাকে না। এই কারণেই কেহই তাঁহার নিবেদনে সাড়া দেন নাই এবং নাট্যকার নিজেও গোপন অর্থের ঝুঁটি ধরিয়া টানাটানি না করিয়া পারেন নাই। (একবার বারোয়ারি-সভায় দাঁড়াইয়া করিয়াছেন—একবার 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি'তেও করিয়াছেন।)

নাট্যকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যে তত্ত্বটি বিবৃত করিয়াছেন তাহাকে এক কথায়,—সমাজসংস্থাগত তত্ত্ব বলা চলে। তাঁহার ভাষায়—"আমার পালায় একটি রাজা আছে।·········বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা সেই শক্তি-বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন·········একই নীড়ে পাপ ও পাপের মৃত্যুবান লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্ত্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।·········(রাজার এই ধর্ম্মটি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে)।

·········যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ করে সেই ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমাজদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে।·········

কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা

বিষম দ্বন্দ্ব আছে………। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।………আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে—কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে…………; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।" (রবীন্দ্রনাথের মতে) এইটুকু নাটকের সামাজিক ব্যঞ্জনা; ইহা ছাড়া 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন; তাঁহার ভাষায় —"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। ……যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনি জড়িত হয়ে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

এই ভাষ্যটির তাৎপর্য্য এই যে—নারী-শক্তিই (নারী-মহিমা) প্রকৃত প্রাণশক্তি—এবং প্রেমশক্তি, আর এই ভাষ্য স্বীকার করিলে, রক্তকরবীর

তত্ত্ব নারী-মহিমায় পর্য্যবসিত হয়—তথা প্রতাপ ও প্রেমের তত্ত্বের কথা হইয়া দাঁড়ায়। (আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই তত্ত্বটির সহিত নাটকে-বর্ণিত বিষয়ের পূর্ণ সঙ্গতি পাওয়া যায় না)।

(খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় নাটকখানির ভাবতত্ত্বকে এইভাবে দেখিয়াছেন—"যক্ষপুরীর রাজার রাজধর্ম্ম প্রজাশোষণ, তাহার অর্থ-লোভ দুর্দ্দম। সেই লোভের আগুনে পুড়িয়া মরে সোনার খনির কুলিরা। রাজার দৃষ্টিতে কুলিরা ত মানুষ নয়, তাহারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র, তাহারা ৪৭ক ২৬৯ফ মাত্র, তাহারা জড় যান্ত্রিকতার যন্ত্রকাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র …………মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অবমানিত। জীবনের প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নাই। প্রেম ও সৌন্দর্য্য হইতেছে জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণ রূপ—নন্দিনী তাহার প্রতীক; এই নন্দিনীর আনন্দস্পর্শ রাজা পান নাই তাঁহার লোভের মোহে, সন্ন্যাসী পান নাই তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কারের মোহে, মজুররা পায় নাই অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়িয়া, পণ্ডিত পায় নাই তাহার পাণ্ডিত্যের এবং দাসত্বের মোহে। এই যক্ষপুরীর লোহার জালের বাহিরে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক, প্রাণ-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিল, যক্ষপুরীর কারাগারের ভিতরে এক মুহূর্ত্তে সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুক্ত জীবনানন্দের স্পর্শ সকলের দেহে মনে লাগিল………। রাজা নন্দিনীকে পাইতে চাহিলেন যেমন করিয়া তিনি সোনা আহরণ করেন তেমন করিয়া, শক্তির বলে কাড়িয়া লইয়া পাওয়ার মতন করিয়া, ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়ার মতন করিয়া; কিন্তু তেমন করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে লাভ করা যায় কি? নন্দিনীকে তিনি তাই পাইয়াও পান না…………এমন যে মোড়ল সে-ও বিচলিত হইল; সে-ও নন্দিনীকে ভালবাসিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইল বিরোধের মধ্য দিয়া ………এই জীবনানন্দের রূপ দেখিয়া, প্রাণপ্রাচুর্য্যের

মধ্যে বাঁচিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া জালের বাহিরের দিকে হাত বাড়াইল। নন্দিনী রঞ্জনকে ভালবাসে, নন্দিনীই রঞ্জনের মধ্যে এই প্রেম জাগাইয়াছে; কিন্তু সে তো যন্ত্রের বন্ধনে বাঁধা এবং সেই যন্ত্রই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রেমকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করিয়া দিল।·········নন্দিনীর প্রেমাস্পদ বলি হইল যন্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে এবং তাহারই মধ্য দিয়া জীবন হইল জয়ী আবার প্রেমকেই সন্ধান করিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্য।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—১৫৬ পৃষ্ঠা)।

তারপর—

(গ) সমালোচক বন্ধু অজিতবাবু নাটকখানির অন্তর্নিহিত ভাব-সত্তাকে এইরূপে দেখিয়াছেন :— 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীও এক অতিকায় অজগরের ন্যায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত ক্ষুদ্র মানবাত্মাগুলিকে গ্রাসে গ্রাসে তাহার গহ্বরের মধ্যে চালান করিয়া দিতেছে, তাহাদের বাহিরে আসিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। পতঙ্গ যেমন বহ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসে, পল্লীর স্বাধীন কৃষিও তেমনি আপাত-লোভনীয় ধনকণার আকর্ষণে নিজেদের রক্তলোভী যন্ত্রদানবের কাছে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। সোনার থলি মানুষের কাছে পরম লোভনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই থলি ক্রমাগত বড়ো হইয়া যখন গুরুভারী বোঝার ন্যায় তাহার কাঁধে চাপিয়া বসে তখন সে ক্লান্ত পীড়িত হইয়া এই বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। যক্ষপুরীর রাজাও যেন স্বারোপিত ভার হইতে মুক্তি-প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক ধনতন্ত্রী যন্ত্রসর্ব্বস্ব সভ্যতার মর্ম্মপীড়া এই রাজার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাণময়ী রস-নির্ঝ'রিনী নন্দিনী যেন জড় দেবতার অচল সিংহাসন টলাইয়াছে।·········ধনদানব রাজা, তত্ত্বসর্ব্বস্ব অধ্যাপক, ধর্ম্মাভেকধারী গোঁসাই, ক্ষমতাপন্ন সর্দ্দার—ইহারা নন্দিনীর প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। প্রভাতের স্নিগ্ধ কম্পমান আলোক-

রশ্মির ন্যায় ইহা ফাঁক-ফুকর দিয়া সকলের ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি মমতাময় করস্পর্শে সকলকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।" (বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৫৭)।

উল্লিখিত তত্ত্ব-বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে নাটকখানির কথা-বস্তুর একটি রূপরেখা দেওয়া একান্ত দরকার। অন্যথা ভাব-সত্তার আসল রূপটি—পরিপূর্ণ রূপটি, অস্পষ্ট থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। বর্ণিত বিষয় হইতে যথার্থ ব্যঞ্জনা কি পাওয়া যায়, তাহাই অনুসন্ধান করা যাক।

রক্তকরবীর কথাবস্তু

যক্ষপুরীতে, যেখানে শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত—বালক-শ্রমিক কিশোর নন্দিনীকে ডাকে—ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে চাহে, কারণ সারাদিনের কাজের ফাঁকে—একটু সময় চুরি করিয়া নন্দিনীকে ফুল আনিয়া দিতে পারার মধ্যেই সে বাঁচার আনন্দ অনুভব করে। নন্দিনী কিশোরকে সতর্ক করে—"ওরে কিশোর, জান্‌তে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।"

কিশোর শাস্তির বিনিময়েও বাঁচার আনন্দ পাইতে চাহে; সে জোর গলায় বলে—'ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।' কিশোরপ্রাণই মুক্তির আনন্দে—বাঁচার আনন্দে প্রথম সাড়া দেয়।

অধ্যাপক—যিনি পাণ্ডিত্যের জালের পিছনে 'মানুষের অনেক খানি বাদ দিয়া'—বস্তুতত্ত্বের গহ্বরের মধ্যেই বেশী সময় থাকেন, তিনিও নন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন—নন্দিনীকে দেখিলেই তাঁহার মনটা নড়িয়া উঠে—বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া উঠে। অধ্যাপক উপলব্ধি করেন, নন্দিনীর সঙ্গে যে দরকার সে ঠিক

ব্যবহারিক দরকার নয়—দরকারের সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতেই যেন নন্দিনীলোকের সীমারম্ভ। দরকারের সন্ধানে ছুটিয়া মানুষ কেবল ধূলোর সোনাই পায়, কিন্তু নন্দিনী যে আলোর সোনা। অধ্যাপক নন্দিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন—যক্ষপুরে তুমি সেই 'আচমকা আলো।' (অধ্যাপক না-বলার মধ্যেই যেন এই কথা বলেন—ন চিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ)। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক যক্ষপুরীর সাধনার স্বরূপও প্রকাশ করেন—জানান অর্থ-শক্তিকে বশীভূত করার সাধনাই সেখানে একমাত্র সাধনা—'সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে'। নন্দিনীও রাজার প্রকৃতিকে আঙ্গুল দিয়া দেখায়—"তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধরা পড়ে"। রাজার ঐ মানুষটিকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছাও নন্দিনী প্রকাশ করে। রাজার মানুষছাঁকা ভয়ংকর প্রতাপকে—যাহাকে যক্ষপুরীর লোকে রাজার মহিমা বলিয়া মনে করে—নন্দিনী 'বানিয়ে তোলা কথা' বলিলে অধ্যাপক তাহাতে সায় দেন—ধনী-দরিদ্রের আসল পরিচয়টা প্রকাশ করিয়া দেন—'বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরী'। নন্দিনী অধ্যাপকের বদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে—'তুমিও তো···দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ।' নন্দিনী বোধ হয় বলিতে চাহে—শ্রমিকরা যেমন বস্তুর পিছনে—সোনার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া মুক্তির আনন্দকে হারাইয়া বসিয়াছে, অধ্যাপকও তেমনি বস্তুতত্ত্বের পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া অবকাশের আনন্দকে—মুক্তির আনন্দকে, সহজ-সুখের আনন্দকে হারাইয়া বসিয়াছে। নন্দিনীকে অধ্যাপক ঘরের মধ্যে আহ্বান করেন। কিন্তু নন্দিনী জানায়—তাহার সঙ্কল্প আরো বড়—"আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব। জালের বাঁধা নন্দিনী মানে না—মানিতে চাহেও না। সে আসিয়াছে ঘরের

মধ্যে ঢুকতে। নন্দিনীর হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগে—"এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?" অধ্যাপক বুঝাইয়া দেন—সব জিনিষকে টুকরো টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি, অধ্যাপকের বলিবার কথা বোধ হয় এই—ইহারা আনন্দ না চাহে—মুক্তি না চাহে এমন নহে, কিন্তু ইহারা আনন্দকে চাহে অথচ প্রাণকে অস্বীকার করে, জানে না যে প্রাণকে চাপিয়া মারিয়া, পিষিয়া মারিয়া আনন্দকে পাওয়া যায় না। নন্দিনী রঞ্জনের মহিমা জানায়—বলে 'রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।······রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।' 'রঞ্জন যেমন হাসতেও পারে, তেমনি ভাঙতেও পারে'। নন্দিনী অধ্যাপককে জানায়—'আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে'। অধ্যাপক আর বেশী সময় মুক্তির আনন্দে থাকিতে সাহস করেন না, নন্দিনীকে সতর্ক করিয়া দিয়া—'যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেড়ে না,' সেইখানে যাইতে অনুরোধ করেন—আর একটি অনুরোধও করেন—রক্তকরবীর কঙ্কন হইতে একটি ফুল খসাইয়া দেওয়ার জন্য—তাঁহার দৃঢ় ধারণা—"ওই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়।" নন্দিনী রক্তকরবীর ধারণের রহস্য প্রকাশ করে—"রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি"। নন্দিনী অধ্যাপককে প্রাণের স্পর্শের নিদর্শনস্বরূপ একটি ফুল দেয়। অধ্যাপক প্রস্থান করে।

সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুল নন্দিনীকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না—কেবল প্রশ্ন করে "তুমি কে"। নন্দিনী বলে যে, সে যাহা তাহাই, সহজ ভাবে তাহাকে না বুঝিতে পারিলে সে অবোধ্যই—(যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি)—অথচ না বুঝিলেও গোকুলের ভাল ঠেকে না—গোকুলের মধ্যেও মুক্তির আনন্দের জন্য একটা অবোধপূর্ব্ব অভীপ্সা। গোকুলের প্রাণে যত চাঞ্চল্য

জাগে, তত গোকুল নন্দিনীকে সন্দেহ করে—অবিশ্বাস করে। গোকুলের মনে হয়—নন্দিনী যেন "রাঙা আলোর মশাল"। গোকুল নির্ব্বোধদের 'সাবধান' করিতে প্রস্থান করে।

এইবার নন্দিনী জালের দরজায় ঘা দিয়া ডাকে—'শুনতে পাচ্ছ?' রাজা সাড়া দেন—'শুনতে পাচ্ছি······বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও নেই।' নন্দিনী আবেদন জানায়—'খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই'—নন্দিনী রাজাকে মুক্তির আনন্দ দিতে চায়, রাজা প্রত্যাখ্যান করেন—শূন্যতার শোভা লইয়াই তিনি থাকিতে চাহেন।

নন্দিনী রাজাকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া জাগাইতে, প্রকৃতির সহিত সহজ যোগ স্থাপন করিতে, মাঠে লইয়া যাইতে চাহে; রাজা স্বীকার করেন—'সহজ কাজই আমার কাছে শক্ত'। নন্দিনী রাজার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, কিন্তু সে শক্তির সহিত আনন্দের কোন যোগ নাই যে। নন্দিনী নিষ্প্রাণ শোষণপরায়ণ শক্তির কার্য্য-ফলকে রাজার সম্মুখেই বর্ণনা করেন—স্পষ্টভাবেই বলেন, "কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস······দেখছ না এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে কিংবা সন্দেহ করছে কিংবা ভয় পাচ্ছে······ খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত·· ···রাজা শাপ সম্বন্ধে সচেতন নহেন কিন্তু শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন—গর্ব্বিতও। নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করেন— 'আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও নন্দিনী'? নন্দিনী—প্রাণ পূজারিণী। শক্তি দেখিয়া খুশি না হইয়া সে পারে না; কিন্তু শক্তি যখন পৃথিবীর খুশীকে আত্মসাৎ করিয়া—আচ্ছন্ন করিয়া, শুধু প্রতাপ রূপেই প্রকাশ পায় সেই শক্তির সহিতই নন্দিনীর বিরোধ। নন্দিনী এই কারণেই রাজাকে আলোতে বাহির হইতে, মাটির উপর পা দিতে এবং পৃথিবীকে খুশী করিতে অনুরোধ করে।

নন্দিনী বোধ হয় রাজশক্তিকে শোষণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পালন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলেন—রাজশক্তির সহিত প্রজার সহজ ও আন্তরিক যোগ, প্রেমের যোগ স্থাপন করিতে বলেন। রাজা কিন্তু শক্তিবলেই সবকিছু লাভ করিতে চাহেন—এমন কি মুক্তির ও সৌন্দর্য্যের আনন্দকেও—নন্দিনীকেও। নন্দিনীকে বলেন· "আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।"

রাজা নন্দিনীর মুখে নিজের মহিমাকে আস্বাদন করিতে চাহেন—জিজ্ঞাসা করেন—'আমাকে কী মনে কর বলো'। নন্দিনী উত্তর করে—'মনে করি আশ্চর্য্য······দেখে আমার মন নাচে'। রঞ্জনের প্রতি কথা রাজার মনে পড়ে—নন্দিনীকে যে রঞ্জনই সহজ আকর্ষণে প্রেমে বন্দী করিয়াছে। রঞ্জনকে দেখিয়া নন্দিনীর মন যে ভাবে নাচে, ইহাও কি সেই নাচ? নন্দিনী রাজার সন্দেহ দূর করেন—'সে-নাচের তাল আলাদা' রাজার মর্ম্মে উপলব্ধ, হয়—"আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে যাদু"। বুঝাইয়াও বলেন—"দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারিনে"।

রাজা নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে নিজের দুর্ব্বলতা ও দীনতা প্রকাশ করেন—আক্ষেপ করেন—'শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই······হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' রাজার কথার তাৎপর্য্য—শক্তি যতই বৃদ্ধি পাক, সহজ-আকর্ষণ যৌবনের ধর্ম্ম তাহাতে আসে না, আনন্দকে বাঁধা যায় না—সহজ-আকর্ষণেই লাভ করিতে হয় (যমেব এষো বৃণুতে)।

রাজা তাহার তপ্ত, রিক্ত এবং ক্লান্ত অন্তর-সত্তাটিকে মেলিয়া ধরেন—ভিতরে-ভিতরে-ব্যথিয়ে-উঠা হৃদয়টিকে বিশ্লেষণও করেন—"শক্তির ভার নিজের অগোচরে···নিজেকে পিষে ফেলে···।" রাজা উপলব্ধি করেন—

সহজই সুন্দর, নন্দিনী সহজ, তাই সে সুন্দর। রাজার মধ্যে সঙ্কল্প জাগে—'বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।' রাজা সুন্দরের স্পর্শ লাভ করিতে হাত বাড়াইয়া দেন। কিন্তু সুন্দরকে "সব দিয়ে"ই যে লাভ করিতে হয়। নন্দিনী রঞ্জনের কথা তুলিলে—রাজা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। আদেশ করেন—"যাও, তুমি চলে যাও—নইলে বিপদ ঘটবে।" নন্দিনী জানাইয়া যায়—"রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে—কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না"

খোদাইকর ফাগুলাল ও তাহার স্ত্রী চন্দ্রা আলাপ করে—শ্রমিক-জীবনের অবসন্ন অবসরের চিত্র ফুটাইয়া তোলে। 'যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই' যে। সহজ আনন্দের বরাদ্দ বদ্ধ বলিয়াই ছুটির অবসরটুকু হাটের মদের মাতলামি দিয়া পূর্ণ করিতে চাহে। চন্দ্রা ফাগুলালকে সাবধান করিয়া দেয়—বিশুকে নন্দিনীতে পাইয়াছে, কাহাকে কখন পাইবে না পাইবে বলা যায় না। বিশু প্রবেশ করে গান করিতে করিতে। চন্দ্রা বিশুর "স্বপন-তরীর নেয়ে"কে চিনে—বলে 'তোমার সেই সাধের নন্দিনী।' প্রবেশ করে—গোকুল খোদাইকর। তাঁহারও নন্দিনীকে ভালো ঠেকে না। কাজের রাজ্যে কিছুই করে না, তাই তো খট্‌কা লাগে। চন্দ্রাও নন্দিনীকে ভালো চোখে দেখে না—দুঃখের জায়গায় 'অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে।' যক্ষপুরী সুন্দরের উপর অবজ্ঞা ঘটাইয়া দেয়—বিশু বলে 'এইটেই সর্ব্বনেশে'। ফাগুলালের প্রশ্নের উত্তরে বিশু মদ খাওয়ার 'কেন'কেও ব্যাখ্যা করে—সকল কথার মধ্য দিয়া এই কথাই বলে যে—প্রাণের জন্য মদ চাইই চাই—সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হইয়া গেলেই অন্তরাত্মা হাটের মদ লইয়া মাতামাতি করে। আনন্দের কামনা সহজাত যে!

বিশু আরো স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেয়—'একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে—বলছে, কাজ করো। অন্যদিকে

বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে—বল্‌ছে, ছুটি ছুটি ছুটি।' এই ছুটিই প্রাণের মদ। এই খোলা মদের আড্ডায় যাহারা যোগ দিতে পারে না, তাহারাই কয়েদখানার চোরাই মদের টানে ছুটে।—বিশু বলে 'আমাদের না আছে আকাশ না আছে অবকাশ, তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্য্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে'। শ্রমিকদের অবকাশহীন এবং সহজ-আনন্দহীন জীবনের অবসন্ন অবসরটুকু মাতলামিতে পূর্ণ করিবার হেতু বিশু বিশ্লেষণ করে।

চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তরে বিশু নারীর সোনার লোভের প্রভাব ও পরিণামও ব্যাখ্যা করে—বলে 'তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া'। বিশু বোধ হয় বলিতে চাহে—পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর বাসনারও একটা বড় অংশ আছে। পুরুষ নারীর স্বপ্ন-সাধ মিটাইয়াই নিজের পুরুষকারকে আস্বাদন করে—নারীর সোনার স্বপ্নসাধ মিটাইতে যাইয়াই পুরুষ বেশী করিয়া সোনার ফাঁদে আপনাকে ধরা দেয়। বিশু একথাও বলে—"আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে"। বিশু, চন্দ্রা ও ফাগুলালের কথায় প্রকাশ পায়—"যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়—শ্রমিকরা যাহাকে আদর করে, সর্দ্দারদের দৃষ্টি সেখানেই পড়ে—যক্ষপুরে 'মানুষ'কে সংখ্যায় পরিণত করা হইয়াছে—'গাঁয়ে ছিলুম মানুষ এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক, বুকের উপর দিয়ে জুয়াখেলা চলেছে'—স্বৈরাচারী শাসনে—'কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।'

সর্দ্দার প্রবেশ করেন—পয়োমুখ কিন্তু বিষকুম্ভ। চন্দ্রাকে নাতনী বলিয়া খাতির দেখান—বিশুকে কটাক্ষও করেন। বিশুও উত্তর দিতে ছাড়ে না—

'তোমাদের এলেকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোট! দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে'। সর্দ্দার সুখবর দেন—কেনারাম গোঁসাইকে নিয়োগ করা হইয়াছে—ভালোকথা শুনাইবার জন্য।

গোঁসাই প্রবেশ করেন—ভাড়াটিয়া প্রসাদলোভী প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। অধর্ম্মকে শাস্ত্রের বচনের আড়ালে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার জন্যই এই গোঁসাই। বিশেষতঃ শোষণের বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক ক্ষোভ মাথা তুলিতে চাহে, সেই ক্ষোভকে পরলোকের ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই গোঁসাই নিযুক্ত। ধনতন্ত্রের হাতে-ধরা-দেওয়া পুরোহিত এই গোঁসাই। শোষিত শ্রমিকদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অবিচলিত রাখাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। হরিনাম দিযাই ইনি ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্ষোভ শমণ করিতে সচেষ্ট। ফাগুলাল ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কিন্তু চন্দ্রা পরকাল খোয়াবার ভয়ে স্বামীকে তিরস্কার করে। শেষ পর্যন্ত সর্দ্দার নিজেই ভার নেন—ধর্ম্মনীতির কবলের মধ্যে যখন যাইতে চাহে না, তখন দণ্ডনীতিই চালানো বাঞ্ছনীয়। বিশু অনেকটা নির্ভীক—প্রাণবান, সর্দ্দারকে স্মরণ করাইতে ভুলে না—শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। 'কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হবে উঠে, বর্ম্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ'। বিশু যেন বলিতে চাহে—যে শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, সমাজকে ধারণ করিয়া আছে, ভোজ্য ও ভোগ্য যোগাইয়া থাকে, তাহারা কি চিরকালই 'কূর্ম্ম' হইয়া থাকিবে? তাহা নহে। প্রাণের স্পন্দন জাগিলেই তাহারা বিদ্রোহ করিবে।

এখানেই বিশু চন্দ্রাকে জানায়—'ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না' অর্থাৎ নারীর প্রেমের স্পর্শ হইতেও শ্রমিকদের দূরে রাখিবার প্রাণকে একেবারে পিষিয়া মারিবার

ষড়যন্ত্র হইয়াছে। বিশু নন্দিনীর ডাক শুনে—চন্দ্রা জানিতে চায়—'কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে' বিশু চন্দ্রাকে বুঝায়—যে দুঃখকে ভোলার মত দুঃখ আর নাই। সেই দুঃখেই নন্দিনী তাহাকে ভুলাইয়াছে। এই দুঃখ 'দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ সেই দুঃখ, নন্দিনীর মধ্যে সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটির প্রকাশ।' চন্দ্রা এ সব নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিলেও অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু বুঝিয়াছে—"যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ, সেই তোমাদের তত বেশী টানে।"

নন্দিনী আসে বিশুর কাছে। বিশু উপলব্ধি করে—"আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।" নন্দিনীর কাছে সে প্রকাশ করে, "তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী", নন্দিনীও প্রকাশ করে রঞ্জন কি ভাবে তাহাকে জিতিয়া লইয়াছে। রঞ্জন "প্রাণ নিয়ে সর্ব্বস্ব পণ করে···হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই···জিতে নিয়েছে।"

বিশুর ইতিহাসও জানা যায়—বিশুও একদিন প্রাণ লইয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হারজিতের খেলা খেলিত, কিন্তু কী মনে করিয়া প্রাণের সহজ সাধনার ভিড থেকে একলা বাহির হইয়া গিয়াছিল। বিশুর তরী হাওযায় হাওয়ায় 'অচেনার ধারে' যাইয়া উপস্থিত, আবার সেখান হইতে, একটি মেয়ের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া বিশু যক্ষপুরীতে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিশুর সোনার শিকল ভাঙ্গিবেই—সঙ্কল্প করে নন্দিনী। আর নন্দিনী রাজার ঘরে ভিতরে যাইয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত করে। রাজা সব কিছুকেই স্পষ্টভাবে জানিতে চায়। যাহা সে বুঝিতে পারে না তাহা উহার মনকে ব্যাকুল করে। বিশুর কথায় সর্দ্দারকেও চেনা যায়। সর্দ্দার—'প্রাণকে শাসন করবার জন্তেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।'

সর্দ্দারও প্রবেশ করেন। বিশু স্পষ্ট ভাষায় সর্দ্দারের মুখের পরেই বলে—"তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি"। সর্দ্দার

বিস্মিত। নন্দিনী সর্দ্দারকে রঞ্জনকে আনিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্দ্দার বলে—'আজই তাকে দেখতে পাবে।'

নন্দিনী রাজাকে ডাকে—অনুরোধ করে—"ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা আছে।" রাজা বলেন, 'এখনও সময় হয়নি।'

নন্দিনীর সাথী বিশু—সে গান গায়। রাজা সহিতে পারেন না সাথীকে, তাহার কোন সঙ্গী নাই যে। রাজা আজ যেন শুধু টিকিয়া থাকিতেই চাহেন না, বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, তাই তিন-হাজার-বছর-টিকিয়া থাকা মরা ব্যাঙটাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রাজা রঞ্জন ও নন্দিনীকে একসঙ্গে দেখিতে চাহেন—ঘরের ভিতরে অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনিয়া জানিতে চাহেন। নন্দিনী রাজাকে বুঝাইতে চাহে, এমন কিছু আছে যাহাকে মন দিযা জানা যায় না, শুধু প্রাণ দিয়াই উপলব্ধি করা যায়। রাজার ঠকিবার ভয়—যাহা জানার গণ্ডীর বাহিরে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে তাহার সাহস হয় না। তবু রাজা রক্তকরবীর গুচ্ছটা চাহেন, না চাহিযা পারেন না। না-পাওয়া সৌন্দর্য্যকে ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবার ইচ্ছা জাগে, আবার পাওয়ার ইচ্ছাটা স্থগিত থাকে। রাজা নন্দিনীকে ভয় দেখান, রঞ্জনকে দলিয়া ধূলোর সঙ্গে মিলাইযা দিলে কী হইবে। ভয়ংকর সাজিবার মোহ তাহার সমান বলবান। নন্দিনী স্পষ্টভাষায় রাজ-মহিমাকে বিশ্লেষণ করে, প্রমাণ করে যে, যাহারা ভয় দেখাবার ব্যবসা করে, সেই সব লোকই জাল দিযা ঘিরিয়া রাখিযা রাজাকে অদ্ভুত সাজাইয়া রাখিয়াছে, রাজা একটা 'জুজুর পুতুল' মাত্র। নন্দিনী রাজাকে বুঝাইয়া দেয়, ভয় দেখাইয়া রাজ-মহিমা রাখা অসম্ভব। বলে—"এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ, তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে।" সে যেন বলিতে চাহে—ভয় দেখাইয়া, নিষ্ঠুরতা করিয়া রাজ-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। যখনই ভয়ার্ত্তদের মধ্যে—নিষ্পীড়িতদের প্রাণ জাগিয়া উঠিবে, তখনই রাজ-মহিমার অবসান ঘটিবেই ঘটিবে। নন্দিনীর কথা শুনিয়া রাজা

রাজ-অহংকারে গর্জ্জন করিয়া উঠেন—তিনি যে কী নিষ্ঠুর তাহার সমস্ত প্রমাণ নন্দিনীর কাছে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতে তাহার ইচ্ছা জাগে! নন্দিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়। রাজার দীন-আত্মা ঐকান্তিক ব্যাকুলতা লইয়া ডাকে—'নন্দিনী'! নন্দিনী গান গাহে, কিন্তু রাজার বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া আছে, "গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছা করে" বলিয়া, রাজা পলাইয়া যান। নন্দিনী বিশুকে জানায়—'আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে'। বিশু নন্দিনীর অনুরোধে—'পথচাওয়ার গান' গায়।

সর্দ্দার ও মোড়ল সঙ্কল্প আঁটে—"রঞ্জনকে কিছুতেই আসতে দেওয়া চলবে না।" রঞ্জনকে লইয়া বড় মুসকিল—সে হুকুম মানিতে চাহে না—'মানুষটার ভয় ডর কিছুই নেই', সে কাজের রশি খুলিয়া দিয়া কাজকে নাচিয়া চালাইতে চায়। রঞ্জন বাঁধনের বশ নহে, কথায় কথায় সাজ বদল করে, চেহারা বদল করে।

ছোট্ট সর্দ্দার প্রবেশ করে—রঞ্জনকে বাঁধিতে চলে। সে ইহাও জানায় যে, মেজো সর্দ্দারের মনে রঞ্জনের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। সর্দ্দার রঞ্জনকে রাজার ঘরে পাঠাইবার আদেশ করে—নিজেও চলে।

এইবার দেখা দেন অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশ। অধ্যাপক রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি খুলিয়া বলেন এবং আভাস দেন—রাজা জ্ঞান-যোগের পর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন! রাজার কথা—জ্ঞান-যোগীর অশান্ত প্রশ্ন—"তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে, কিন্তু প্রাণ পুরুষের অন্দরমহল কোথায়?" সেই জন্যই এই প্রশ্নের পাশ কাটাইতেই অধ্যাপক পুরাণবাগীশকে আনিয়াছে; উদ্দেশ্য—"ওকে পুরাণ আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক।" বস্তুতত্ত্ববিদ্যা বুদ্ধির গবাক্ষলণ্ঠনের আলোকে জগতকে অংশে-অংশে আলোকিত করে, কিন্তু যাহা কেবল অনুভবগম্য তাহাকে বুদ্ধি-যোগে পাওয়া যায় না বলিয়াই

বস্তুতত্ত্ব-বিদ্যা সীমাবদ্ধ। অধ্যাপককে নন্দিনী তাই আকর্ষণ করে—প্রাণের টান জাগাইয়া তুলে, ফলে তাহার পাকা হাড়েও ঠোকাঠুকি বাধে—তাহার বস্তুতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটিয়া চলে রাজা অধ্যাপককে যেমন সহিতে পারেন না, পুরাণবাগীশকেও তাহার ভালো না। সর্দ্দার জানায় —'রাজা বলে পুরাণ বলে কিছু নেই, বর্তমানটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।'

এমন সময় নন্দিনী দ্রুত প্রবেশ করে—চোখের সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য—মনে হয় যেন প্রেতপুরীর দরজা খুলিয়া গিয়াছে। প্রহরীদের সঙ্গে রাজার এঁটো—মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ-হীন কতকগুলি একদা-মানুষ কোথায় যেন যায় নন্দিনী দেখে—অনুপ আর উপমন্যু যে—ওই-যে শকলু তলোয়ার খেলোয়াড় —আখের-মত-চিবিয়ে-ফেলা কঙ্কু। নন্দিনী হতাশায় হাহাকার করে—"গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।" অধ্যাপকের মনে পড়ে—"বড় হবার তত্ত্ব।" নন্দিনীকে বুঝায়—সেই অদ্ভুত শক্তির রাজা যাহার জমা, এই সকল কিম্ভূত তাহার খরচ। "ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বুড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা।" নন্দিনী এই ব্যবস্থাকে 'রাক্ষসের তত্ত্ব' বলিয়া ধিক্কার দেয়। কিন্তু অধ্যাপক তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে দেখেন …"যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।" নন্দিনী এই 'হওয়া'কে ধিক্কার দেয়—রাস্তার সন্ধান জানিতে চায়। অধ্যাপকের ধারণা—রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে। অধ্যাপক বোধ হয় এই কথাই বলিতে চাহে যে, সর্ব্বহারাদের, শোষিতদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিলে, তাহারাই পথ কাটিয়া বাহির করিবে। নন্দিনী অস্থির উৎকণ্ঠায় রাজাকে ডাকে; কিন্তু রাজার সাড়া পাওয়া যায় না—'ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে'। নন্দিনীর ভয় করে। রঞ্জনকে চিনাইয়া দিবার জন্য বিশু গিয়াছে কখন, এখনও যে সে আসে না। একদা-পালোয়ান

গজ্জুর আর্তনাদ শোনা যায়। অধ্যাপক গজ্জুকে গোড়াতেই সাবধান করিয়াছিলেন ‘এ রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন ‘বেঁচে থাকবে’…এ বড়ো কঠিন জায়গা। অধ্যাপক যক্ষপুরীর সমাজের প্রবৃত্তিটিও প্রকাশ করেন—‘ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে।’ নন্দিনী ‘শুধু থাকা’কে ধিক্কার দেয়, বলে ‘মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী!’ অধ্যাপকও বলেন, “থাকবার জন্যে মরতে হবে এ কথা যারা বলে তারাই থাকে।”

প্রবেশ করে পালোয়ান। সব পালোয়ানি নিঃশেষ, অথচ বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না। পালোয়ান সর্দ্দারের পরে আক্রোশ প্রকাশ করে, সর্দ্দারের অভিসন্ধি ব্যক্ত করে—“সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়”। নন্দিনীর প্রশ্নে সর্দ্দার নিজের অবস্থা, শোষণের অবস্থা জানায়—“ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে……শুধু জোর নয় একেবারে ভরসা পর্য্যন্ত শুষে নেয়!” নন্দিনী পালোয়ানকে বাসায় লইয়া যাইতে চাহে, কিন্তু সতর্ক অধ্যাপক সাহস করেন না—রাজদ্রোহের অপরাধের আশঙ্কা করেন। সর্দ্দারকে দেখিতে পাইয়াই অধ্যাপক প্রস্থান করেন, তবে যাইবার সময় সর্দ্দারের মনটাকেও বিশ্লেষণ করিয়া যান, ‘তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ, যতই সুর মিলছে না, ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।’

সর্দ্দার ও গোঁসাই প্রবেশ করেন। নন্দিনী পালোয়ানের একটা ব্যবস্থা করিতে গোঁসাইকে অনুরোধ করে। গোঁসাই ধনতন্ত্রে মানুষের প্রাণের মর্য্যাদা কতটুকু চমৎকারভাবে তাহা বুঝান—‘যে-পরিমাণ বাঁচা দরকার……সর্দ্দার নিশ্চয় ওকে সেই পরিমাণেই বাঁচিয়ে রাখবে।’ আর সঙ্গে সঙ্গে শোষক শ্রেণীর অভিপ্রায় ও ভণ্ডামির আবরণটাও আলোকিত করেন—“আমাদের

শ্রেণীর লোকের পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশী পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি।” আশ্চর্য্য! ‘নন্দিনীর সাহায্য লইতে পালোয়ানও ভয় পায়।’ ‘সর্দ্দার রাগ করবে’ এই ভয়ে পালোয়ান হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে চলিয়া যায়—নন্দিনীর উপকারের হাতখানাও এড়াইতে চায়। নন্দিনী সর্দ্দারকে বিশু পাগলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে—গোঁসাই বলেন, ‘যেখানে যাক সবাই ভালোর জন্যে।’ নন্দিনী গোঁসাইয়ের জপমালা ধরিয়া টান দেয়—গোঁসাই অগত্যা প্রস্থান করেন। সর্দ্দার উত্তর করে—‘তাকে বিচারশালায় ডেকেছে’…। সর্দ্দার ইহাও ঘোষণা করে—“অনেককে টানবে তারপরে, শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরি নেই।” সর্দ্দার রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর মিলন কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।

কিশোর আসিয়া সংবাদ দেয়—বিশুর সঙ্গে দেখা হবে। বিশুকে দেখাও যায়—তাহার হাতে হাতকড়ি। বিশু বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী……রঞ্জনের সঙ্গে মিলনের কামনা জানাইয়া বিশু নন্দিনীর নিকট বিদায় লয়।

চিকিৎসক এবং সর্দ্দার আসিয়া যথাক্রমে রাজার ভিতরকার এবং বাহিরকার সংবাদ জানায়। ‘ব্রত’ পাড়ার মোড়ল আসে—ধামা-ধরা—পদলেহী রাজসেবক মেজো সর্দ্দার আসিয়া অনেক বিষয়ে ‘কিন্তু’ তুলে—সর্দ্দারের মত রাজাকে ঠকানো সে কর্ত্তব্য মনে করে না, কেনারাম গোঁসাইকে সে নামাবলী ভেদ করিয়াই চিনিয়াছে—কেনারাম নাকি একপিঠে গোঁসাই, একপিঠে সর্দ্দার। সর্দ্দার বুঝিতে পারে—মেজো সর্দ্দারের রক্তের সঙ্গে সর্দ্দারির মিল হয় নাই এবং তাহার চোখে নন্দিনীর ঘোর লাগিয়াছে। কিন্তু

মেজো সর্দ্দারও সর্দ্দারকে নিজের চেহারা দেখিতে বলে, কারণ তাহার চোখেও কর্ত্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশিয়াছে। সর্দ্দার ভাবে—'মনের কথা মন নিজেও জানে না।'

নন্দিনী প্রবেশ করে—চারিদিকে তাহার সিঁদুরে মেঘের রঙীন আভা। মনে হয়—"ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ।" নন্দিনী রাজাকে ডাকে—'শোনো, শোনো, শোনো'। গোঁসাই আসিয়া অযাচিত ভাবে নন্দিনীর মঙ্গল চিন্তা করিতে দাঁড়ান। নন্দিনীকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইয়া নাম শোনাইতে চাহেন। নন্দিনী শুধু নাম লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। শুধু নাম লওয়ার শান্তিকে সে ধিক্কার দেয়। নন্দিনী গোঁসাইকেও ধিক্কার দেয়—'যাও, যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।'

প্রবেশ করে ফাগুলাল ও চন্দ্রা—বিশুকে হারাইয়া তাহারা আত্মহারা। ফাগুলালের নন্দিনীকে আজ কেমনতর ঠেকিতেছে. চন্দ্রা তো তাহাকে রাক্ষসী মনে করে, ভৎ´সনাও করে—সর্ব্বনাশী বলিয়া। নন্দিনীর এক কথা—ও মুক্তি চায়, বিশুর কথাও বলে—'বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি'। ফাগুলাল প্রতিজ্ঞা করে—'বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব'। নন্দিনীও ফাগুলালের সঙ্গে যাইতে চাহে। এই সময় গোকুল আসে—ডাইনীকে—নন্দিনীকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প লইয়া। ফাগুলালের সহিত গোকুলের বচসা হয়। গোকুল 'মিষ্টিমুখী সুন্দরী' অপেক্ষা সহজ শত্রু সর্দ্দারকে বেশী শ্রদ্ধা করিতে চাহে। নন্দিনী বুঝাইয়া দেয়—যে দাস সে কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। ফাগুলাল গোকুলকে পৌরুষ দেখাইতে বলে, কিন্তু বালিকার কাছে নহে।

নন্দিনী রঞ্জনের খোঁজে ব্যাকুল। দলের পর দল ধ্বজাপূজায় যায়, আর নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—'রঞ্জনকে দেখেছ'। কেহই বলিতে পারে

না। শুধু একজন বলে, 'ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো'।

নন্দিনী রাজাকে ডাকে—'সময় হয়েছে দরজা খোলো'। রাজা ধ্বজা-পূজার দিনে মন বিক্ষিপ্ত করিতে নিষেধ করেন, নন্দিনী নিষেধ মানে না, নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা 'মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।' রাজা বলেন, 'এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে'। নন্দিনীও অটল—'বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না'।

রাজা দরজা খুলেন, তখনই নন্দিনী দেখে কে যেন পড়িয়া। রঞ্জনই পড়িয়া আছে। রাজা দেখেন তাহার নিজের যন্ত্রই তাহাকে মানে না। সর্দ্দারকে বাঁধিযা আনিবার আদেশ দেন। নন্দিনী কাঁদে—'আমি সইতে পারছিনে, কেন এমন সর্বনাশ করলে'। রাজা অনুতপ্ত মরা-যৌবনের অভিশাপে অভিশপ্ত। নন্দিনী রঞ্জনের চূড়ায় নীলকণ্ঠ পাখীর পালক পরাইয়া দেয়, আক্ষেপোক্তি করে 'তোমার জয়যাত্রা আজ থেকে শুরু হ'য়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।' নন্দিনী রাজার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে। মৃত্যুকেই নন্দিনী বড় অস্ত্র মনে করে ; মনে করে, তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্ত্তে 'আমার সেই মরা তোমাকে মারবে।'

রাজার পরিবর্ত্তন ঘটে। নন্দিনীর সাথী হইয়া নিজের বিরুদ্ধেই নিজে লড়াই করিতে প্রস্তুত হন। নিজের ধ্বজা নিজেই ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সমস্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজা হাতে হাত রাখেন। নিজের বন্দীশালা নিজেই ভাঙিতে ছুটেন। রাজা জানেন সর্দ্দারদের সঙ্গেই শেষপর্যন্ত লড়িতে হইবে। নিজের সৈন্যশক্তির সঙ্গেই একলা যুদ্ধ করিতে হইবে। জিতিতে না পারিলেও মরিয়া বাঁচিতে পারিবেন। এতদিনে মরিবার অর্থ দেখিতে পাইয়াই তিনি বাঁচিয়াছেন। রাজা দেখেন সর্দ্দার রাজশক্তি দিয়াই রাজাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রাজা নন্দিনীর পিছনেই যাত্রা করেন। অধ্যাপকও

ছুটিয়া আসেন রাজা চরমপ্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন শুনিয়া। নন্দিনীকে ধরিতে অধ্যাপকও ছুটিয়া যান।

বিশু আসিয়া নন্দিনীর খোঁজ করে। ফাগুলাল বলে, নন্দিনী 'শেষমুক্তিতে' আগাইয়া গিয়াছে। বিশু ফাগুলাল নন্দিনীর জয়ধ্বনি করিয়া লড়াই করিতে ছুটে। বিশু "রক্তকরবীর কঙ্কন"—বিদ্রোহের রক্তপতাকা—ধূলা হইতে কুড়াইয়া মাথায় তুলিয়া লয়।

নাটকের ভাব-সত্য

উল্লিখিত কাহিনী-রূপরেখা হইতে নাটকের ভাব-সত্তাটি উদ্ধার করিতে যাইয়া প্রথমেই এই কথাটি মনে আসে যে, নাটকখানি নানা ভাব-ব্যঞ্জনার সমবায়ে রচিত। তবে মুখ্য রূপে যে আধ্যাত্মিক ভাবকেই ব্যঞ্জিত করা হইযাছে সে ভাবটি এই যে, কেবলমাত্র অন্নময় কোষেই জীবাত্মা গঠিত নহে, তাহার মধ্যে যে আনন্দময়-কোষ আছে সেই কোষের প্রেরণাতেই মানুষ আনন্দ চাহে, কারণ আনন্দ-সত্তার মধ্যেই মানুষের সম্পূর্ণতার পরিচয়, মুক্তির অনুভূতি। তাই আনন্দেই মুক্তি এবং মুক্তিতেই আনন্দ। প্রাণের সাধনা যখন আনন্দের লক্ষ্যে না যাইয়া, শক্তির লক্ষ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন সে হয় বিকৃত, নিজের শক্তির অহংকারের কারাগারে নিজেই হয় আবদ্ধ, আর প্রাণের সাধনা যখন আনন্দের অভিমুখে ধাবিত হয়, মুক্তির লক্ষ্যে একাগ্র-আগ্রহে ছুটিয়া চলে, তখনই প্রাণের সাধনা হয় সার্থক—নির্বিরোধ মুক্তিতে সে হয় মহিমময়, সে হয় 'রঞ্জন'। আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। নিছক প্রাণময়-কোষের ভূমিতে দাঁড়াইয়া রাজা শক্তির স্তূপের উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়া চলে, আনন্দ পায় না, চির অশান্ত।

বিজ্ঞানময়-কোষের ভূমিতে অধ্যাপক অনেক কিছু জানেন, কিন্তু

অন্তরাত্মা অপরিতৃপ্ত। অপরিপূর্ণতার শূন্যতা ইহাদের সকলের মধ্যেই অতৃপ্তির বেদনা হইয়া বাজে, আনন্দময়-কোষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসনা মর্ম্মদাহিনী হইয়া দেখা দেয়। নন্দিনীকে পাওয়ার কামনাই, মোহই শেষ পর্য্যন্ত মুক্তিরূপে ফলিয়া উঠে। নন্দিনীই তাহাদের রাসেশ্বরী হ্লাদিনী-সত্তা। নন্দিনীকে পাইয়াই ইহারা প্রকৃতিস্থ হয়, স্বরূপে অবস্থান করে।

এই আনন্দ-সত্তাকে, অন্তরাত্মাকে, বস্তু-সত্তা নানাভাবে বাঁধিতে চাহে। তাই জীবাত্মার মধ্যে সর্ব্বদাই এই দ্বন্দ্ব বস্তু-সত্তার সহিত আনন্দ-সত্তার দ্বন্দ্ব। বস্তু-সত্তা তাহার শক্তিবলে আনন্দ-সত্তাকে সাময়িকভাবে পরাজিত না করিতে পারে এমন নহে, আনন্দের সঙ্গ হইতে প্রাণকে বঞ্চিতও করিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ-সত্তারই জয় হয়, প্রাণের সহিত আনন্দের সম্মিলন ঘটে, বস্তুর বন্ধন কাটাইয়া প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া আত্মা আনন্দ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দিনীই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। অন্তরাত্মার মুক্তিই নন্দিনীর জয়।

এই ভাবটিকেই নাটকে প্রধানভাবে রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই নাটকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—কেন্দ্রীয় তত্ত্ব।

আর এই প্রধান তত্ত্বটিকে যে সামাজিক পরিবেশের কাল্পনিক আবরণে রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেই আবরণটি নাটকের উপতত্ত্ব—বলা যাক, সামাজিক তত্ত্ব। এই সমাজ ধনতন্ত্রের উৎকট এবং অন্তিম রূপের সমাজ; রাজ-শক্তি, মুষ্টিমেয় বহুসংগ্রহী এবং বহুগ্রাসী সর্দ্দারের শক্তি-জালের অন্তরালে এবং আত্মদ্বন্দ্বে অশান্ত। অষ্টপাশী শোষণে সকলেই নিষ্প্রাণ—জীবন আনন্দশূন্য; মানুষের মর্য্যাদা কেবল বস্তু সংগ্রহে অংশ গ্রহণের মর্য্যাদা,—মানুষ সংখ্যায় পরিণত। জীবনে তাহাদের "ঠাস দাসত্ব"; এই যক্ষপুরীতে সারাদিন রাত একটি কাজ—বস্তু সংগ্রহের কাজ—সোনার তাল খোঁড়ার কাজ। অবিশ্রাম পরিশ্রমে শ্রমিকরা এখানে—"মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ"-শূন্য। কাজের ফাঁকে যে অবসন্ন অবসরটুকু পায়; শ্রমিকরা তাহা মদ খাইয়া কাটায়। 'এখানে

কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই! এখানে মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির গায়ে গায়ে। শোষণে শোষণে এখানকার মানুষ দেহে-মনে নিঃস্ব—ইহাদের ভিতরটা একেবারে ফাঁপা—ইহাদের শুধু জোরই যায় নাই, ভরসা পর্য্যন্তও গিয়াছে।

এই শোষণ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্দ্দারগণ শুধু ফৌজ রাখিয়াই সন্তুষ্ট নহে, যাহাতে কোনরূপ উত্তেজনা কাহারো মধ্যে না আসে, সেইজন্য কেনারাম গোঁসাইয়ের মত ভাড়াটিয়া প্রচারকও নিযুক্ত রাখে।

ইহারা শাস্ত্রের বিকৃত ভাষ্য করিয়া, শোষণকে শাসন বলিয়া চালাইতে চাহে—কায়েমী স্বার্থের গুণগান করে এবং শ্রমিকদের মানসিক উত্তেজনাকে পরলোকের ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া প্রশমিত করিতে চাহে। এই ব্যবস্থায় ধন জমা হয় মুষ্টিমেয় সর্দ্দারগণের হাতে আর জনসাধারণ হয় সর্ব্বহারা—দেহে-মনে সর্ব্বতোভাবে নিঃস্ব।

কিন্তু এই শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, মুক্তির আনন্দের সহজ আকর্ষণে প্রাণে সাড়া জাগে—প্রাণ উপলব্ধি করে—"বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি।" এই উপলব্ধিতেই বিক্ষুব্ধ প্রাণ প্রতিকার করিতে সঙ্কল্পিত হয়। শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি লইয়া দাঁড়ায়। বন্দীশালা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিতে যায়—বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গণ-শক্তির বিদ্রোহের সঙ্গে অব্যক্ত রাজ-শক্তি (রাজশক্তি স্বরূপতঃ অব্যক্ত, সরকার-রূপে ব্যক্ত) আসিয়া হাত মিলায় অর্থাৎ রাজ শক্তিতে গণশক্তিতে তখন কোন বিরোধ থাকে না—পার্থক্য থাকে না; আর ইহাদের সংগ্রাম বাধে সর্দ্দার-সরকারের সঙ্গে—কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষকদের সঙ্গে। প্রাণের পর প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া গণশক্তি জয়ী হয়—রক্তকরবীর লাল-পতাকা উড়ে হাতে হাতে। প্রাণের মুক্তিকে অস্বীকার করিয়া—প্রাণের দাবী অস্বীকার করিয়া—প্রাণকে পীড়িত করিয়া কোন শাসনতন্ত্রই

টিকিতে পারে না। এই সত্যের ব্যঞ্জনা নাটকের উপতত্ত্ব বা সামাজিক তত্ত্ব।*

নাটকের "ভাব" রাজি

(ক) আনন্দেই মুক্তি—মুক্তিতেই আনন্দ, সহজই সুন্দর।

(খ) আনন্দের কামনা—মুক্তির বাসনা আত্মার স্বভাবের মধ্যেই কাছে। অন্নময়কোষ দেয় কাজের প্রেরণা আর আনন্দময়-কোষ দেখে ছুটির প্রেরণা। এই দুইয়েরই দাবী যেখানে সমানভাবে মিটে না, সেখানেই দ্বন্দ্ব, সেখানেই বিরোধ ও অশান্তি।

(গ) যে সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাণের দাবী—প্রাণের মুক্তি অস্বীকৃত, সে সমাজ-ব্যবস্থা নিজের অত্যাচার দিয়াই আপনার বিনাশের পথ প্রস্তুত করে। 'শক্তির ভার নিজের অগোচরে·· ···নিজেকেই পিষে ফেলে !'

---

* এই প্রসঙ্গেই বলা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ধনতন্ত্র ও বস্তুতন্ত্রকে এক বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ধনতন্ত্রে এবং বস্তুতন্ত্রে প্রাণের মুক্তি অস্বীকৃত এবং অস্বীকৃত বলিযাই উহারা অগ্রাহ্য। এই তন্ত্রে প্রাণের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিতে পারে না এবং পারে না বলিযাই প্রাণ সংহত শক্তি লইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় এবং উহার অবসান ঘটায়। নিষ্পীড়িত প্রাণই বিদ্রোহের পথে—প্রাণের বিনিময়েও মুক্তি উদ্ধার করে।

আরো একটি কথা মনে রাখিবার—এবং কথাটি এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ধারণাই কাজ করিযাছে যে রাজা এক হিসাবে নৈর্ব্যক্তিক, রাজ-শক্তিমাত্র (এই জন্যেই রাজা জালের আড়ালে—নেপথ্যে), রাজ-শক্তির ব্যক্ত রূপ সরকার (গভর্ণমেণ্ট)—এখানে সর্দার। এই সরকারের রূপেই রাজার রূপ প্রতিভাসিত এবং সরকারই রাজার শক্তি-রূপ। এব কারণেই রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তিকে মিলাইয়া দিয়া—সর্দারদিগকেই প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করাইয়াছেন এবং এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাজ-শক্তির সহিত প্রজাশক্তির মৌলিক বিরোধ নাই,—আসল বিরোধ সর্দার-সরকারের সঙ্গে।

(ঘ) ধনতন্ত্রে মানুষ অমানুষ হইয়া যায়। যাহারা শোষণকারী এবং যাহারা শোষিত উভয়ই মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

(ঙ) ধনতন্ত্র ছলে বলে কৌশলে আপনার কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত জন-শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না।

(চ) ধনতন্ত্রের উদ্দেশ্য—অর্থের শক্তি দিয়া পৃথিবীকে বশীভূত করা। এই কারণেই শোষণ, বিনাশন—রণ তাহার প্রকৃতিগত। ক্রোধ্-সন্দেহ-ভয়, খুনোখুনি, কাড়াকাড়ি ইহার অনিবার্য্য ফল।

(ছ) সৌন্দর্য্যকে-আনন্দকে জানা যায় না, অনুভব করিতে হয়। —দরকারের বাঁধনে উহাদের বাঁধা যায় না। শক্তির আকর্ষণে উহাদের পাওয়া যায় না—সহজ আকর্ষণেই উহারা ধরা দেয়। "আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না"।

(জ) 'এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ নেই।'

(ঝ) মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করে…। প্রাণকে শাসন করিবার জন্যেই প্রাণ দিয়া বসে।

(ঞ) ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওযা।

(ট) গাম্ভীর্য্য নির্ব্বোধের মুখোস।

(ঠ) বস্তুতত্ত্ববিদ্যা অনেক কিছুই জানাইতে পারে কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহলের পরিচয় দিতে পারে না।

(ড) 'ছোটগুলো হতে থাকে ছাই আর বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।'

(ঢ) শোষণের মার এমন মার যে 'বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না'।

(ণ) বড়োলোক বড়ো শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত

হয়, তখন আরেকটা খেলা না জোগাইয়া দিলে নিজের খেলনা ভাঙে।

(ত) যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

(থ) তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়।

(দ) "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে, কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে"।

(ধ) পুরুষের জীবনে নারীর স্বপ্নের বাসনার প্রভাব অসামান্য। পুরুষ নিজের পুরুষকারকে তুলিযা ধরিতে চাহে নারীর বাসনাকে প্রাণপণে পূরণ করিয়া, তাই নারী যখন সোনার স্বপ্ন দেখে, পুরুষ তখন সোনার খাদে যাইয়া নামে—যন্ত্রদানবের হাতে ধরা দেয়। অতএব পুরুষের দাসত্বের মূলে নারীর স্বপ্নের প্রেরণা কম কাজ করে না। (বিশুর কথা—'তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দ্দারের চাবুকের চেযেও কড়া')।

এইবার, আমরা রবীন্দ্রনাথের, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশযের এবং অজিতবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে সামান্যভাবে দুই একটি কথা বলিতে চেষ্টা করি—

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নাটকখানির সামাজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নহে—দিগ্‌দর্শন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ নারী-মাহাত্ম্যের দৃষ্টিকোণ হইতে তত্ত্বটিকে দেখিতে যাইয়া, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের বর্ণিত বিষযের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিযা মনে হয় না "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্ত্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে"—নাটক-বর্ণিত বিষয়ের সহিত এই উক্তির পূর্ণসঙ্গতি পাওয়া যায় না। তারপর নারী যে যক্ষপুরীতে মোটেই ছিল না এমন নহে, চন্দ্রা ছিল, সর্দ্দারণীরাও নেপথ্যে ছিলেন,—অতএব 'এমন সময়ে সেখানে নারী এল'···নন্দিনী এল···কথাটি সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না।

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের ভাব-বিশ্লেষণে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিন্যাস পাওয়া যায় না। ডাঃ রায়ের মধ্যে প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপর্য্যকে অনুধাবন করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। রাজার ভাবান্তর, সর্দ্দারের সহিত রাজার দ্বন্দ্ব, রাজাকে দেখিয়া নন্দিনী "কেন মুগ্ধ" হয়—এই সব বিশেষ বিশেষ স্থলের ব্যাখ্যা ডাঃ রায়ের বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া যায় না। বন্ধুবর অজিতবাবুর বিশ্লেষণ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। অজিতবাবু রাজাকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নাটকখানির ব্যঞ্জনা-বর্ণালীর সমগ্র প্রকাশ অজিতবাবুর বিশ্লেষণে দেখা যায় না।

রক্তকরবীর 'নাটকত্ব'

নাটকখানির রস-নিরূপণ-কালে ইহার রসাত্মকতার পরিমাণ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে যেমন ঘটনাসংস্থানের আকস্মিকতা-জনিত চমৎকারিত্ব, এবং কাহিনী-কৌতূহল নাই, তেমনি ইহাতে আবেগ-অনুভাবাদিও সংলক্ষ্য হইয়া উঠে নাই। রাজা ছাড়া, অন্য কোন চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশেষ অস্তিত্ব দেখা যায় না। মোটকথা, অনুভাব অপেক্ষা ভাবই প্রধান হইয়া আছে। ভাবকে উপস্থাপিত করা বিশেষ লক্ষ্য হওয়ায়, অনুভাবের অভিব্যক্তি এবং একতানতা উপেক্ষিত হইয়াছে। এই কারণেই যাহাকে ঠিক রসনিষ্পত্তি বলে, তাহা এ নাটকে ঘটিতে পারে নাই।

তারপর,—নাট্যকারের প্রকাশ-ভঙ্গীও খুব অলঙ্কৃত এবং এত অলঙ্কার-বহুল যে সাধারণ দর্শকের কান-মন দুইই ধাঁধিয়া যায়।

প্রত্যেকটি চরিত্রই—যেহেতু অলৌকিক—ভাষায় প্রায় একরকমই অলঙ্কার প্রয়োগে—খাঁটি রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য রূপকনাটকে এই আচরণে কোন দোষ স্পর্শ করে কিনা সব সময়েই সে প্রশ্ন করা চলে। কারণ রূপক নাটকে ঘটনা-বিন্যাসের, এবং বাক্য বিন্যাসের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন অবান্তর—ইহাতে

কেবলমাত্র ভাব-বিন্যাসেরই ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিধেয়। এই ভাব-বিন্যাসের দিক দিয়া নাটকখানি যে একেবারে নিখুঁত সে কথা বলা চলে না। নাটকখানিতে একটি ভাব অপেক্ষা একাধিক ভাবের সমাবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যায়। প্রথমতঃ, রাজার ভিতরকার মানুষটির উদ্ধার এবং রঞ্জনের সঙ্গে মিলন এই দুই উদ্দেশ্যে নন্দিনীর চেষ্টা বিভক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রাজার ভাবান্তরটি না হইয়াছে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দ্বন্দ্বময়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া অবশ্যভাবী, কিংবা রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া সুসঙ্গত। রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া সঙ্গতি রাখিতে হইলে, শোষিতদের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বারাই রাজার মধ্যে ভাবান্তর ঘটানো উচিত ছিল। এখানে রাজার ভাবান্তর বিদ্রোহীরা ঘটায় নাই, রাজার আনন্দ-সত্তাই রাজাকে ধ্বজা ভাঙিতে প্রেরণা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মার দাবীকেই পরিবর্ত্তনের কারণরূপে প্রাধান্য দিয়াছেন—বিদ্রোহকে নহে। রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যঞ্জনা এখানে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে—পরিস্ফুট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অন্যভাবে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সহিত সামাজিক ব্যঞ্জনার নির্ব্বিরোধ সমন্বয় ঘটিতে পারে নাই।

চরিত্র পরিচয়

(১) **রাজা**—আনন্দবিমুখ প্রাণের-সাধনা আনন্দের যোগ হারাইয়া অশিব শক্তিতে পরিণত। বিশ্বের আনন্দকে হনন করিয়া, শক্তিরূপে নিজের অহংকারের ভোগ্য করিয়া তুলিবার অবিরাম চেষ্টায় ইনি নিযুক্ত। কিন্তু আনন্দের সহজ আকর্ষণের টানে ইঁহার অন্তরাত্মা উন্মনা না হয় এমন নহে। তাই ইনি ভিতরে ভিতরে বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত—বড় অশান্ত ও দীন। রাজা তাই আনন্দ-যোগহীন শক্তির এবং আনন্দ-তৃষ্ণার দ্বন্দ্বক্ষেত্র। শেষ পর্য্যন্ত আনন্দই তাহার মধ্যে জয়ী হয়।

অন্য দৃষ্টিতে, রাজা ধনতান্ত্রিক পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজশক্তি—যন্ত্রের দুই বাহু দ্বারা ইনি সংগ্রহ করেন, আকর্ষণ করেন—শোষণ করেন। ইহার সংলক্ষ্য এবং অসংলক্ষ্য শোষণে মানুষ অমানুষে পরিণত,—মজ্জামাংস মনপ্রাণ সব নিঃশেষিত—সেইদিক দিয়া তাঁহার রাজা যেমন যক্ষপুরী, তেমনি প্রেতপুরীও। শুধু ভয়ের পূজা পাইলেই এই রাজা সন্তুষ্ট; কারণ ইনি 'জুজুর পুতুল' হইয়া থাকিতেই ভালবাসেন—অন্ততঃ সর্দ্দারগণ ইহাই চাহেন, যেহেতু, সর্দ্দারগণই রাজার শাসনযন্ত্র—রাজার ব্যক্তশক্তি। কিন্তু ধনতন্ত্রের রাজশক্তি নিজের মধ্যেই 'প্রতি-স্থিতি' (antithesis) সৃষ্টি করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত শোষিতদের হস্তেই নিজেকে ধরা দেয়—শোষিতদের হাতে যায়। কায়েমী স্বার্থের সহিত—তথাকথিত রাজশক্তির সহিত—তখন গণরাজার নিজেরই সংঘর্ষ বাধে। এই রাজায় ধনতন্ত্রের স্থিতি-প্রতিস্থিতি এবং নতুন সংস্থিতিও প্রতিফলিত।

(২) সর্দ্দার—আনন্দশূন্য প্রাণশক্তির নির্দ্দয় ও নির্ব্বিকার অভিব্যক্তি বা ব্যক্তরূপ। আনন্দসত্তা ইহার মধ্যে একেবারেই নির্জ্জীব আছে কি নাই বুঝা যায় না। কদাচিৎ কোন নিশীথ অন্ধকারের নির্জ্জন মুহূর্ত্তে এই সত্তাটি সামান্য একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই অসাড় হইয়া যায়। যে জীবাত্মা বিষয়কর্ম্মে প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে যাইয়া, আনন্দ-সত্তাকে একেবারেই কোনঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে, সর্দ্দার তাহারই প্রতীক।

অন্যদিকে, সর্দ্দার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র, 'সরকার'—শোষণ ও শাসনের উদগ্র সাধনায় সে নির্ব্বিকার নির্ম্মম—প্রাণের স্ফূর্ত্তি সে দেখিতে পারে না—কোন প্রতিরোধ সে সহিতে পারে না, মানুষের মজ্জা-মাংস-মন-প্রাণকে ক্ষীণ না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। প্রাণশক্তিকে শাসন করিতে যাইয়া সে নিজেকেই নিষ্প্রাণ করিয়া তুলিয়াছে। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—ছলবল, কৌশল, যখন যে নীতি আবশ্যক, অকুণ্ঠভাবে সে প্রয়োগ করে।

মানুষকে অমানুষ করিতে যাইয়া নিজেই সে অমানুষ। শোষণ-শাসনকে অব্যাহত রাখিতে সে মরিয়া।

(৩) **মোড়ল**—"এক সময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদ-বৃদ্ধি উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দ্দারদের ছাড়িয়ে যায়"। এই মোড়লরা একদা শোষিত ও শাসিত শ্রমিক, অধুনা শোষণ- শাসনের মোড়লি করেন—শ্রমিক-স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থকে এক মনে করেন না।—'অফিসার'-গ্রেডে উন্নীত হওয়ায় বেশ কিছু উপায় করেন, তাই ইহাদের নতুন শ্রেণী-চেতনা—ইহারা না-শ্রমিক না-মালিক।

(৪) **গোঁসাই**—(বস্তু-সংক্ষেপ দ্রষ্টব্য)।

(৫) **বিশুপাগল**—বিশু মুক্তিপ্রবণ আনন্দপ্রবণ প্রাণ, আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। বিশুর ইতিহাস একটু বিচিত্র। বিশু একদিন আনন্দ-ভূমিতেই বিচরণ করিত; সেদিন সে ছিল মুক্ত, প্রাণ-চঞ্চল। কিন্তু তাহার মধ্যে কেন যেন ভাবান্তর ঘটিল। সহজ যোগের আনন্দে মন উঠে নাই, তাই সে নন্দিনীর দিকে কী একভাবে চাহিয়া অচেনার অভিমুখে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু একটি নারীর আকর্ষণে পড়িয়া সে ঘুরিয়া ফিরিয়া যক্ষপুরে আসিযা আবদ্ধ হইয়া আছে। বিশু মুক্ত-স্বভাব বলিয়া যক্ষপুরে সে বেখাপ্পা। অনুচর, গুপ্তচর—কোন চর রূপেই সে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই।

সীতা

সীতা নাটকের উপাদান এবং তার প্রয়োজন।

(এক নদীতে কেউ যেমন দু'বার স্নান করতে পারে না, তেমনি একের পক্ষেও এক নদীতে একবারের বেশী স্নান করতে নামা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্তে নদী যেমন ভিন্ন নদীতে পরিণত হচ্ছে, তেমনি প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তির মধ্যেও রূপান্তর ঘটছে—ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে। যুগের পরিবর্তন যুগ-মানসের তথা ব্যক্তি-মানসের পরিবর্তন হাত ধরাধরি ক'রে এগিয়ে চলেছে। কোন দুটো ভিন্ন যুগের বা একই যুগের দু'টি ব্যক্তির মানসিক গঠন একরূপ নয়। সেখানেও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন চলেছে।) অযোধ্যার রাজা দশরথের পরিবারে, রামের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল, তা হয়ত অনেকের মনেই অনেক ভাব ও ভাবনা জাগিয়েছিল এবং অনেকে চারণ কবিরই বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মহাকবি বাল্মীকির কবিমানসের ভাব কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রামকাহিনী যে রসরূপ লাভ করেছিল, তা' একান্তভাবে ছিল বাল্মীকিরই সৃষ্টি। লৌকিক রামের জন্মভূমি অযোধ্যা বটে, কিন্তু রামায়ণের অর্থাৎ অলৌকিক রামের জন্মভূমি—বাল্মীকিরই মনোভূমি। এই মনোভূমি-বাল্মীকিরই জাতি-যুগ-মুহূর্তের জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সংস্কার দিয়ে গঠিত। (যুগের জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বাল্মীকি যে পরিমাণে স্বীকরণ ও সমীকরণ করতে পেরেছিলেন—সেই পরিমাণেই তাঁর মানস বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। রামায়ণ বাল্মীকির ঐ পরিবর্তমান অথচ বিশিষ্ট মানসেরই রচনা। রামায়ণের চরিত্র পরিকল্পনায়, কল্পনায়, চরিত্রের আচার আচরণে এই বিশিষ্ট যুগ-মনের ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রয়েছে।

কিন্তু যেমন যুগপ্রবৃত্তির ঐক্য থাকলেও, বাল্মীকির যুগেরই আর কোন কবির পক্ষে এই রামায়ণ রচনা করা সম্ভব ছিল না, তেমনি যুগের পরিবর্তনের ফলেই তথা যুগ প্রবৃত্তির এবং কবি মানসের পরিবর্তনের ফলেই, রামকাহিনীর পরিকল্পনা ও বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছে। ভিন্ন যুগে ভিন্ন কবি-মানস, এবং ভিন্ন তাঁর বাসনা ও রূপ কল্পনা—এ নিয়ম অমোঘ। বাল্মীকির পরবর্তী যুগে রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন ক'রে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের পরিকল্পনা ও কল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করলেই সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। দেখা যায়, কবিরা প্রবৃত্তি অনুসারে কাহিনীর কোন অংশ বা ঘটনা বর্জন করেছেন, এবং কোন অংশ অন্যভাবে উপস্থাপনা বা কল্পনা করেছেন। এই স্বাধীনতা কবিরা নিজেরাই নিয়েছেন এবং সাহিত্যশাস্ত্রকারগণও এই স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সূত্র বেঁধে দিয়েছেন :—

যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ॥

(সাহিত্য দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে। "উদাত্তরাঘব নাটকে বালীবধ আদৌ দেখানো হয়নি এবং 'বীরচরিত' নাটকে বালীবধ অন্যভাবে কল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ দেখানো হয়েছে বালীই রামকে বধ করতে এসে রামের হাতে নিহত হয়েছে। এই অন্যথাপরিকল্পনার স্বাধীনতা কবিরা কতখানি ভোগ করতে পারবেন, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকাররা বিশেষ কিছু না বলায়, আমরা দেখতে পাই—'নিরঙ্কুশা হি কবয়:' প্রবচনের সুযোগ প্রত্যেক যুগের কবিরাই নিয়ে' আসছেন। শুধু ঘটনার অন্যথাকল্পনা করেই কবিরা ক্ষান্ত থাকেন নি; চরিত্রের এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অন্যথাকল্পনা করতেও তাঁদের বাধেনি। কেন এমন হয় তার ব্যাখ্যা আগেই দিয়েছি অর্থাৎ যুগপ্রবৃত্তি এবং কবিমানসের জ্ঞান

অনুভব-ইচ্ছার প্রকৃতিই যে এর মূল কারণ, এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখতে বলেছি। বাংলায় ঐতিহাসিক সমালোচনা পদ্ধতির প্রবর্তক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, ভবভূতির "উত্তর চরিত" সমালোচনা প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে আমার বক্তব্য আমি সমর্থন করতে চেষ্টা করতে পারি—"উত্তর চরিতের উপাখ্যান ভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোল কল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তর চরিত্রে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তর চরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।.........অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রযোগ নিষিদ্ধ বলিয়া ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।......উত্তর চরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত।...চিত্রদর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।......ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জন করেন।...বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল-প্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। .. তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য্য রাজগণ বীর স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্য-পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়রা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা তাহাদের চরিত্র কোমল প্রকৃতি

হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়।" যুগের প্রভাবে রামচরিত্র পরিকল্পনা, চরিত্রের গঠন কেমন ভিন্ন হয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণ এবং উত্তরচরিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তার সবটাই উদ্ধৃতিযোগ্য বলে, উদ্ধৃত করার লোভ সামলে নিয়ে, কৌতূহলী পাঠককে প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য এতে শুধু এই কথাটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কবিমানস যুগের প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে উঠে।

বাল্মীকির পরবর্তী বিভিন্ন রাম-চরিত্রের এবং সীতাচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার পূর্বে, বাল্মীকির যুগ এবং তাঁর রামচরিত্র ও সীতাচরিত্র সম্বন্ধে সামান্যভাবে একটু আলোচনা ক'রে নেওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—রামায়ণের রামচরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী, রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ এবং আর্য্যজাতি তখন বীরজাতি ছিল। বাল্মীকির যুগ প্রাচীন যুগ, নিঃসন্দেহ; রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিচয়টুকু যুগের অতিবাহ্য পরিচয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বললে বলা যায়—বাল্মীকির যুগ কৃষিভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক এবং মুনি-ঋষি-পুরোহিত শাসিত। সেই সমাজে গোষ্ঠী চেতনার প্রবল প্রাধান্য। ব্যক্তি সেখানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে সমাজ-বিধানের অধীন, সমাজ নিয়মের বাইরে, ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ব'লে কোন কিছু নেই। সেখানে ব্যক্তি-সত্তা সামাজিক-সত্তার সম্পূর্ণ অধীন।

বাল্মীকির রাম সেই যুগের প্রবৃত্তি দিয়ে গঠিত। তিনি শুধু বীরস্বভাব সম্পন্নই নন। তাঁর মধ্যে সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা রাজ-সত্তারই প্রাধান্য। তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা—অর্থাৎ দাম্পত্যজীবনের সুখসম্ভোগ

অপেক্ষা, বংশের স্বার্থ, জনপদের স্বার্থ অনেক বড়। রামের অন্তরাত্মা সীতাকে শুদ্ধা বলে জানলেও, রাজা-রাম পৌরাপবাদ এবং জনপদের অপবাদ উপেক্ষা করতে পারেন নি। যে অকীর্তির ভয়ে রাম সীতাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তারই অপর নাম সমাজের নিন্দা। যে কাজ সমাজ প্রশংসিত নয় তারই নাম অকীর্তি, আর যে কাজ সমাজ প্রশংসিত তারই নাম কীর্তি। মহাত্মারা এই কীর্তিই কামনা করেন, জীবন দিয়েও কীর্তি রক্ষা করেন। বাল্মীকির রামের জীবনে সীতাহারা হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছুই ছিল না, সত্য, কিন্তু কীর্তিহীন হওয়ার অপমৃত্যুর তুলনায় সে দুঃখও বরণীয় ছিল। যে দুঃখ সম্বন্ধে রাম বলেছিলেন—"নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ দুঃখমতোধিকং"—সেই দুঃখের ভরা পানপাত্র রাম নিঃশেষে পান করেছিলেন, তবু কীর্তিভ্রষ্ট হননি অর্থাৎ সমাজ-সত্তাকে একটুও সঙ্কুচিত করেন নি।

এই নির্বিচার সমাজানুগত্য ছিল বলেই, রাম ব্রাহ্মণ বালকের অকাল মৃত্যুর দায়িত্ব—ব্রাহ্মণের অভিযোগ—"রাজার দোষেই প্রজারা বিপদগ্রস্ত হয়, রাজা অধর্মচারী হ'লে প্রজা মরে। অথবা নগর ও গ্রামের লোকে দুষ্কার্য করছে রাজা তাদের শাসন করেন না, তারই এই ফল। রাজার দোষেই এই বালকের মৃত্যু হয়েছে"—মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন এবং অকালমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নারদ যে যুক্তি দিয়েছিলেন সেই যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে, তাঁরই নির্দেশে নির্বিকার চিত্তে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শিরচ্ছেদ করেছিলেন। রাজা-রাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য জাতির তপস্যার অধিকার সুরক্ষিত রাখবার জন্য, উচ্চবর্ণের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যই, শম্বুককে বধ করেছিলেন। সমাজ ধর্মের বাহির্ভূত ধর্মাধর্মের অন্য কোন আদর্শ খুঁজতে রাম যান নি।

এই আনুগত্য বাল্মীকির রামের জীবনে কখনই শিথিল হয়নি। অশ্বমেধ-যজ্ঞে সমাগত মুনিগণ এবং অতিথিগণের সঙ্গে লবকুশ-গীত রামায়ণ গান

শোনার পর রামের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল—কুশলব সীতারই পুত্র। তখন তিনি বাল্মীকির কাছে দূত পাঠিয়ে নিবেদন করলেন—"সীতা যদি শুদ্ধাচারিণী পাপহীন হন, তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন। কাল প্রভাতে এই যজ্ঞপরিষদে আমার ও সকলের সমক্ষে সীতা শপথ গ্রহণ করুন।" বাল্মীকি সম্মত হ'লে রাম সভাস্থ ঋষি ও নৃপতিদের বললেন—"কাল প্রভাতে আপনারা সকলে সীতার শপথ শুনবেন এবং অন্য পরীক্ষা যা আবশ্যক হয় তাও প্রত্যক্ষ করবেন।" আমরা দেখি, এই পরীক্ষাসভায়, বশিষ্ট বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, পুলস্ত্য, মার্কণ্ডের, ভরদ্বাজ, নারদ, গৌতম প্রভৃতি ঋষি মহাবল রাক্ষস ও বানরগণ, বহুসহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য কৌতূহলী হযে সমবেত হযেছিলেন। এই পরীক্ষার সমাজনৈতিক তাৎপর্য লক্ষণীয়। সীতাগ্রহণের পথে লোকাপবাদ ছাড়া আর কোন বাধাই ছিল না। কারণ, রাম নিজে সীতাকে শুদ্ধা অপাপা বলেই জানতেন এবং সীতার প্রতি তাঁর যে প্রেম তাতেও কোন বৈগুণ্য দেখা দেযনি। কাঞ্চনী প্রতিমাই তার বড় প্রমাণ। রাম প্রেমে একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই সীতাত্যাগের দুঃখ এত মর্মান্তিক এবং সেই দুঃখ যত মর্মান্তিক, তত বড়ই প্রজানুরঞ্জক রাজা-রামের মহিমা। সীতাগ্রহণ সমস্যার সমাধান ছিল সীতাত্যাগের কারণের মধ্যেই—অর্থাৎ লোকের—প্রজাসাধারণের মতবাদ বা মনেকরার মধ্যে। প্রজাসাধারণ যতক্ষণ সীতাকে অপাপা ব'লে মনে না করছে, ততক্ষণ রাজা-রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন কি ক'রে? যখন—ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদবিদ্যার ন্যায়, বাল্মীকির পশ্চাতে সীতাকে আসতে দেখে সভায় মহান সাধুবাদ উত্থিত হল, বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে শোকে আকুলিত হয়ে তুমুল কোলাহল ক'রে উঠলেন, এবং যখন মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি প্রচেতার দশম পুত্র কখনও মিথ্যা বলেছি এমন স্মরণ হয় না। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছি,

মৈথিলী যদি দোষযুক্তা হন তবে সেই তপস্যার ফল যেন আমি ভোগ না করি। আমি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা জেনেই বনপ্রদেশে তাঁকে গ্রহণ করেছিলাম", তখনই রাম বলেছিলেন—"জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাব মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক।"—অর্থাৎ সকলের বিশ্বাস হোক যে সীতা শুদ্ধস্বভাবা, সকলের সম্মতিক্রমেই আমি সীতাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করতে চাই।" বাল্মীকির রামের মধ্যে সমাজ-আনুগত্য প্রবল বলেই যেমন লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন, তেমনি সকলের সম্মতি নিয়েই তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

এই সামাজিক-সত্তার প্রাধান্যের অন্যতম ফল রাম চরিত্রের দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্য। সীতা ত্যাগের চেয়ে বড় আঘাত—মর্মান্তিক দুঃখ রামের জীবনে আর কিছুই কল্পনা করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু যেহেতু রাম শুধু পত্নী-সর্বস্ব পুরুষ মাত্র নন, রাম সামাজিক সম্পর্কে বহুজনের সঙ্গে বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত—রামের ব্যক্তিত্বে রাজা-রামের অভিমান এবং বংশাভিমান, এক কথায় সামাজিক সত্তার প্রাধান্য প্রবল, রাম পত্নী ত্যাগের শোকে শোকার্ত হওয়া সত্ত্বেও গাম্ভীর্য হারান নি। মনের স্বাভাবিক বিক্রিয়া তিনি নিরোধ করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সঙ্কল্পে অর্থাৎ সীতা নির্বাসনে তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন ব'লে শোকের সঙ্গে গাম্ভীর্যের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল তাতে রাম চরিত্রের দৃঢ়তা অদ্ভুতরূপে প্রকটিত হয়েছিল। দু'তিনটি অনুভাবের সাহায্যে বাল্মীকি রামের শোকার্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি এমনভাবে অঙ্কিত করেছেন যার তুলনা খুব কমই মেলে। বয়স্যদের মুখে পৌরাপবাদের কথা শুনে রাম বুদ্ধি স্থির ক'রে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে—দেখলেন— ······মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।

সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতং

বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে.........

হৃতশোভং যথা পদ্মং......... ।

তাঁদের দেখে রাম "অশ্রূণ্যবর্তযৎ" এবং ধীর গাম্ভীর্যে সীতানির্বাসনের সঙ্কল্প জানালেন। এই ধীরোদাত্ত চরিত্র বাল্মীকিযুগেরই উপযোগী চরিত্র এবং বাল্মীকি-মানসেরই উপযুক্ত সৃষ্টি।

কোথায় রামায়ণের যুগ আর কোথায় 'উত্তররামচরিতে'র যুগ। দুই যুগের মধ্যে বিরাট কালের ব্যবধান—তেমনি বিরাট এক সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস—জাতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস। সমাজ যত শিল্পকেন্দ্রিকতার দিকে এগিয়েছে, তত ব্যক্তির শ্রেণী-চেতনা এবং অধিকারবোধ তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সামাজিক-সত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিগত-সত্তা সম্পর্কে ব্যক্তি অধিকতর সচেতন হয়েছে। সমগ্র সমাজের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে, জীবনের সার্থকতা খোঁজার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত ব্যক্তিস্বার্থের এবং ভোগসম্ভোগের প্রাধান্য ঘটেছে এবং ব্যক্তিসত্তার লাভ ক্ষতি নিয়ে আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় দেখা দিয়েছে। সামাজিক সত্তার অভিমান যত দুর্বল হয়েছে, ব্যক্তি-সত্তার ক্ষয়ক্ষতির কান্না তত প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। ভবভূতির রাম এই কারণেই অত বেশী কেঁদেছেন। তাঁর কান্না সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা' উল্লেখযোগ্য।—

"ইহা আর্য্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া আধুনিক কোন বাঙালীবাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই, তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে

বিদেশে চাকুরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।" অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ভবভূতির রামচরিত্রের এই দুর্বলতা এবং অধীরতা এবং প্রেমোন্মত্ততায় ভবভূতির নিজের মানসিক প্রকৃতিই অভিব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমের সমসাময়িক 'আধুনিক লেখক' যে 'আরও কিছু বাড়াবাড়ি' করেছেন তা'তেও তদানীন্তন বাঙালী চরিত্রেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। রামায়ণের কাল থেকে ভবভূতির যুগের দূরত্ব, বাল্মীকির এবং ভবভূতির কবি-মানসকে যেমন পৃথক করে দিয়েছে, তেমনি ভবভূতির যুগ থেকে বাঙালী 'আধুনিক লেখকে'র কালের দূরত্বও—উভয় কবির মানস-প্রকৃতিতে পার্থক্য এনে দিয়েছে। তারই ফলে ঐ "আজো কিছু বাড়াবাড়ি" ঘটেছে। তবে ভবভূতি বা ঐ 'আধুনিক লেখক' আর যাই করুন, কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড় বলে ঘোষণা করেন নি। কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হযে তাঁদের রাম অনুচিত কান্না কেঁদেছেন বটে, কিন্তু কখনও প্রেমকে নিরপেক্ষ মর্যাদা দিয়ে কর্তব্যের ওপরে প্রেমের স্থান নির্দেশ করতে সাহস করেননি। করেন নি এই কারণেই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনার মাত্রা তখনও উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকে যে মাত্রায় পৌঁছেছিল সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সমাজনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেওয়ার সাধারণ মনোবৃত্তি, স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিশেষ একটি পর্যায়েই সম্ভব। এই বিশেষ অবস্থাটি, শিল্পযুগের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থারই তথা সমাজ ব্যবস্থারই স্বাভাবিক পরিণতি। এই সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির সমাজ-সত্তা স্বাভাবিকভাবেই সঙ্কুচিত হয়। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সত্তার গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তি আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে আসে; কারণ শিল্পকেন্দ্রের বা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় ক'রে জীবিকা অর্জন করার মধ্যেই এবং পরিবারে ভরণপোষণ করার মধ্যেই তাকে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, এই কারণে এবং জ্ঞান

বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিকে বৃদ্ধি পায় আত্মস্বার্থবোধ, অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ। আত্মমর্যাদাবোধ শুধু যে পুরুষশ্রেণীর মধ্যেই বৃদ্ধি পায় তা' নয়, নারীদেরও সামাজিক মর্যাদা বাড়তে থাকে। ভোগ-সম্ভোগে এবং আত্মবিকাশের অধিকারে, নারীরাও পুরুষের সঙ্গে সমান-অধিকারী এ কথা মেনে নেওয়া হয়। জীবনকে সর্বতোভাবে ভোগ করবার অধিকার—পুরুষার্থসিদ্ধির সুযোগ সুবন্দোবস্ত—প্রত্যেক ব্যক্তিরই ন্যায্য পাওনা। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনারই স্বাভাবিক পরিণতি—ব্যক্তিজীবনের সুখসম্ভোগকেই জীবনের পরম চরিতার্থতা বলে মনে করা—সামাজিক বিধিবিধাননিরপেক্ষ ব্যক্তি-সত্তা বা ব্যক্তি-অধিকারের কল্পনা করা।

'সীতা' নাটকখানি এই যুগেরই সৃষ্টি।

এই যুগের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কবি-মানসের সংস্কারের সংস্পর্শে উত্তরকাণ্ডের রামায়ণ কাহিনী যুগোপযোগী মূর্তি ধারণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাটকের দেহখানি পৌরাণিক বটে, কিন্তু অন্তরাত্মা আধুনিক। বাল্মীকির রামে যেখানে সমাজসত্তা প্রবল—প্রেমের চেয়েও কর্তব্য বড়, দ্বিজেন্দ্রলালের রামে সেখানে ব্যক্তি-সত্তা প্রবল; তাঁর কাছে—কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড। বাল্মীকির 'Theme' বা "premise" যেখানে 'ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমাজধর্ম বড়,' দ্বিজেন্দ্রলালের "Premise" সেখানে কর্তব্যের চেযে অর্থাৎ সমাজধর্মের চেয়ে 'প্রেম' অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগ, ব্যক্তি-বাসনার পরিপূরণ বড। সীতা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রাম-সীতার ট্র্যাজেডি-পরিণতির ভিতর দিযে ঐ মূল ভাবটিই (root-idea) প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। এই মূল ভাবের অনুবর্তী এবং পরিপোষক করেই নাট্যকার রামায়ণ-বর্ণিত কাহিনীকে নতুনভাবে সংযোজনা করেছেন—নতুন যুগের প্রবৃত্তি দিয়ে চরিত্র এবং ঘটনার কল্পনা করেছেন। কোথায় এবং

কি ভাবে নাট্যকার এই অন্যথাকল্পনার স্বাধীনতা নিয়েছেন, নাটকের ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্র যোজনা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে।

(ক) **বাল্মীকি রামায়ণে সীতা নির্বাসনের ঘটনাটি** এইভাবে বর্ণিত আছে :—(রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ থেকে সংগৃহীত।) রাজ্যলাভের পর রাম ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। রাম পূর্বাহ্নে ধর্মকার্য করে দিবসের শেষভাগ অন্তঃপুরেযাপন করিতেন। সীতাও প্রাতঃকালে দেবসেবাদি করে অপক্ষপাতে শ্বশ্রূগণের সেবা করতেন, তারপর বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত হয়ে রামের কাছে যেতেন।

কিছুকাল পরে রাম সীতাকে বললেন—বৈদেহী, তোমার অপত্যলাভ হবে তার লক্ষণ দেখছি। এখন তুমি কি ইচ্ছা কর বল। সীতা স্মিতমুখে বললেন, রাঘব, আমি পুণ্য তপোবন সকল দেখতে ইচ্ছা করি, গঙ্গাতীরে যে ঋষিগণ আছেন তাঁদের তপোবনে অন্তত একরাত্রি বাস করতে চাই। রাম উত্তর দিলেন, বৈদেহী নিশ্চিন্ত হও, কালই তুমি সেখানে যাবে। এই বলে তিনি সুহৃদগণের সঙ্গে প্রাসাদের মধ্যকক্ষায় গেলেন।

এই মধ্যকক্ষাতেই রাম, বিজয়, মধুমত্ত, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচক্ষণ বয়স্যদের মুখে সীতার অপবাদের কথা শুনলেন। প্রসঙ্গক্রমে রাম জিজ্ঞাসা করলেন—ভদ্র, নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা আমার সম্বন্ধে কি কথা বলে? সীতা, আমার ভ্রাতৃগণ বা মাতা কৈকেয়ীকে উদ্দেশ করে কোনও জল্পনা হয় কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভদ্র অনেক প্রশংসা করার পরে—লোকাপবাদটুকু শোনালেন—"সীতার সম্ভোগজনিত সুখ রামের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল! পূর্বে রাবণ যাঁকে সবলে ক্রোড়ে তুলে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে অশোকবনে রেখেছিল, যিনি রাক্ষসের বশে ছিলেন সেই সীতাকে রাম কেন ঘৃণা করেন না? যদি আমাদের পত্নীদের এই দশা হয় তবে আমাদেরও সয়ে থাকতে হবে, কারণ রাজা যা' করেন প্রজা তারই অনুকরণ করে।" সকল বয়স্যই

যখন ভদ্রের কথা সমর্থন করল তখন রাম কথা না ব'লেই তাদের বিদায় দিলেন এবং অনেক ভেবে সঙ্কল্প স্থির করলেন এবং লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকে ডেকে পাঠিয়ে সঙ্কল্প জানালেন। লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন—তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রের রথে সীতাকে অন্য দেশে বিসর্জন দিয়ে এস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রম আছে, সেখানে কোন নির্জন স্থানে সীতাকে রেখে এস। তুমি প্রতিবাদ ক'রো না, এ বিষয়ে বিচার করবার কিছু নেই। আমার আজ্ঞা পালন কর। যদি বাধা দাও তবে আমি অত্যন্ত অপ্রীত হব।...যারা আমাকে নিবৃত্ত করার জন্য অনুরোধ করবে তারা আমার শত্রু। সীতা পূর্বেই আমাকে বলেছেন তিনি গঙ্গাতীরের আশ্রম দেখতে চান, তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর।' রজনী প্রভাত হ'লে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে তপোবন অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রামের আদেশ নিবেদন করলেন। লক্ষ্মণের দারুণ বাক্য শুনে সীতা শোকাভিভূত হয়ে ভূপতিত হ'লেন এবং অনেক বিলাপ করলেন। মুনিকুমারদের মুখে সংবাদ পেয়ে বাল্মীকি এসে সীতাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

রামায়ণের এই বনবাসকাহিনী আমাদের নাট্যকার অনুসরণ করেন নি। না করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ ভূমিকায় জানিয়েছেন—"মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয়, যে রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশমর্যাদারক্ষার জন্য সীতার বনবাস দিয়েছিলেন। তার উপরে, লক্ষ্মণের প্রতি, তপোবন দর্শন ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায় একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এ দু'টির একটি স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস-আখ্যান ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায়, আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।" নাট্যকার শুদ্ধ বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য সীতার

'বনবাস' এবং সীতার সঙ্গে রামের "নিষ্ঠুর ছলনা" পছন্দ করেননি বলেই ভবভূতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ অন্যথাকল্পনার স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রথমতঃ সীতার প্রতি পূর্ণপ্রেম থাকা সত্ত্বেও অপাপা জেনেও শুধু প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসর্জন দেওয়ায় রামের চরিত্র হীন হয়েছে কি না—এ যেমন এক বিচার্য বিষয়, তেমনি সীতার স্বেচ্ছা-নির্বাসন রামচরিত্রকে মহৎ করে কি না—রামের রাজ-সত্তা তাতে অকলঙ্কিত থাকে কি না, অন্যতম বিচার্য বিষয় বটে। তারপর, সীতার তপোবন দর্শন-আকাঙ্ক্ষার সুযোগ আপাত 'নিষ্ঠুর ছলনা' ব'লে মনে হ'লেও, এই ছলনায় সীতার প্রতি রামের প্রেমের ঐকান্তিকতাই ব্যক্ত হয় কি না সে কথাও বিচার ক'রে দেখা দরকার। সীতার বনবাস রামের কাছে কতখানি অসহ্য রামের কাছে সীতা কতখানি—এই 'নিষ্ঠুর ছলনা'র মধ্যেই তা' ব্যক্ত হয়নি কি?—এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। যাই হোক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল—সীতা বনবাসের দায় থেকে রামকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে রাম লোকাপবাদের কথা বয়স্যদের মুখ থেকে শোনেননি, শুনেছেন দূতের মুখ থেকে এবং শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্মুখকে "পথের কুক্কুর" ব'লে ভৎ'সনা করেছেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন—"যাহা বলে প্রজা অযোধ্যার সীতা চির গৃহলক্ষ্মী রহিবে আমার"। উন্মত্তের মতোই শেষ সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন—

"…রাজ্য মিলাইয়া যাক স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্চর্যের মত ; চূর্ণ হোক পদতলে
এ প্রাসাদ, ভেসে যাক, সরযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্য্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হয়ে যাক!……
……তবু হৃদয়ে আসীন
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন।

এই বক্ষে ভস্মীভূত বিশ্বচরাচরে
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে ॥"

এই উক্তি ব্যক্তিগত অর্থাৎ জৈবিক আবেগের ঐকান্তিক প্রকাশের পরাকাষ্ঠা। এ হেন রোমান্টিক প্রেমেরই আবেগের কাছে—'সমাজ-সংসার মিছে সব' বলে মনে হয়। রামের বাসনা এখানে সমাজ-কোটি থেকে একেবারেই সরে এসে ব্যক্তিকোটির কেন্দ্র-বিন্দুতে দাঁড়িয়েছে।

রামের এই প্রতিক্রিয়া প্রেমসর্বস্ব জীবনের, সর্বত্যাগী প্রেমপরায়ণতার অভিব্যক্তির নিদর্শন হিসাবে অপূর্ব এবং অতুলনীয় বটে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই প্রতিক্রিয়ায় প্রেমের এমন এক সমাজ-নিরপেক্ষ অতিব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে—যা' সামাজিক ব্যক্তির জীবনে অবাধভাবে আচরিত হওয়া সম্ভব নয়। এ কথা সত্য, জীবন থেকে স্নেহ-প্রেম-করুণা অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তি শুকিয়ে গেলে—স্বাভাবিক বাসনা-কামনা অবদমিত বা নিরুদ্ধ হলে, শত কর্তব্য পালন ক'রে সুকীর্তি অর্জন করা সত্ত্বেও, জীবনে ভারসাম্য থাকে না, জীবন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে। তেমনি সত্য এ কথাটিও যে জীবনের আবেগ শুধু প্রজনন বা প্রেমের বৃত্তের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় না, বা একটি ক্ষেত্রে কর্তব্য পালন করলেই, বহু-সত্তাসম্পন্ন সামাজিক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারে না। মানুষের পক্ষে সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নয় বলেই—ব্যক্তি-সত্তা এবং সমাজসত্তা এই দুই সত্তার সামঞ্জস্য না ঘটা পর্য্যন্ত সামাজিক ব্যক্তির জীবনে সামঞ্জস্য আসতে পারে না। এই সামঞ্জস্য যেখানেই বিঘ্নিত হয় সেখানেই জীবনে সঙ্কট দেখা দেয়। একদিকে কাজ করে তার সহজ হৃদয়বৃত্তির প্রেরণা, অন্যদিকে কাজ করে তার সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ বিবেক-বিচার। এই দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক সমাধান যেখানে না হয়, সেখানেই জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘটে। শুধু ব্যক্তি-সত্তা বা শুধু সমাজ-সত্তা—কোন একটিকে আঁকড়ে ধ'রে মানুষ নিষ্কৃতি পায় না।

বাল্মীকির রাম যুগপ্রবৃত্তির প্রেরণায় সমাজ-সত্তাকেই বড় মনে ক'রে আঁকড়ে ধরেছিলেন—সমাজের মুখ চেয়ে নিজের সুখ-সম্ভোগকে ত্যাগ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রাম যুগপ্রবৃত্তির প্রেরণাতেই—প্রথমে ব্যক্তি-সত্তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন, পরে বশিষ্ঠের নির্দেশের চাপে—কিছু সময়ের জন্য সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং কিছু পরেই—কৌশল্যার আবেদনে অর্থাৎ আবার ব্যক্তি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে, রাজ-সত্তাকে সঙ্কুচিত ক'রে নিয়েছেন।—রাম সত্যভঙ্গ করেছেন। এখানে সমাজ-সত্তার উপরে ব্যক্তি-সত্তাকে স্থান দিয়ে রাম 'পাষাণ' বা 'পিশাচ' হননি বটে, কিন্তু পুণ্যরশ্মিকে মলিন করতে তথা প্রজার চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এগিয়ে গিয়েছেন। সেই মুহূর্তেই সীতা পতিসত্য রক্ষার জন্য, রামের পুণ্যরশ্মি অমলিন রাখার জন্য, নিজেই অযোধ্যাপুরী ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং রামকে সীতা নির্বাসনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই কার্যে রাম একদিকে মুক্ত হয়েছেন বটে কিন্তু অন্যদিকে বদ্ধ এবং দশের চোখে হীন হয়েছেন। বাল্মীকির রাম যেখানে প্রেমে এবং কর্তব্যে সবতোভাবে বলিষ্ঠ, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রামকে বড় প্রেমিক করতে গিয়ে ছোট সামাজিক মানুষে পরিণত করেছেন। তাতে মনে হয়, সীতার মহত্ত্বই বেড়েছে—রামের মহত্ত্ব কমেছে ছাড়া বাড়েনি। সীতা-নির্বাসনে বাল্মীকির রামের অন্তরে বাহিরে যে মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে—দ্বিজেন্দ্রলালের রাম সে মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের রাম জাত দিয়েছেন কিন্তু পেট ভরাতে পারেননি—অর্থাৎ সীতা নির্বাসন ঠেকাতে পারেননি।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সীতার বনবাস ব্যাপারটিকে রামের সহজ সমাজানুগত্যের পরিণতি হিসাবে উপস্থাপিত করতে চাননি ব'লে, একদিকে সমাজ-বিধানের প্রতীক স্বরূপ বশিষ্ঠ চরিত্রের পরিকল্পনা ক'রে, রামের উপরে পুরোহিততন্ত্র শাসিত সমাজের চাপ দেখাতে চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে ভরত,

শান্তা এবং কৌশল্যাকে মুখপাত্র করে—প্রেমের সম্মান, নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তির অধিকার—শুধু তো পুরুষেরই অধিকার নয়,—নারীরও অধিকার। ব্যক্তি যেখানে সুবিচার পায় না—সেখানে অরাজকতা অবিচারেরই আধিপত্য। ভরত রামকে নিবৃত্ত করতে এসে বলেছেন—"যদি ভূপতি তোমার

সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার
কে করিবে আর নারীর সম্মান ?
দুর্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ
হবে তা' হলে পুরুষের ক্রীড়া,
বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া
হইবে পতির উপহাস দ্রব্য ;
শিথিল হইবে পতির কর্তব্য
অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশ দেশ জুড়ি ভারত ভিতরে।"

শান্তা এসে তীব্র অনুযোগ উত্থাপন করেছেন—

"যদি পায় পদে উৎসর্গিয়া প্রাণে
বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে
নির্বাসন, দয়া প্রতিদানে পৃষ্ঠে
ছুরিকা আঘাত তাহার অদৃষ্টে
সারল্যের বিনিময়ে কপটতা
বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা,
........................তবে
এই দণ্ডে নারীজাতি এ জগতে
লুপ্ত হয়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে॥

কৌশল্যাও সীতার রামগত প্রাণের কথা বলে—উন্মত্ত এবং আত্মঘাতী কাজ করতে নিষেধ করেছেন, গুরুর আজ্ঞার উপরে মায়ের আজ্ঞাকে স্থান দিতে রামের কাছে ব্যাকুল অনুরোধ জানিয়েছেন। ভরত, শান্তা, কৌশল্যা সকলেই সমাজ-নিরপেক্ষভাবেই ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কেউই রামের সমাজ-সত্তার অর্থাৎ রাজ-সত্তার সমস্যাটি ভেবে দেখতে চেষ্টা করেন নি। শেষ পর্যন্ত কৌশল্যার আবেদনে রাম সত্যভঙ্গ করেছেন এবং সীতা এসে স্বেচ্ছানির্বাসন দ্বারা রামকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন। এই অন্যথাকল্পনা সম্ভাব্যের মাত্রা লঙ্ঘন না করলেও, অরামায়ণোচিত যে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, ব্যক্তি অধিকারের তথা নারী অধিকারের আধুনিক চেতনা বা সংস্কার কাহিনী-পরিকল্পনার এবং চরিত্র কল্পনার মধ্যে বিশেষভাবেই কাজ করেছে। রোমান্টিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপাসক ব'লেই বশিষ্ঠের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিলোপকারী অতিসমাজকেন্দ্রিক নীতি খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। বশিষ্ঠের কাছে—"কেহ নহে আপনার,

সমাজ রক্ষিত সম্পত্তি সে, সমাজের অধিকার।
ব্যক্তির সর্বৈব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্বসুখ
বলি দিতে হবে সমাজের পদে।.........
স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য নহে সৃষ্ট বিধাতার,
....
....
সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহা সব, তাহাই
পাপ, রঘুবর। পাপ পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি,
আর তুমি অধিষ্ঠিত সেই সমাজের প্রতিনিধি
সমাজের ভৃত্যমাত্র।"*

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এইভাবে অস্বীকার করার—ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজসাৎ ক'রে দেখার যে নীতি, নাট্যকার সে নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ন'ন। পাপ-পুণ্যের অতিলৌকিক বিধানের ভিত্তি নেই, সমাজের মঙ্গলকর কার্যই পুণ্য এবং অমঙ্গলকর কার্যই পাপ,—জীবনকে এতখানি সমাজ সাপেক্ষ ক'রে, সমাজবিধানের অধীন ক'রে, দেখতে বা দেখাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী নাট্যকার খুবই অনিচ্ছুক এবং অনিচ্ছুক ব'লেই শেষ পর্যন্ত বাল্মীকির যুক্তির কাছে—বশিষ্ঠকে হার মানিয়েছেন।

সীতার বনবাসের পরে—সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত, রামের জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা (ক) লবণাসুরকে বধ করার জন্য শত্রুঘ্নকে প্রেরণ—শত্রুঘ্নকে-মধুপুরী (মথুরা) রাজ্যে স্থাপন। (খ) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শূদ্র তপস্বী শম্বুকের শিরচ্ছেদ এবং (গ) তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত বাল্মীকির আদেশে লব-কুশের রামায়ণ গান—লব কুশকে সীতার পুত্র ব'লে রামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—বাল্মীকির কাছে রামের দূত প্রেরণ এবং যজ্ঞপরিষদে সকলের সামনে সীতা শপথ গ্রহণ করবেন—সেই বিষয়ে বাল্মীকির এবং সীতার মনোগত ইচ্ছা কি তা' জানবার ইচ্ছা। রামের প্রস্তাবে বাল্মীকির সম্মতি এবং সীতার যজ্ঞপরিষদে শপথ গ্রহণ। সেই সময়েই ভূতল থেকে এক আশ্চর্য অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসনের আবির্ভাব এবং ধরণী দেবীর সীতাকে নিয়ে রসাতলে অন্তর্ধান।

((সীতা নির্বাসনের পরে, বাল্মীকির রাম শোকাভিভূত হ'য়ে চারদিন রাজকার্য থেকে বিরত ছিলেন এবং লক্ষ্মণের প্রবোধবচনে প্রকৃতিস্থ হয়ে রাজকার্যে মনোনিবেশ করেছিলেন। চারদিন রাজকার্য না করায় রাম অনুতপ্ত ছিলেন; কারণ রাম জানতেন—"যে রাজা দৈনিক পৌরকার্য করেন

না তিনি সংবৃত নরকে পতিত হন। বীরের শোকের মতোই, রামের দুঃখ তাঁর কর্তব্যের পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য রাম কখনও নিজেকে ধিক্কার দেননি বা রাজ-কর্তব্যের উপর কোন কটাক্ষপাত করেননি। কারণ স্পষ্ট; কর্তব্যের চেয়ে প্রেমকে বড় ব'লে মনে না করা পর্যন্ত আত্মধিক্কারের কোন সম্ভাবনা নেই।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের রাম অনুতাপে নিত্য দগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হননি—আত্মধিক্কারে অনুক্ষণ মৃত্যু কামনা করেছেন। এত তীব্র মনস্তাপের কারণ রাম নিজেই ব্যক্ত করেছেন :—

"বুঝি নাই—নির্বাসন ক্ষণে মাতা, সে সতীর
প্রতি সে কি নৃশংসতা, বুঝি নাই—কি গভীর
প্রেমের সে অপমান।"

ব্যক্তি-সম্পর্কের মূল্যকে, সমাজবিধানাতিরিক্ত কোন সার্বজনীন নিরপেক্ষ মান দিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সহজহৃদয়াবেগের—অন্তঃকরণের—সহজ প্রমাণ দিয়ে বিচার করবার প্রবৃত্তি থেকেই, রামের মধ্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ধর্মচেতনার এ এক নতুন পর্য্যায়। বর্ণাশ্রমিক ধর্মবোধ নিয়ে এ রাম সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি এবং পারেননি ব'লেই—সীতা নির্বাসনের তীব্র মনস্তাপে অবিরাম দগ্ধ হয়েছেন।

শম্বুকের শিরশ্ছেদ ব্যাপারেও, আমরা এই আধুনিক রামকে দেখতে পাই। বাল্মীকির রাম "ব্রাহ্মণের করুণ বিলাপ শুনে দুঃখাত হয়ে বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ভ্রাতৃগণকে ডেকে আনলেন। মার্কেণ্ডেয়, কাশ্যপ, গৌতম, নারদ প্রভৃতিও এলেন। রাম বালকের অকাল মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন—সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই তপস্যা করতেন। তখন, অকাল মৃত্যু ছিল না। ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়রাও তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন,.........। তারপর...দ্বাপর যুগ এল, বৈশ্যরাও তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু শূদ্রের তখন সে অধিকার

হ'ল না।………দ্বাপরে তাদের পক্ষে তপস্যা পরম অধর্ম্ম। মহারাজ তোমার রাজ্যে কোনও দুর্বুদ্ধি শূদ্র তপস্যা করছে, সেই পাপেই এই বালক মরেছে।" নারদ অকাল মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন, বাল্মীকির রাম তা'র বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। দ্বাপরে শূদ্রের তপশ্চর্যাকে পাপ হিসাবেই গণ্য করেছেন এবং শূদ্র তপস্বীকে বধ্য ব'লেই মনে করেছেন। এই কারণেই রাম শম্বুকের শিরশ্ছেদ করতে এবং করে কোনরূপ অনুতাপ প্রকাশ করেননি—এবং হৃদয়হীনতার জন্য নিজেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন ভাবেই ধিক্কৃত করেননি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রাম শম্বুককে বধ করেছেন—যন্ত্রের মতো—শুধুমাত্র বশিষ্ঠের আদেশ পালন করবার জন্যই। কোন সমাজ-ধর্ম্মবোধের প্রেরণায় তিনি কাযে অগ্রসর হননি। সমাজে বর্ণনির্বিচারে সকলের সমান অধিকার—দ্বিজেন্দ্রলালের রাম এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। শম্বুক যে 'নব বিধান'-এর কথা রামকে শুনিয়েছেন সে কথা রামেরই অন্তরাত্মার কথা। এই রাম বার বার অন্তরাত্মার বিরোধী কাজ তথা আত্মপীড়ন করেছেন। রাম যেন, নিরুপায়! অন্যায় সমাজধর্ম রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে, তিনি মহত্তর অর্থাৎ সার্বজনীন মানব ধর্মকে হনন ক'রে চলেছেন। শম্বুকের আচরণ—তপশ্চর্যার অধিকার, রামের কাছে অধর্ম বা পাপ ব'লে মনে হয়নি ব'লেই শম্বুকের শিরশ্ছেদ করতে গিয়ে রাম আত্মধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন—

"সত্য আমি অতি নির্মম কঠিন,
আমার হৃদয় নাই। রাজার বিচার মায়াহীন।
অনুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার—
নীরস কর্তব্য সার। স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।"

শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে বাল্মীকির রামের চেতনা এতখানি প্রসারিত এবং স্পর্শকাতর ছিল না, ব'লেই—বাল্মীকির রাম নিজেকে এতখানি হৃদয়হীন এবং অপরাধী ভাবতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের রামে ব্যক্তি-অধিকার

চেতনা বেশী ব'লেই এমন মনোভাব সম্ভব হ'য়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রামে রোমান্টিক আত্মার অনন্ত জিজ্ঞাসার অতৃপ্তি; তাই প্রশ্ন জেগেছে—'ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর? শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়? শূদ্রকের শিরশ্ছেদের পরে তীব্র মনস্তাপ—'ধর্মের পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার?'

শূদ্রতপস্বীর শিরশ্ছেদের পর, উল্লেখযোগ্য ঘটনা—রামের অশ্বমেধযজ্ঞ—যজ্ঞপরিষদে সীতার দ্বিতীয়বার শপথগ্রহণ ও পরীক্ষা—সীতার পাতালপ্রবেশ।

বাল্মীকি রামায়ণে এই ঘটনাগুলি নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হয়েছে।—

শম্বুককে বধ করার পরে রাম ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করেন এবং একরাত্রি সেখানে বাস করেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে—ভরত ও লক্ষ্মণের কাছে রাজসূয় যজ্ঞ করার বাসনা ব্যক্ত করেন। ভরত রাজসূয় যজ্ঞ করতে নিষেধ করেন। তাঁর যুক্তি—সকল মহীপালই আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করেন। আপনার এমন যজ্ঞ করা উচিত নয় যাতে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের নাশ হতে পারে। পরাক্রান্ত সকল রাজাই আপনার বসে আছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করলে তাঁরা ক্রোধের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন। ভরতের কথায় রাম প্রীত হন এবং সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তখন লক্ষ্মণ—সর্বপাপনাশক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং রাম লক্ষ্মণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

বশিষ্ট, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপ এই চারজন অশ্বমেধজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মতি নিয়ে রাম লক্ষ্মণের উপর বন্দোবস্ত করার ভার অর্পণ করেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হিতকামী নৃপতিগণ, বিদেশস্থ ধার্মিক দ্বিজগণ, সস্ত্রীক ঋষিগণ—সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে রাম আদেশ দেন। আরও আদেশ করেন—"নৈমিষক্ষেত্রে গোমতীতীরে বৃহৎ যজ্ঞশালা নির্মাণ করাও। প্রচুর তণ্ডুলতিল, মুদ্গ, চনক, কুলিত্থ, মাষ ও লবণ নিয়ে শত সহস্র ভারবাহী পশু অগ্রেই সেখানে যাক। উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত তৈলাদি এবং গন্ধদ্রব্য পাঠানো হ'ক।

বহুকোটি স্বর্ণ ও রজত নিয়ে ভরত সাবধানে সেখানে যান। তাঁর সঙ্গে আপণিক, নট, নর্তক, পাচক ও যৌবনবতী নারীরাও যাক। সৈন্যদল অগ্রভাগে যাত্রা করুক। ভৃত্য ও কোষাধ্যক্ষগণ, আমার মাতৃগণ, কুমারগণ এবং অন্তঃপুরের সকলেই যান।...দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনী প্রতিমা এবং কর্মজ্ঞ বিপ্রগণকে পুরোবর্তী করে মহাযশা ভরত অগ্রে গমন করুন।" (বাল্মীকি-রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, শ্রীরাজশেখর বসু-কর্তৃক সারানুবাদ)

মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সঙ্গে এই যজ্ঞে এসেছিলেন। লব-কুশকেও সঙ্গে এনেছিলেন। লব-কুশকে বাল্মীকি বললেন—'তোমরা ঋষিদের আবাসে, ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামের ভবনদ্বারে, যজ্ঞস্থানে এবং ঋত্বিগগণের নিকটে রামায়ণ গান করে বেড়াও।...প্রতিদিন বিংশতি সর্গ গান করো।...যদি রাম প্রশ্ন করেন তোমরা কার পুত্র, তবে বলবে আমরা বাল্মীকির শিষ্য। যজ্ঞে আগত মুনিগণ এবং অতিথিগণের সঙ্গে রাম বহুদিন রামায়ণ গান শুনলেন। তাঁর বিশ্বাস হ'ল লব-কুশ সীতারই পুত্র। তখন তিনি বাল্মীকির কাছে দূত মুখে নিবেদন জানালেন—সীতা যদি শুদ্ধচারিণী পাপহীনা হন, তবে তিনি মহামুনির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করুন'। বাল্মীকি উত্তরে জানালেন—রামের যা ইচ্ছা সীতা তাই করবেন।

রজনী প্রভাত হ'লে রাম যজ্ঞশালায় গিয়ে, বশিষ্ঠ বামদেব জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র দুর্বাসা পুলস্ত্য মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, নারদ, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদের আহ্বান করলেন। নানাদেশ হ'তে আগত বহু সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সীতার পরীক্ষা দেখবার জন্য সমবেত হলেন। সীতা অধোবদনে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বাষ্পাকুল নয়নে রামকে ধ্যান করতে করতে মহর্ষির পশ্চাতে এলেন। সভায় মহান সাধুবাদ উত্থিত হ'ল। বিশাল দুঃখের উদয়ে সকলে শোকে ব্যাকুলিত হ'য়ে কোলাহল ক'রে উঠলেন। সভায় প্রবেশ করে বাল্মীকি বললেন—"এই সেই পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা যাঁকে অপবাদের ভয়ে আমার

আশ্রমের নিকট পরিত্যাগ করা হয়েছিল। রাম, তুমি লোকাপবাদে ভীত, এখন আজ্ঞা কর সীতা তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করবেন। জানকীর এই দুই যমজ পুত্র তোমারই। আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা বলেছি এমন স্মরণ হয় না। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছি, মৈথিলী যদি দোষযুক্তা হন, তবে সেই তপস্যার ফল যেন আমি ভোগ না করি। আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে শুদ্ধচারিণী পতিব্রতা ভেবেই বন প্রদেশে তাঁকে গ্রহণ করেছিলাম। লোকাপবাদে তোমার চিত্ত কলুষিত হয়েছিল, তাই তোমার প্রিয়তমাকে শুদ্ধা জেনেও তুমি ত্যাগ করেছ।" রাম বাল্মীকির কথা স্বীকার করলেন। এবং বললেন—'জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হোক।'

তখন সমবেত জনগণের সমক্ষে সীতা কৃতাঞ্জলি হ'যে অধোবদনে বললেন—'আমি যদি রাঘব ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিন। যদি মনে কর্মে বাক্যে রামকে অর্চনা করে থাকি, তবে মাধবীদেবী বিদীর্ণ হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি আমি সত্য ব'লে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ'যে আমাকে আশ্রয় দিন।"

বৈদেহী শপথ করছেন এমন সময় ভূতল থেকে এক আশ্চর্য অত্যুত্তম দিব্য সিংহাসন উত্থিত হ'ল।...ধরণী দেবী স্বাগত সম্ভাষণে মৈথিলীকে অভিনন্দিত করলেন এবং তাকে দুই বাহু দ্বারা ধারণ ক'রে—রসাতলে প্রবেশ করলেন।

বাল্মীকির এই কাহিনীকে ভবভূতি এবং পরবর্তী কবিরা অন্যভাবে কল্পনা করেছেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে অন্যথাকল্পনা করেছেন তা অনেক পরিমাণে ভবভূতির অনুসরণ হলেও হুবহু অনুকরণ নয়। আগেই বলা হয়েছে—দ্বিজেন্দ্রলাল বশিষ্ঠকে সমাজবিধানের প্রতিনিধি হিসাবে রূপ দিয়েছেন। বশিষ্ঠ থেকেই যেমন সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার চাপ

এসেছে, তেমনি সীতার স্থানে অন্য পত্নী গ্রহণের চাপও বশিষ্ঠের কাছ থেকে এসেছে। আমরা দেখি, বশিষ্ঠের সঙ্গে রামের বাচনিক সংঘর্ষে, রামের সীতা-প্রেমের রুদ্ধ আবেগে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত—সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতিকে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়ে যজ্ঞের আয়োজনে বশিষ্ঠ সম্মতি দিয়েছেন।

কিন্তু নাটকে, বাল্মীকি যজ্ঞে যোগদান করতে, লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে যাননি, একাই গেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে গেলে—লব-কুশের সঙ্গে শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও পরাজয়—লব-কুশের পিতৃ পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া—সীতার করুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, তপোবনে এসে সীতার কাছে রামের মার্জনা ভিক্ষা এবং পাতাল প্রবেশের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনা করার সুযোগ পাওয়া কঠিন হ'ত ব'লেই, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যথাকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এই পরিকল্পনার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সীতাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়নি এবং (খ) সীতার পাতাল প্রবেশ ব্যাপারটিকে অতি-প্রকৃত ঘটনা হিসাবে উপস্থাপিত না ক'রে প্রাকৃতিক ঘটনা—অর্থাৎ 'ভূমিকম্প'—জনিত দুর্ঘটনা হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই দু'টি পরিকল্পনায় আধুনিকমনা দ্বিজেন্দ্রলালই আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রথম পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—নাট্যকার, বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকির বিতর্কের এবং বশিষ্ঠের পরাজয়বরণের সাহায্যে, সীতাগ্রহণ সমস্যাটির সহজ সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। বিতর্কের একদিকে দাঁড় করিয়েছেন সমাজ-সত্তার প্রতিনিধি—কর্তব্যসর্বস্ব বশিষ্ঠকে—যাঁর কাছে প্রেমের চেয়ে কর্তব্য বড়, অন্যদিকে ব্যক্তি সত্তার প্রতিনিধি বাল্মীকিকে, যাঁর কাছে কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়—প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর। যাঁর ধারণা—

প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি;
প্রেম দেয় বিধি; নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে।

.. ..

প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে
যেথা ধর্ম, সেথা প্রেম, সেথা পাপ প্রেম নাহি রহে
প্রেম প্রভু, কর্তব্য তাহার ভৃত্য···

আমরা দেখি, বাল্মীকির আবেগপূর্ণ বক্তৃতা শুনেই, বশিষ্ঠ পরাজয় স্বীকার করেছেন এবং জানকীকে গ্রহণ করবার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন এখানে উঠবেই এবং সে প্রশ্নটি এই—সীতানির্বাসনের মুখ্যকারণ কি বশিষ্ঠ? না লোকাপবাদ? বশিষ্ঠ হলে, অবশ্যই তিনি সকলের আগে অর্থাৎ অভিষেকের সময়েই প্রশ্নটি উত্থাপন করতেন। যেহেতু তা তিনি করেননি—সেইহেতু স্বীকার করতেই হবে—লোকাপবাদই সীতা নির্বাসনের মুখ্য কারণ। তাই যদি সত্য হয়, তবে বশিষ্ঠের ভাষায় বলা যেতে পারে—"যে কারণে সীতা নির্বাসিত সেইহেতু বিদ্যমান অদ্যাপি।" এমত অবস্থায়, বাল্মীকির জয় নয়, সীতার পরীক্ষাই এবং লোকের সাধুবাদই নির্বাসিত সীতাকে পুনর্বাসিত করতে সক্ষম। প্রজার মন থেকে অপবাদ-স্পৃহার মূলোৎপাটন না করতে পারলে, রামের পক্ষে, বিশেষতঃ রাজা-রামের পক্ষে, অন্য সঙ্কটের সম্মুখীন না হ'য়েও সীতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

গ্রহণের আগে বাল্মীকি, সেই কারণে, সীতা-পরীক্ষার—অবতারণা করেছেন। অন্যপক্ষে, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্যাটিকে ব্যক্তি-রুচিনির্ভর ক'রে তুলেছেন, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী আধুনিক মনের প্রেরণার বশেই তা' করেছেন। এই পরিকল্পনায় মূল দ্বন্দ্বের সুসঙ্গত সমাধান কতটা হয়েছে তা' অবশ্যই বিচার্য বিষয়। যদি বশিষ্ঠের অভিমতেই সমগ্র প্রজাসাধারণের অভিমত অভিব্যক্ত হয়—তবেই বশিষ্ঠের আদেশে সীতাগ্রহণ, মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই দিক দিয়ে হিসাব করলে, বলতেই হবে—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্যাটির সঙ্গত সমাধান করতে পারেননি—

রামের জীবনে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল, তার প্রকৃত তাৎপর্য নাট্যকার যদি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন, তা'হলে অবশ্যই দেখতে পেতেন যে রামের ব্যক্তি-সত্তা এবং সমাজ-সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যের একান্ত-অভাবেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। রাবণকর্তৃক সীতাহরণই রামের জীবনে এমন একটি উৎকট সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। সীতাকে বর্জন করলে রামের ব্যক্তি-সত্তার ক্ষোভ-ক্ষতি যেমন অনিবার্য, তেমনি লোকাপবাদ সত্ত্বেও সীতাকে রাজপুরীতে স্থান দিলে, রামের সমাজ-সত্তার সঙ্কোচন এবং অশান্তি অনিবার্য। সীতাহারা রাম যেন প্রেম-বঞ্চিত ও রিক্ত, লোকাপবাদ-উদাসীন অপ্রজানুরঞ্জক আত্মসুখ-পরায়ণ এবং সুনীতিবিমুখ রামও তেমনি লোকপ্রীতিবঞ্চিত এবং খ্যাতিবঞ্চিত—একক এবং রিক্ত। দুই সত্তার নির্বিরোধ সামঞ্জস্য না ঘটলে, রামের জীবনে কিছুতেই শান্তি আসতে পারে না। সুতরাং, একমাত্র লোকাপবাদ-বিমুক্ত সীতাই অর্থাৎ প্রেম ও প্রতিষ্ঠার সমন্বয়ই, রামের জীবনের উভয়-সঙ্কট দূর করতে পারে এবং তা' পারে বলেই—লোকসমক্ষে সীতার শপথ গ্রহণ একান্তই অপেক্ষিত।

বাল্মীকি মহাকবির উদার ধ্যানে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—প্রজাদের মনে প্রত্যয় না আনা পর্যন্ত সীতাগ্রহণ অসম্ভব এবং তেমনি অসম্ভব সীতাগ্রহণ ব্যাপারকে শান্ত-সহজ ঘটনায় পরিণত করা। প্রথানুসারে সতীত্বের প্রমাণ দিতে হ'লে সীতাকে দিয়ে নিশ্চয়ই অসাধারণ শপথ গ্রহণ করাতে হবে ; কিন্তু সতীসাধ্বী সীতা নিশ্চযই কলঙ্ক-মোচনের পরীক্ষাকে—বার বার লাঞ্ছনাকে—আত্মবিসর্জনের সুযোগে পরিণত না ক'রে, অন্যরূপ কিছু করবেন না। মহাকবি গ্রহণ ও বিসর্জন ব্যাপার একটিমাত্র উপায়ে সম্পন্ন করেছেন—সেই উপায় সীতার পরীক্ষা। তা'ই সেখানে, সীতার সতীত্বনিদর্শন বাকসিদ্ধির পরিণতি রূপেই 'পাতাল-প্রবেশ' রূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

নাট্যকার ভবভূতি এবং আমাদের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, সীতা-গ্রহণ

ব্যাপারটি উপস্থাপনা করতে, অনেকখানি কল্পনার অবসর নিয়েছেন। ভবভূতি একদিকে বাল্মীকির আশ্রমে অভিনব নাট্যাভিনয়ের আযোজন ক'রে বশিষ্ঠ, জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি রামের আত্মীযদের সমবেত করেছেন,—অন্যদিকে—অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব হরণ করায় লবের সঙ্গে অশ্বরক্ষক চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন এবং রামের উপস্থিতি দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটিযেছেন এবং রামকেও লব-কুশাদিসহ নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছেন। ভবভূতি রামচরিতের নাট্যরূপ দেখিযেই রাম-সীতার পুনর্মিলন সংঘটিত করেছেন। এই কারণে ভবভূতির নাটকের পরিসমাপ্তি মিলনান্ত, হয়েছে।) কারণ পাতাল-প্রবেশ—ভবভূতির পরিকল্পনায়, অসঙ্গত ঘটনা হ'তে বাধ্য।

(নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, লবকুশের সঙ্গে শত্রুঘ্নের এবং রাঘবসৈন্যের যুদ্ধের অবতারণা করে, লব-কুশের ক্ষত্রিয অভিমান এবং লব-কুশের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সেই অবসরে সীতার মাতৃহৃদযকে গভীর দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করেছেন। 'নাটকের ভিতর নাটকের' পরিকল্পনা না ক'রে, শুধু বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধের সাহায্যে, সীতা-গ্রহণের বাধা দূর করেছেন এবং রামকে বাল্মীকির তপোবনে এনে সীতার কাছে মার্জনাভিক্ষা করিযে মিলনের সব বাধা অপসারিত করেছেন। কিন্তু অনিবার্য সুখ-মিলনের সম্ভাবনাকে আকস্মিক এক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার অবতারণা ক'রে নষ্ট করেছেন এবং প্রত্যাশিত মিলনান্ত পরিণতির স্থলে বিযোগান্ত পরিসমাপ্তি সৃষ্টি করেছেন। পাতাল-প্রবেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে ভূমিকম্পের কল্পনা, আধুনিক যুগ-প্রবৃত্তির নিদর্শন বটে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য—ভূমিকম্পের ফলে একমাত্র সীতার পাতাল-প্রবেশ, ঔচিত্যবোধে কম আঘাত করে না। এক্ষেত্রে, বাল্মীকির ঘটনা-বিন্যাস যদি অলৌকিক বা অপ্রাকৃত হযে থাকে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঘটনা আকস্মিক এবং বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক হযেছে। বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার পাতাল-প্রবেশ আত্মশুদ্ধি ব্যাপারেরই স্বাভাবিক পরিণতিরূপে দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ

রাম-সীতার চরিত্রের এবং মিলন সমস্যাসমাধানের অনিবার্য পরিণতিহিসাবেই পাতাল-প্রবেশ ঘটনাটি ঘটেছে। পরীক্ষা ও পাতাল-প্রবেশ যেন একই ঘটনার এপিঠ ওপিঠ। সতীত্বের প্রমাণ দিতে সীতা যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন, পাতাল-প্রবেশ তারই অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পাতাল-প্রবেশ নাটকীয় ঘটনার অনিবার্য বা সম্ভাব্য পরিণতি হ'তে পারেনি।

সীতা-নাটকের গঠন-বিশ্লেষণ

সমগ্র নাটকের বিশ্লেষণ, গঠন-বিশ্লেষণ অপেক্ষা ব্যাপকতর ব্যাপার বটে, কিন্তু, অঙ্গীর স্বরূপ না জানা পর্যন্ত যেমন অঙ্গের তাৎপর্য জানা যায় না, তেমনি কোন নাটকের গঠন বিন্যাসের সম্যক বিশ্লেষণ করতে গেলে, নাটকের অন্যান্য উপাদানের আলোচনাও একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। Lajos Egri-তাঁর The Art of Dramatic writing-গ্রন্থে নাটক বিশ্লেষণের যে নমুনা দিয়েছেন, তা'তে দেখা যায় তিনি নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ ব্যাপারটিকে ভাগ ক'রে নিয়েছেন :—

(ক) **প্রতিপাদ্য** (Premise)

এগ্‌রি যাকে 'প্রেমিজ' বলেছেন, তাকেই ক্রুগেতিয়ে নাম দিয়েছেন—'Goal'—হাউয়ার্ড লসন বলেছেন—"root-idea", ব্র্যাণ্ডার মাথুস বলেছেন—'Theme' অধ্যাপক পিয়ার্স বলেছেন—'গন্তব্যস্থল' (Where you are going)। দৃষ্টান্ত—রোমিও জুলিয়েটের প্রতিপাদ্য—"বড় প্রেম মৃত্যুভয় করে না", কীং লিয়রের প্রতিপাদ্য—অন্ধ বিশ্বাস মৃত্যুর কারণ, ম্যাকবেথের—'দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজেই নিজের পতন আনে' ইত্যাদি।

(খ) **কেন্দ্রীয় চরিত্র** (Pivotal character)

(গ) **অন্যান্য চরিত্র** (Characters)

(ঘ) **সুসঙ্গতি** (Orchestration)

"Orchestration damands well-defined and uncompromising characters in opposition, moving from one pole towards another through conflict."

(ঙ) **বিপরীত ধর্মীর সংযোগ** (Unity opposites)

"The Real unity of opposites is one in which compromise is impossible".

(চ) **বস্তুস্থাপনা** (Point of attack) বা (Exposition)

[(ক) আসন্ন দ্বন্দ্বের অব্যবহিত পূর্বে নাটকের আরম্ভ করা যেতে পারে।

(খ) নাটকের কোন চরিত্রের জীবনে যখন মোড় ঘুরছে—ঠিক তখন আরম্ভ করা যেতে পারে।

(গ) এমন কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে যার ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

(ঘ) তাকেই ভাল আরম্ভ বলা যায় যেখানে নাটকের প্রারম্ভেই—"something vital is at stake"]

(ছ) **দ্বন্দ্ব** (Conflict)

[(ক) Static Conflict. (খ) Jumping Conflict.

(গ) Slowly rising (ঘ) Foreshadowing Conflict]

(জ) **ক্রমপরিণতি** (Transition)

[Transition is the element which keeps the play moving without any breaks, jumps or gaps. Transition connects seemingly unconnected elements···]

(ঝ) **চরিত্রের বিবর্তন** (Growth)

(ঞ) **সঙ্কট** (Crisis)

"A state of things in which a decisive change one way or the other is impending"—"Turning point."

(ট) **চূড়ান্ত পরিণাম** (Climax)

"Culminating point".

(ঠ) **উপসংহার বা সমাধান** (Resolution)

(ড) **সংলাপ** (Dialogue)

নাটকের গঠনগত সমস্যার আলোচনা বাস্তবিকই বিরাট ব্যাপার। তবে

সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সমস্যাদিকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে আলোচনা করতে হ'লে— বৃত্তের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করতে হবে। বলা বাহুল্য, বৃত্ত হ'চ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাপরম্পরা অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার সমবায়ে একক একটি বৃহত্তর বহুপর্বিক এবং রসময় ঘটনার পরিকল্পনা ; নানা অংশের বা অঙ্গের সংযোগে তৈরী একটা সমন্বিত অংশী বা অঙ্গী (whole)। অঙ্গীর স্বরূপ না জানতে পারলে যেমন অঙ্গের উপযোগিতা বা তাৎপর্য বিচার করা যায় না, তেমনি নাটকের বৃত্তাংশের উপযোগিতা সমগ্র বৃত্তের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ লক্ষ্য না জানা পর্যন্ত বিচার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বৃত্ত তো স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু নয়। বৃত্তকে আমরা 'ভাব'-রূপ আত্মার দেহ বলে মনে করতে পারি। আত্মা বা দেহীর মধ্যেই যেমন দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তেমনি "মূল ভাব"-এর (root idea) মধ্যেই বৃত্তের ব্যাপ্তির ও জটিলতার সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় লসন মহাশয় যা' বলেছেন তা' উল্লেখ করা যেতে পারে ; তিনি বলেছেন—"The dramatic system of events may attain any degree of extension or complexity provided the result (root-action) is clearly defind" অর্থাৎ নাটকের বৃত্তের অর্থাৎ ঘটনা-বিন্যাসের বিস্তার বা জটিলতা, কাম্যফল লাভের জন্য যতখানি থাকা আবশ্যক ততখানিই থাকতে পারে। আসল কথা—বৃত্ত-পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়—'root idea' এবং "root action" এর দ্বারা। কারণ, যে—'unity' লসনের ভাষায়—"the unifying principle which gives the play its wholeness, binding a series of actions into an action which is organic and indivisible"—তা' আসলে— "Just be a synthesis of theme and action"। সমালোচক লসন বলতে চেয়েছেন—"Climax is the point of reference by which the validity of every element of the structure can de determined" ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতির আনুকূল্য করে

কি করে না—এই বিচার করে করেই গঠনের প্রত্যেকটি উপাদানের সার্থকতা যাচাই করতে হবে। ঘটনার চূড়ান্তপরিণতিকেই বলা চলে—"Root-action" climax-ই নাটকের 'most fundamental action of the play'—এই action-এর ভেতর দিয়েই 'root idea' ব্যক্ত হয়। উইলিয়ম আর্চারের ভাষায় বললে বলা যায়— "Ultimate climax"-ই হ'চ্ছে নাটকের "Core of the action"। লক্ষ্য করবার বিষয় Climax সম্পর্কে লসন যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা আমাদের প্রচলিত ধারণা থেকে পৃথক। তাঁর মতে প্রত্যেক কার্যের চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়,—যথা, ক) সঙ্কল্প (Decision) (খ) বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম (Grappling with difficulties) (গ) শক্তির প্রয়োগ ও পরীক্ষা (test of strength) (ঘ) চূড়ান্ত চেষ্টা ও তার পরিণতি (Climax)। অর্থাৎ Climax-কেই তিনি শেষ পর্যায় বলে মনে করেছেন। কিন্তু সুবিখ্যাত ফ্রেতাগ যে পিরামিড কল্পনা করেছেন, তাতে Climax-এর স্থান মাঝখানে। তাঁর মতে—প্রথম পর্যায় "Introduction," দ্বিতীয় পর্যায়—"Rise", তৃতীয় পর্যায় 'Climax' চতুর্থ পর্যায় Return or fall, পঞ্চম পর্যায় "Catastrophe'। আমাদের সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সন্ধি বিভাগের কথাও স্মরণীয়। ফ্রেতাগের বিভাগটি—আমাদের সন্ধি-বিভাগেরই অনুরূপ। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্শ-উপসংহৃতি—এইপাঁচ সন্ধিতে কার্যকে ভাগ করা হয়েছে এবং ভাগ করার পিছনে যে যুক্তি আছে তা'ও বলা হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—আমাদের সন্ধি বিভাগে গর্ভ-সন্ধিকে এবং ফ্রেতাগের পিরামিডে—"Climax"-কে, "Culminating point' বা 'Turning point' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং তা হ'য়েছে ব'লেই Climaxএর পরে আরো দু'টি পর্যায় কল্পিত হয়েছে। Lajos Egriও Climax-এর পরে Tesolution-কে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু লসন এ বিষয়ে আপোষহীন। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা—To divide the Climax and the denouement is to

give the plav dual roots and destroy the unity of the design. লসন মনে করেন—চূড়ান্ত পরিণতি এবং উপসংহার কার্যের পৃথক পৃথক পর্যায় নয়। পৃথক পর্যায় হ'লে বৃত্তের ঐক্য—সংস্কৃত পরিভাষায় একার্থ বা একান্বয় ব্যাহত হ'তে বাধ্য।

নাটকের ঘটনা বিন্যাস, দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতির (Climax) অভিমুখী করে অথবা উপসংহারের (Resolution) অভিমুখী ক'রে করতে হবে—এ নিয়ে যত বাদবিসংবাদই থাক, নাটকের রস-পরিণাম যে উপসংহারের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপিত হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে উপযুক্ত রস পরিণামের মধ্যেই, 'মূল ভাব'কে (root idea) সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। Egri যা'কে 'premise' বলেছেন তার মধ্যে রস-পরিণামেরও ইঙ্গিত বেশ খানিকটা পাওয়া যায়। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এমন কথা বলা চলে না। আসল কথা—প্রত্যেক রচনারই বিশেষ একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রত্যেক বৃত্তের দায়িত্ব সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তোলায় সম্পূর্ণ হয়। যে বৃত্ত উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে তুলতে যত কুশলতা দেখাতে পারে সেই বৃত্ত তত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। এই কুশলতা নির্ভর করে—ঘটনা বিন্যাস ব্যাপারে, আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত অত্যাবশক এবং অপরিহার্য "বস্তু" নির্বাচন করার উপরে, ঘটনার মধ্যে ক্রম, অন্বয় এবং গতিশীলতা রক্ষা করার উপরে এবং সমগ্র কার্যের প্রত্যেকটি পর্ব এবং পর্বাঙ্গকে রসনীয় করার দক্ষতার উপরে। গঠনের সমস্যা এই হিসাবে, প্রধানতঃ কার্যবিভাগ বা সন্ধিবিভাগ ঘটনা-নির্বাচন (The process of selection) বস্তুস্থাপনা (Exposition বা point of attack) ক্রমবিন্যাস (Continuity), গতিশীলতা (Progression), চূড়ান্ত পরিস্থিতির (Climax) নির্ধারণ এবং তদনুযায়ী একান্বয় (Unity) গঠন, চরিত্রের পারস্পারিক সম্পর্কের সুবিন্যাস (Orchestration) এবং পরিণতি (Growth)—প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে

কায়িক-মানসিক বাচনিক কার্যের দীপ্ততা দ্বন্দ্বগভতা তথা চিত্তাকর্ষকতা সৃষ্টির সমস্যা।

সীতা নাটকের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে, প্রথমেই এই নাটক-রচনার প্রক্রিয়া এবং প্রেরণা সম্পর্কে দু'একটা কথা ব'লে নেওয়া আবশ্যক।

এ কথা ঠিক বটে যে প্রত্যেক রচনাই কোন্ একটি মূল ভাব (root-idea) বা উপপাদ্য (premise)-কে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠে থাকে, কিন্তু তাই ব'লে এ কথা ঠিক নয় যে সব ক্ষেত্রেই নাট্যকারের মনে প্রথমেই একটি 'ভাব' (idea) আসে, এবং পরে তিনি 'root-action-এ ভাবটিকে রূপান্তরিত ক'রে ক্রমান্বয়ে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করেন। এ সম্বন্ধে Egri-র ভাষায় বলা চলে—"Playwrights usually get an idea, or are struck by an unusual situation and decide to write a play around it". কিন্তু No idea and no situation, was ever strong enough to carry you through to its logical conclusion without a clear-cut premise। বাস্তবিকই, ঘটনা, চরিত্র, ভাব প্রভৃতির যে-কোন একটি, রচনার প্রাথমিক নিমিত্ত কারণ হ'তে পারে। কিন্তু রসরূপে পরিণত করতে হ'লে, ভাবকে বিশিষ্ট রূপের এবং রূপকে বিশিষ্ট ভাবাদর্শের বন্ধনে বাঁধতেই হবে। শিল্পীরা জ্ঞাতসারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই করুন—এ কাজ করতে বাধ্য। এমন কি [যে সব ক্ষেত্রে শিল্পীরা বর্তমান এবং প্রাচীন পরিবেশ থেকে বিখ্যাত ঘটনা বা চরিত্র নির্বাচন করেন, সেখানেও শিল্পীর মনের বিশিষ্ট ভাবাদর্শের ছাঁচে পড়ে ঘটনা বা চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। পুরাতন কাহিনীকে শিল্পী নতুন উপপাদ্যের প্রমাণ হিসাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কাঠামো এক থাকলেও, নতুন শিল্পীর হাতে প্রতিমার দেহ ও প্রাণ ভিন্ন হ'য়ে যায়।] সীতা-নাটক-রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন—সীতার চরিত্র এবং

সীতার জীবনের শোচনীয় দুঃখদুর্ভোগ কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছিল। নাটকের ভূমিকায় গ্রন্থকারের শেষ নিবেদন—"রামায়ণ পড়িতে পড়িতে সীতাদেবীর প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি ও কারুণ্য জাগিয়াছিল, তাহার এক কণামাত্র যদি এই কাব্যে আমি দেখাইয়া থাকি, তাহা হইলেই আমার উদ্দেশ্য সফল বিবেচনা করিব।" এই নিবেদন থেকে পাওয়া যাচ্ছে—সতী-সাধ্বী সীতার পবিত্র চরিত্র এবং দুঃখের উপর দুঃখের আঘাতে এবং লাঞ্ছনার মর্মদাহে জর্জরিত সীতার শোচনীয় পরিণতি উপস্থাপিত করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সীতা, দুর্লভ চরিত্রমাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও, রাজার দুহিতা, রাজপুত্রবধূ রাজমহিষী হওয়া সত্ত্বেও এবং দেহেমনে সম্পূর্ণ নির্দোষ হ'য়েও, জীবনে চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ-ভোগ করেছেন—সেই সীতার জীবনের নীরব মর্মদাহের ট্র্যাজেডি দেখানোকেই নাট্যকার মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে সীতার ট্র্যাজেডির সঙ্গে রামের ট্র্যাজেডি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব'লেই, অগত্যা রামকেও ট্র্যাজেডি বৃত্তের একটি অর্ধ অধিকার করতে দিয়েছেন। ফলে সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। রাম এবং সীতা দু'জনেই ট্র্যাজেডি-রসের যুগ্ম আলম্বন-বিভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। সীতা এবং রামের মধ্যে কে অধিকতর কেন্দ্রীয় চরিত্র হ'য়ে উঠেছেন—এ আলোচনায় পরে প্রবেশ করা যাবে। এখানকার আলোচ্য—ভাবাদর্শের পার্থক্যে কাহিনীর রূপান্তরের প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে—ব্যক্তির সমাজ-সত্তা এবং ব্যক্তি-সত্তার দ্বন্দ্বের ব্যাপারে যিনি যে ভাবাদর্শের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, তার রচনার পরিকল্পনা (design), সেই ভাবাদর্শ বা প্রতিপাদ্যের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাল্মীকির রামে সমাজ-সত্তা প্রবল। তাই সীতার পাতাল-প্রবেশ অনিবার্য হয়েছে। ভবভূতির রামে ব্যক্তি-সত্তা সমাজ-সত্তা অপেক্ষা প্রবল ব'লে উত্তরচরিত নাটকের পরিণতি মিলনান্ত হয়েছে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে কর্তব্যের চেয়ে প্রেম

বড় ব'লে—নাটকের প্রতিপাদ্যও ভিন্ন হ'য়েছে। নাট্যকার ভবভূতির রাম অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের রাম অধিকতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকামী এবং ব্যক্তি-অধিকার সচেতন ব'লেই, প্রচলিত কাহিনীর চাপে সমাজ-বিধানের বিরোধিতা করতে না পারলেও, যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। প্রাচীন কাহিনীর কাঠামোতে নতুন প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে নাট্যকার পরিণতির অনিবার্যতা রক্ষা করতে পারেন নি। রামকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ক'রে তিনি যা প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তা'তে নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি অপেক্ষা মিলনান্ত পরিণতিই স্বাভাবিক। বর্তমান "সীতা"-নাটকের 'Premise' তৈরী করতে হ'লে বলতে হবে—অন্ধ কর্তব্যনিষ্ঠায় বা সমাজ-বিধানের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য বশে মানুষ যখন প্রেমের অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার দাবী উপেক্ষা করে, তখন সে অজ্ঞাতসারে আত্মহত্যারই পথ প্রশস্ত করে, প্রেমের দাবী স্বীকার না করা পর্যন্ত তার পক্ষে প্রকৃতিস্থ হওয়া সম্ভব নয়। নাটকের এই প্রতিপাদ্যকেই নাট্যকার রাম-চরিত্রের সাহায্যে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন এবং বাল্মীকির আশ্রমে সপুত্র সীতার সঙ্গে রামের মিলন ঘটিয়ে তা' প্রমাণ করেছেন। সেখানেই নাটকের সব দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটেছে। এই প্রতিপাদ্যে পাতাল-প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই এবং সীতার পাতাল-প্রবেশ রাম-সীতা সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতিও নয়। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিপাদ্য-বহির্ভূত পরিণতি ঘটাতে গিয়ে—আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছেন।

পরিকল্পনার আর একটি ত্রুটি এই :—আমরা জানি নাটকের বিঘোষিত মুখ্য উদ্দেশ্য—সীতার করুণ জীবনের রূপ ও শোচনীয় পরিণতি দেখানো। এই উদ্দেশ্য-অনুসারে বৃত্ত রচনা করতে হ'লে, সীতাকেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়ে—Premise গঠন করা উচিত ছিল। সীতার চরিত্র-মাহাত্ম্যকে এবং শোচনীয় দুঃখ দুর্ভোগের রূপকে মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করলে—

সীতার শোচনীয় জীবন থেকে যে প্রতিপাদ্য গঠন করা সম্ভব, তা'কে কেন্দ্র ক'রেই কাহিনী গঠন করা উচিত ছিল। বনবাসের ক্লেশ স্বীকার. লঙ্কায় বন্দিনী জীবনের মর্মান্তিক যাতনা, লঙ্কায় সভার মধ্যে সতীত্বের শপথ নেওয়া— লোকাপবাদের ফলে পতির কাছ থেকেই নির্বাসন দণ্ড লাভ—বাল্মীকির আশ্রমে বিরহখিন্ন মৃতপ্রায় জীবনের ভারবহন—যজ্ঞ পরিষদে সমস্ত মুনি-ঋষি-রাজন্যবর্গ জনসাধারণের সমক্ষে দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণের চরম লাঞ্ছনা—শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে শান্তির সন্ধান করা—সীতার দুঃখদুর্ভোগের বিভিন্ন পর্যায়। এই দুঃখ দুর্ভোগের জীবন থেকে নাট্যকার একাধিক নতুন মূলভাব বা প্রতিপাদ্য তৈরি করতে পারতেন। বিশেষ ক'রে দেখাতে পারতেন—নারী প্রেমময়ী এবং নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও, যুগে যুগে সমাজের কাছে অতিনিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে—পুরুষের কাছে ন্যায্য সুবিচার সে পায়নি—অকালে তার জীবন শুকিয়ে ঝরে প'ড়ে গেছে। এই Premiseকে সীতার জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হ'লে, যজ্ঞ পরিষদে সীতা-গ্রহণের ঘটনাকে অবশ্যই দৃশ্য ক'রে তুলতে হবে। মোটকথা Premise খুব স্পষ্টাকারে প্রতিভাত না হওয়ায়, অথবা প্রতিপাদ্যের দিকে ঠিক দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকায়—নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে পরিপাটি একার্থকতা বা একান্বয় (Unity of design) ফুটে উঠেনি। এ কথা বলতেই হবে—রামই নাটকের 'Pivotal character' হ'যে দাঁড়িয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত—রামের ট্র্যাজেডির উপরেই অধিকতর আলোকপাত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে—রামের দুঃখের মাত্রা তখনই পূর্ণ হয়েছে যখন—"নিয়তি কঠিন, ছলভরে, পূর্ণ সুধাপাত্র ধরিয়া অধরে, পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে, সহসা ছুড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে"। সীতার অকস্মাৎ ভূতলে-প্রবেশেই রামের জীবনে এই ট্র্যাজেডি ঘটেছে। অবশ্য সীতার মুখেও রামের উল্লিখিত আক্ষেপ প্রত্যাশা করা চলে। তবে, বলা বাহুল্য, সীতার ভূতলে প্রবেশ

এবং রামের ঐ ট্র্যাজেডি নাটকীয় ঘটনার অনিবার্য পরিণতি রূপে দেখা দেয়নি। নিতান্তই একটি বাহ্য ঘটনার অর্থাৎ প্রকৃতির আকস্মিক উৎপাতের সাহায্যে, নাট্যকার—রাম-সীতার পূর্ণ সুধাপাত্র কঠিন ভূতলে নিক্ষেপ করেছেন।

প্রতিপাদ্য ও পরিণতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিযোগের অভাব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য এই কথাটি যে সীতা নাটকের "কার্যে" (Action), 'Strict unity' বলতে যা বুঝায়, তা' নেই। নিখুঁত ঘটনা-ঐক্য রক্ষা করতে হ'লে—'কার্য' হিসাবে সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রবেশ—এই দুই ঘটনার যে-কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে। এ নাটকে তা' করা হয়নি। সীতার বনবাস থেকে আরম্ভ ক'রে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত রাম-সীতার কথা এখানে সংপ্রযোজিত হয়েছে। এ কথাও এখানে জোর করে বলা চলে না যে, সীতার পাতাল-প্রবেশ নামক ঘটনাটিকে লক্ষ্য করেই এখানে ঘটনাবিন্যাস করা হয়েছে। তা' যে করা হয়নি, আগেই প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে—সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রবেশ এই দুটি প্রধান ঘটনার সংযোগে একটা যৌগিক ঐক্যের বৃত্ত রচনা করা হয়েছে। অবশ্য, আপাততঃ দু'টি ঘটনাকে যত পৃথকই মনে হোক, এক হিসাবে দু'টি ঘটনার মধ্যে বেশ ঐক্য আছে ; সীতার বনবাস এবং সীতার পাতাল প্রবেশ যেন একই সমস্যার দুটো মেরু। রাম-সীতার দাম্পত্য জীবনে উত্তরকাণ্ডে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল—সীতার বনবাসে তার আরম্ভ এবং সীতার পাতাল প্রবেশে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। অর্থাৎ সীতার বর্জন ও গ্রহণ ব্যাপার (পাতাল প্রবেশ সহ) একই সমস্যা-বৃত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই বর্জন ও গ্রহণের মধ্যে যেমন একটা কালগত ক্রম আছে, তেমনি আছে একটা অবস্থা-গত ক্রম পরিণাম—বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে সমস্যাটির সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সমস্যার আরম্ভ থেকে সমাধানের উপসংহার

পর্যন্ত কার্যের যে ক্রমবিকাশ (Frogerssion বা Transition) রয়েছে, তাকে আশ্রয় করেই নাট্যকার একার্থক বা একান্বয়সম্পন্ন বৃত্ত গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

এবার, আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত, যে ঘটনা-পরম্পরার মাঝ দিয়ে নাট্যকার তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন, তার আবশ্যকতা ও পারিপাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

সমগ্র কার্যকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে বা পর্বে—ইংরেজী পরিভাষায় পাঁচটি 'এ্যাকট' বা 'Cycle'-এ—ভাগ ক'রে নিয়েছেন এবং প্রত্যেক ভাগের উপস্থাপ্য কার্যাংশকে একাধিক দৃশ্যের সাহায্যে সম্পাদন করেছেন। এই বিভাগের সার্থকতা বিচার করার আগে, প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার—নাটকের প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগ (Cycle)—"Small replica of the Construction of a play involving exposition, rising action, clash and climax" (Lawson) অঙ্ক-গঠন সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লসন মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য—"The activity must be compressed and heightened ; the speed of the development and the point of explosion must be determined in reference to the climax of the Cycle and the Climax of the whole play"—লসনের এই নির্দেশটি সামনে রাখলে প্রতি পর্বের ঘটনা বিন্যাসের অর্থাৎ দৃশ্য-কল্পনার বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজ সাধ্য হবে ব'লে মনে হয়। দেখা যাক আমাদের নাট্যকার এখানে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন—তাঁর দৃশ্য কল্পনা গঠন-পারিপাট্যে, ভাবে ও রসে কতখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম অঙ্কের মুখ্য কার্য—রামের আদর্শ রাজা হওয়ার সঙ্কল্প; প্রজাদের অভাব-অভিযোগ জানার জন্য ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগ এবং গুপ্তচরের মুখে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে লোকাপবাদ শ্রবণ করা তথা সঙ্কটের সম্মুখে

এসে উপস্থিত হওয়া। গৌণ কার্য—রাম-সীতার প্রগাঢ় প্রেমের সম্পর্কটি, বিশেষতঃ সীতার চরিত্রের মানসিক অবস্থাটি, দর্শকের সামনে ব্যক্ত করা। এই কার্যাংশ সম্পন্ন করার জন্য নাট্যকার পাঁচটি দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছেন।

প্রথম দৃশ্য—সভা। প্রথমাংশে রাম রাজকার্যসাধনে অর্থাৎ প্রজাদের কল্যাণ করবার জন্য ভ্রাতাদের কাছে আন্তরিক সাহায্য চেয়েছেন, অষ্টাবক্র মুনির উপদেশ—"রাজা শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য, রাজকার্য প্রজাসেবা, প্রজার সুখের জন্য নিত্য বিসর্জ্জিতে হবে সর্বসুখ আপনার—যদি হয় প্রয়োজন—ত্যজ্য বন্ধু ভ্রাতা মাতা পত্নীও নিশ্চয়"—রাম শিরোধার্য করেছেন। রাম সঙ্কল্প জানিয়েছেন—"আমারও তাই জীবনের সাধনা ও ধ্যান—নিত্য কায়মনোবাক্যে প্রজাদের সাধিব কল্যাণ।" এই সঙ্কল্প থেকেই প্রজাদের অভাব অভিযোগ জানার এবং ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগের ভরতকৃত প্রস্তাব রাম 'উত্তম প্রস্তাব' ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং প্রজাদের অভিলাষ ব্যক্ত হওয়ার আগেই তা' পূর্ণ করবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। রাজকার্যে রাম যে অতি তৎপর, অত্যাচারী লবণ দৈত্যের বিরুদ্ধে শত্রুঘ্নের অধীনে সৈন্য প্রেরণ ক'রে তারও প্রমাণ দিয়েছেন। তবে, ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার ভিতরে, রাম সীতার কামনা পূর্ণ করার জন্য যে ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন, তা'তে রামের সীতাপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের দুর্বলতাও ব্যক্ত হয়েছে।

এই দৃশ্য কল্পনা সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথাটা মনে হয় সে এই যে—ভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দৃশ্যকে "সভা" হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে কি না। "মন্ত্রণা সভা" ব'লে শোধন ক'রে নেওয়ার পথেও বাধা আছে। মন্ত্রণার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি চাই—সমস্যা চাই। তেমন কোন সমস্যা এখানে আলোচিত হয়নি। সঙ্কটের প্রস্তুতি হিসাবেই, দৃশ্যটিকে বিচার করতে হবে এ কথা সত্য বটে,- কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে—"Exposition" নিছক "In-

formation" দেওয়াই নয়—"It is necessarily a very exciting point in the development of the story" দৃশ্যের উদ্দেশ্য—পাত্র-পাত্রীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়াই হোক অথবা তাদের বর্তমান ও অতীত সম্পর্ক এবং সম্পর্কের পরিবর্তনের সূচনা দেখানোই হোক—"The information must be dramatized"। দৃশ্যটিতে জীবন সম্পর্কের বাস্তবকল্প রূপের অভাব আছে এবং আছে বলেই দৃশ্যটিতে জীবন্ত চরিত্রের ক্রিয়া—শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক উদ্যমের বাস্তবিকতার মাত্রা তথা দীপ্তি (Energy) কম। Root-idea, Root action বা premise-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযোগ না থাকলে কোন পরিকল্পনাকেই সার্থক পরিকল্পনা বলা চলে না, এই নাটকের যে মূলভাব বা প্রতিপাদ্য (কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়)—তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বস্তু স্থাপনা করতে হলে—রামচরিত্রে কর্তব্যের ও প্রেমের নিষ্ঠাকেই প্রথমে ব্যক্ত করা দরকার। সীতা নাটকের প্রত্যাশিত "Expositton" বা Point of attack—"রাজা-রাম" এবং 'প্রেমিক-রাম'-এর প্রত্যক্ষ পরিচয় দেওয়া।

এ দৃশ্যে রামের প্রজানুরঞ্জনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু, যে পরিমাণ ভাব-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে দেখালে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং রামচরিত্রের আদর্শবাদিতা স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হ'ত এবং নাটকীয় দীপ্তি লাভ করত, কবি ততখানি—ততখানি কেন তার শতাংশের একাংশও—ভাবদ্বন্দ্ব দেখাতে পারেননি।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজ-অন্তঃপুর। এই দৃশ্যটিও—Exposition বা মুখসন্ধির অন্তর্গত। সীতার মানসিক অবস্থার রূপটি দেখানোই এই দৃশ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানকার উদ্দেশ্য, সীতার নিজের উক্তিতে—(এ প্রাণ সদাই তাই হু হু করে। সদা ছুটে যেতে চাই আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, মোর নাথ সনে—সেই গোদাবরী তীরে) এবং শান্তার বিশ্লেষণে—(এমনি—সদা চিন্তাকুল সীতা, সদা অন্যমনা, চাহে চারিদিকে মুগ্ধ কুরঙ্গনয়না, সপ্রশ্ন বিস্ময়ে, সদা আতঙ্ক বিহ্বল; মুহূর্তে

পাণ্ডুরা, চক্ষু দু'টি ছল ছল ভ'রে আসে জলে ; হাসি মিলাইয়া যায় গভীর বিষাদে)—ব্যক্ত হয়েছে। সীতার এই মানসিক বৈশিষ্ট্যে দু'টি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। একটি—বন-প্রদেশের বা মুক্ত প্রকৃতির জন্য সীতার গোপন কামনা, অন্যটি—বিচ্ছেদের আতঙ্ক। এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নাটকীয় প্রয়োজন আছে কি না তা' আলোচনা করার আগেই, একটা প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রশ্ন জাগতে পারে—সীতার মনে, বন-প্রদেশে ফিরে যাওয়ার কামনা এবং আতঙ্কবিহ্বলতা, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে স্বাভাবিক কি না। যাঁর মনে সদাতঙ্ক—'দুর্দিন লঙ্কার হারাইয়া তার শিকার খুঁজিয়া অযোধ্যার দ্বারে আসি' ধেয়ে, যেন বাধা পেয়ে, ঘুরিছে ঘেরিয়া চারিধার এ পুরীর, চায় শুদ্ধ সুবিধায়, সদাই আমাকে তোমার ও হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে' (১ম অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য), তাঁর পক্ষে, আবার সেই গোদাবরী তীরে যাওয়ার বাসনা কি স্বাভাবিক ? একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভাবী বনবাসের এবং বিচ্ছেদের ছায়া হিসাবে সীতার এই মানসিক অবস্থার একটা মূল্য আছে। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু মূল্যসৃষ্টির জন্যই যদি নাট্যকার এই দৃশ্যটি যোজনা ক'রে থাকেন তা'হলে একে গঠনগত ত্রুটি হিসাবেই ধরতে হবে। সীতা-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য, পরবর্তী ঘটনায় বা তাঁর চরিত্রের ক্রম-পরিণতিতেযদি-প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে তবেই তার সার্থকতা। আমরা দেখতে পাই—সীতার প্রকৃতি-প্রীতি এবং অপ্রকৃতিস্থ আতঙ্ক পরবর্তী ঘটনায় কোন কাজেই আসেনি। বাল্মীকি সীতার তপোবন দর্শনের আকাঙ্ক্ষাকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, আমাদের নাট্যকার তা' করতে পারেননি। তারপর, সীতার সদাতঙ্ক ভাবটি ৪র্থ দৃশ্যের পরেই সীতার চরিত্র থেকে একেবারে উবে গেছে। রামের তীব্র মনস্তাপের মুহূর্তে সীতার এই আতঙ্কের উল্লেখ থাকলেও অন্ততঃ একটি ব্যাপারে, আতঙ্কের উপযোগিতা পাওয়া যেত। এই হিসাবে, দৃশ্যটিতে কবিত্ব যতই থাক, অপরিহার্যত্ব নেই। আর তা যদি না থাকে, নাটকে

নিরপেক্ষ কবিত্বের কোন মূল্যই নেই। তারপর এ কথাও এখানে বলে রাখা যাক—অনেকেরই মুখে—বিশেষতঃ শাস্তার মুখে অনুচিত (out-of-character) কবিত্ব ব্যক্ত হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না—নাটক কাব্য বটে, কিন্তু কল্পনা-শক্তির স্বাধীন অনুশীলনের ক্ষেত্র নয়।

তৃতীয় দৃশ্য—লক্ষ্মণ-উর্ম্মিলার নিরর্থক আলাপে এই কবিত্ব গীতি-কাব্যের পূর্ণ আবেগে উচ্ছ্বসিত হযেছে। এই আলাপ-প্রলাপ নাটককে কোনভাবেই সাহায্য করেনি। প্রণয়-সুধা না পেলে প্রাণের ক্ষুধা মেটে না—এই কথাটা শোনানোর জন্য একটা গোটা দৃশ্যের যোজনা চূড়ান্ত অমিতব্যযিতা। দৃশ্যটি সর্বতোভাবে অবান্তর। চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার অগ্রগতি কোনটাই এ ব্যক্ত করে না।

চতুর্থ দৃশ্য—প্রাসাদ প্রান্তস্থ উপবন। রাম ও সীতার বিশ্রম্ভালাপ। এ দৃশ্যও মুখসন্ধির (exposition) অন্তর্গত। এই দৃশ্যে—একদিকে রাম-সীতার পারস্পরিক ঐকান্তিক অনুরাগ, অন্যদিকে—সীতার আতঙ্ক-অপ্রকৃতিস্থ বিকৃত-প্রায় মনের রূপটি দেখানো হয়েছে এবং আসন্ন বিচ্ছেদের সংকেত দিয়ে একটা থমথমে আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দৃশ্যে রাম-সীতার ঐকান্তিক প্রেম-নিষ্ঠার চেয়ে সীতার আতঙ্ক-অপ্রকৃতিস্থতাই বেশী প্রাধান্য পেযেছে। অথচ এত প্রধান একটি উপস্থাপ্য বিষয়, এখানেই তার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে লয় পেয়ে গেছে ; সীতা-চরিত্রের ক্রমবিকাশে এই আতঙ্ক ও অপ্রকৃতিস্থ ভাব কোন অংশই গ্রহণ করেনি।

পঞ্চম দৃশ্য—প্রাসাদকক্ষ। এই দৃশ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিয়োগের ফল ফলেছে। দুর্ম্মুখ এসে সীতার সম্বন্ধে লোকাপবাদের কথা রামের কাছে নিবেদন করলে—রাম নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন—মহাসমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—

রাজ্য মিলাইয়া যাক স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্বর্য্যের মত ; চূর্ণ হোক্ পদতলে
এ প্রাসাদ ; ভেসে যাক্, সরযূর জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্য্যবংশ ব্রহ্মশাপে
ভস্ম হ'যে যাক্।—আজ আমার এ পাপে
সৃষ্টি নাশ হোক্। তবু হৃদয়ে আসীন,
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন।
এই বক্ষে ভস্মীভূত বিশ্বচরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে।

এই পঞ্চম দৃশ্যেই প্রধান চরিত্র মূল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হযেছে। সেই হিসাবে এখানেই exposition-এর cycle শেষ হয়েছে। অবশ্য নাটকখানি আরম্ভ হয়েছে—"with a decision which will precpitate conflict" এবং নাটকের প্রকৃত দ্বন্দ্বের আরম্ভ হয়েছে পঞ্চম দৃশ্যে—যেখানে প্রধান চরিত্রকে এমন এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে—যা'তে সঙ্কট অনিবার্য হ'য়ে উঠে। পঞ্চম দৃশ্যে রামের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখানো হ'য়েছে—তা'তে প্রেমিক-রামের রূপটি বিশেষভাবে ব্যক্ত হ'লেও, রামের গাম্ভীর্য একটু ক্ষুণ্ণ হযেছে ব'লেই মনে হয়। অধিকন্তু বশিষ্ঠের উপর রামের যে আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে, তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ পাওয়া যায় না ব'লেই তা' অপ্রস্তুত। দুর্ম্মুখ সংবাদ নিয়ে আসার আগেই, প্রজারঞ্জনে ত্যাজ্য সীতা, 'এ আদেশ বশিষ্ঠ দিয়েছেন কি ?' না দিলে, 'বশিষ্ঠ নিষ্ঠুর···'ইত্যাদি সংলাপ অনাবশ্যক।

দ্বিতীয় অঙ্কের মুখ্য কার্য—সীতা নির্বাসন (এক্ষেত্রে সীতার স্বেচ্ছাকৃত-নির্বাসন)। বাল্মীকির রামায়ণে রাম বয়স্যদের মুখে লোকাপবাদ শুনে নিজেই সব দিক বিচার ক'রে দেখেছেন এবং সীতাত্যাগের সঙ্কল্প করেছেন। এই নাটকে রাম সমস্যার সমাধানকল্পে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন

হয়েছেন। বশিষ্ঠের আদেশে সীতাকে ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছেন, ভরত ও শান্তার অনুনয়-আবেদন সত্ত্বেও সঙ্কল্পে অটল রয়েছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত মায়ের কাতর প্রার্থনায় সত্যভঙ্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। তবে, সীতা স্বামীকে ছোট হ'তে দেননি—পতিসত্যরক্ষার জন্য নিজেই বনবাসে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছেন। এই কার্যটুকু নাট্যকার চারটি দৃশ্যে সম্পন্ন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে—অন্তঃপুরের দরদালানে—কৌশল্যার স্বগতোক্তি দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ এবং অশ্রুমতী সীতা এবং কৌশল্যার সংলাপের ও অনুভাবের সাহায্যে, রামের চম্পকারণ্যে বশিষ্ঠের কাছে যাওয়ার সংবাদটুকু এবং অত্যাসন্ন অমঙ্গলের সূচনা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—বশিষ্ঠাশ্রমে—রাম ও বশিষ্ঠের মধ্যে সীতা-ত্যাগ সম্বন্ধে বিতর্ক হয়েছে। রামের যুক্তির বিরুদ্ধে কর্তব্যপালনের পক্ষে বশিষ্ঠের অধিকতর আবেগময় বক্তৃতা এবং বশিষ্ঠের কাছে রামের আত্মসমর্পণ উপস্থাপনা করা হয়েছে। রামের কাছে সীতাত্যাগ—'একান্ত অসাধ্য' কায—অতি তিক্ত পানীয় পান; বিশেষতঃ নিরপরাধিনী সীতাকে ত্যাগ পাপ। বশিষ্ঠ রামের এই সব যুক্তি খণ্ডন করতে তথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—কর্তব্যপালন অনেকক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য এবং তিক্তপানীয় পান; কর্ত্তব্যপালন ও আত্মহত্যা এক পদার্থ নয়, অপরাধ বা পাপ-পুণ্য বিচার শুধু সমাজবিধানেরই সঙ্গে মিলিয়ে করা সম্ভব এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক ব্যক্তি—সমাজের বাইরে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি নেই।

অতএব ব্যক্তির সর্ব্বৈব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্ব্বসুখ বলি দিতে হবে সমাজের পদে ;······

এবং—সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহা সব, তাহাই পাপ······পাপ-পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি এবং রাজা "সমাজের প্রতিনিধি"—"সমাজের ভৃত্যমাত্র"। রাম বশিষ্ঠের কাছে এই সিদ্ধান্তকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি।

তবে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে--যতখানি ঐকান্তিক আবেগে সীতাকে রাখার জন্য সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন, ততখানি দৃঢ়তার সঙ্গে বশিষ্ঠের কাছে ব্যক্তি-অধিকারের দাবী উত্থাপন করতে পারেননি। 'ব্যক্তির জন্য সমাজ' না 'সমাজের জন্য ব্যক্তি'—এই সমস্যার আলোচনায় বশিষ্ঠ তাঁর বক্তব্য যত জোরে এবং বিস্তারে বলেছেন, রাম তত জোরে এবং বিস্তারে নিজের বক্তব্য বলতে পারেননি। তাই দেখা যায়—রাম নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন…"গুরুদেব। বুঝি না এ বাণী! তুমি আজ্ঞা কর আমি কার্য করি। এই মাত্র জানি।" এখানে রামের কাছে যতখানি দ্বন্দ্ব প্রত্যাশিত ছিল, ততখানি দ্বন্দ্ব পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠের ইচ্ছার সঙ্গে রামের ইচ্ছার তীব্র দ্বন্দ্ব এবং সমাধান সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে পারলে, দৃশ্যটি আরো রস-ভাবোজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারত। এখানে রাম হয়েছেন তেমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রচলিত সমাজ-বিধানকে মানতে রাজি ন'ন বটে, কিন্তু, প্রচলিত সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতেও সাহসী ন'ন। ফলে বিবেকের বিরুদ্ধেই তাঁকে সমাজবিধি মানতে হযেছে—এবং সারাজীবন পাপবোধের তুষানলে দগ্ধ হ'তে হয়েছে। ভরত যে বিশ্লেষণ ক'রে ব'লেছেন —"প্রধান ভ্রম যে অভ্রান্ত বশিষ্ঠ। দ্বিতীয় ভ্রমটি—কর্তব্যনিষ্ঠ মূঢ় নিশ্চিন্ততা।" সে কথা সর্বাংশে ঠিক নয়।

বশিষ্ঠের বক্তৃতার উত্তরে রামের উক্তি—"গুরুদেব, বুঝি না এ বাণী। তুমি আজ্ঞা কর, আমি কার্য করি। এইমাত্র জানি।" আপাততঃ আনুগত্য-জ্ঞাপক হ'লেও, "বুঝি না এ বাণী"র সুরে 'বশিষ্ঠ অভ্রান্ত'—এ স্বীকৃতি ফুটে উঠে না। যাই হোক, এই দৃশ্যে রাম অগত্যা কর্তব্যপালনের জন্য সীতা-নির্বাসনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্যে—(উর্ম্মিলার কক্ষে) লক্ষ্মণ-উর্ম্মিলার কথোপকথন থেকে জানা যায়—লক্ষ্মণের উপর সীতা-নির্বাসনের আদেশ হয়েছে—বাল্মীকির

আশ্রমে সীতাকে রেখে আসতে হবে এবংউর্মিলাকেইসীতার কাছে নির্বাসন-সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে।

চতুর্থ দৃশ্য—রাজসভা। পরিস্থিতি—রাম একাকী সিংহাসনে ব'সে আছেন। রাজত্ব অর্থাৎ রাজকর্তব্য তাঁর চোখে লৌহ-শৃঙ্খল; কালকূটভরা-স্বর্ণপাত্র, অন্তঃসারশূন্য গৌরব—পুণ্য-ছদ্মবেশধারী পাপ—কদর্য-বিলাস। অতীব দরিদ্র নীচাদপি নীচ প্রজার জীবনও রাজার জীবনের চেয়ে সুখী, কারণ তার স্বাধীনতায় কেউ বাধা দিতে যায় না—[সত্যিই কি তাই? নীচাদপির নীচ প্রজাও সামাজিক জীব—সমাজের বিধান তাকেও মানতে হয়। ঐ জাতীয় অবাধ স্বাধীনতা কোন সামাজিক মানুষের জীবনে সম্ভব নয়] রামের এই মনোভাব সত্য হ'লে নিশ্চয়ই এ কথা বলা চলবে না যে রামের মধ্যে 'কর্তব্যনিষ্ঠ মূঢ় নিশ্চিন্ততা' রয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠা ট'লে না গেলে —এই সব কথা কিছুতেই বের হ'তে পারে না। কর্তব্যপালন রামের কাছে আত্মহত্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে; রাম কর্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে বাঁচতে চান—চান—

"কোন দূর বনে গিয়া, শান্তিময়
পবিত্র, অতুল, অনন্ত, অক্ষয়
বিশ্রাম কিভাবে কাটাইতে দিন"

(কি কর্তব্যের ক্ষেত্রে কি ব্যক্তি বাসনার ক্ষেত্রে—সর্বত্রই রাম যেন ভীরু সৈনিক।)

এখানেই এবং সীতা নির্বাসন নিয়েই, ভরত রামের আচরণের সমালোচনা করেছেন। "সীতা ত্যাগ আজি চাহে সব অযোধ্যার সব প্রজা"—রামের এ যুক্তি মানতে তিনি রাজি নন। প্রজা অন্যায় দাবী করলেও রাজাকে তা' মানতে হবে—এমন কোন কথা নেই। সে নীতি রাজনীতির নামে অরাজকতারই নামান্তর। তেমনি কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ মাত্রকেই শিরোধার্য

করতে ভরত সম্মত ন'ন। বশিষ্ঠ অভ্রান্ত নন; তিনি চিন্তাকূপে অন্ধ—শুষ্কপ্রেম-স্নেহ। ভরতের তৃতীয় যুক্তি—রাজা নিজেই যদি নারীর সম্মান না রাখেন তাহলে প্রজার কাছে রমণীর প্রাণ পুরুষের ক্রীড়ায় পরিণত হবে—পত্নীর প্রতি পতির কর্তব্যবোধ শিথিল হ'য়ে যায়। কিন্তু তবু রাম অটল। অগত্যা ভরত অভিমানে রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ব্যক্ত ক'রে প্রস্থান করেছেন।

প্রবেশ করেছেন—ভগিনী শান্তা। বিনীত দৃঢ়তা নিয়ে শান্তা সীতার সতীত্ব এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে আবেগময়ী বক্তৃতা করেছেন। তা'তেও কোন ফল হয়নি। সেইক্ষণেই প্রবেশ করেছেন মাতা কৌশল্যা। রামকে তিনি 'পাপ উন্মত্ত আত্মঘাতী কাজ' করতে কিছুতেই দেবেন না। আর মাতৃ-আজ্ঞার চেয়ে গুরু-আজ্ঞা বড় হ'তে পারে না, সুতরাং গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে মাতৃ-আজ্ঞা রাখতেই হবে—রামের কাছে কৌশল্যার এ ভিক্ষা।

শেষ পর্যন্ত—মায়ের মিনতিতে রাম সত্যভঙ্গ করতে সম্মত হয়েছেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য তাঁর মধ্যে অনুশোচনা এবং দ্বন্দ্বও বেশ দেখা দিয়েছে। সূর্যবংশের সন্তানের পক্ষে এই অঙ্গীকারভঙ্গ কম সঙ্কট নয়। সীতা এসে রামকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন—সুসংযত আবেগে তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন—"আমিও রাখিব পতিসত্য।............ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর"। সীতার সঙ্কল্প শুনে রাম নিজেকে 'পাষাণ' 'পিশাচ' ব'লে ধিক্কার দিয়েছেন, চোখে অন্ধকার দেখেছেন এবং বুকে সমুদ্রের আলোড়ন অনুভব করেছেন বটে, কিন্তু আবেগ প্রকাশের বেশী আর কিছুই করেননি। সীতার স্বেচ্ছা নির্বাসনের সঙ্কল্পের পরে, রামের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় আবেগে শেষ হবে, এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত নয়। নাট্যকার প্রত্যাশা পূর্ণ করেননি এবং না ক'রে রাম চরিত্রকে বাস্তবতার দিক দিয়ে অপূর্ণ ক'রে রেখেছেন। রাম যেটুকু আচরণ করেছেন বা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন কোন জীবন্ত চরিত্রে তা' যথেষ্ট এবং স্বাভাবিক ব'লে মনে করা চলে না। বাল্মীকির রামের মতো এই রামের

ব্যক্তিত্বের জোর এবং ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা থাকলে, রামের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরো তীব্র মাত্রায় দেখা দিত। রাম-সীতার ইচ্ছাশক্তির দ্বন্দ্ব এবং উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক অথচ অনিবার্য সমাধান দেখাতে পারলে তবেই সব দিক রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল।

তৃতীয় অঙ্কের কার্য—লব-কুশের জন্মের কিছুকাল পরবর্তী সময় থেকে—শূদ্রকবধ পর্যন্ত সীতার এবং রামের বাহ্য ও আন্তর জীবনের রূপ ব্যক্ত করা। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—বাল্মীকির তপোবন। সীতা ও বাসন্তীর সংলাপের ভিতর দিয়ে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন—(ক) আশ্রম-জীবনের সঙ্গে রামময় সীতা বুঝাপড়া করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি আর তাঁকে আগের মতো মুগ্ধ করতে পারে না। সীতার অবস্থা—সীতার নিজেরই ভাষায়—"যে দিকে নিরখি, নিরখি সে একই দৃশ্য রাঘবের মুখ, মনে জাগে শুধু সখি সে অতীত সুখ, তাঁর চিন্তা তাঁর ছবি বহে চক্ষে ভাসি।" সব সাধ শুষ্ক তপস্যায় শৃঙ্খলিত ক'রে রাখলেও—"তবু ভেঙ্গে যায় বাঁধ অসতর্ক মুহূর্তে কখন জেগে ওঠে ঘুমন্ত সে প্রেম।" (খ) লব-কুশের জন্মের পরে কয়েক বছর পার হ'য়ে গেছে। কারণ কুশ-লব নিজেরাই তখন এখানে ওখানে যেতে পারে। বাসন্তীর—'দেখি কোথা কুশী লব'-ই তার প্রমাণ।

এই দৃশ্য যোজনা সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, নির্বাসনের পরে সীতার অবস্থা কি হয়েছিল তা দৃশ্য ক'রে পাঠকের কৌতূহল মেটাতে হ'লে যে ধরণের দৃশ্য যোজনা করা বাঞ্ছনীয় ছিল—তা' করা হয়নি। প্রেম ও তপস্যার দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র বিবৃত না ক'রে, দৃশ্য করতে পারলে, সীতার অভিযোজন-প্রচেষ্টার জীবন্ত রূপ সুন্দর ফুটে উঠত। সীতার জীবন যেখানে মুখ্য উপস্থাপ্য, সেখানে এই সব দৃশ্য অবশ্যই প্রত্যাশিত। দ্বিতীয়ঃ 'Continuity'-র সমস্যা সম্বন্ধেও নাট্যকার তেমন সচেতন হ'তে পারেননি। সীতা যে গর্ভিনী—এ কথা এর আগে ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি ;সুতরাং কুশী-লবের জন্ম ও পরিচয় পাঠকের

কাছে অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়, এবং সেই কারণে বাসন্তীর "দেখি কোথা কুশীলব"— অপ্রস্তুত বার্তায় পরিণত হয়েছে। সীতার করুণ জীবনকে দৃশ্য করা যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে, সীতার আশ্রম জীবনের কারুণ্যকে আরো বিস্তারে এবং প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা কর্তব্য। নাট্যকারের দৃষ্টি রামচরিত্রে অধিকতর নিবদ্ধ ব'লে সীতার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা আশানুরূপ হ'তে পারেনি। সীতাকে একটি দৃশ্যে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপিত করেই নাট্যকার **দ্বিতীয় দৃশ্যে**, অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন এবং শূদ্রক-বধের আয়োজন করেছেন। **তৃতীয় দৃশ্যে**—ভরতের মাতুলালয়ে ভরত মাণ্ডবীর কথোপকথনের তির্যক দৃষ্টিতে রাম-সীতার গভীর প্রেম ও চরিত্রের উপর আলোকপাত ক'রেছেন। **চতুর্থ দৃশ্যে**—পঞ্চবটী বনে রামের স্মৃতি রোমন্থনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে রামের অন্তর্বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং **পঞ্চম দৃশ্যে**—শৈবল রাজের আশ্রমে, শূদ্রক-বধ সম্পন্ন করেছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমে নাট্যকার অতিসংক্ষেপে কয়েকটি সংবাদ জানিয়েই, কতিপয় ঋষি সহ বশিষ্ঠের 'প্রবেশ' ঘটিয়েছেন এবং প্রথম ঋষির মুখ দিয়ে অকাল মৃত্যুর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বশিষ্ঠ অকাল মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন, তা'র সম্বন্ধে লক্ষ্মণ প্রশ্ন তুললেও রাম কোন মন্তব্য করেননি। রামের এক কথা—"যথা আজ্ঞা তাহাই করিব মহাভাগ।"

রামচরিত্রের ক্রমপরিণতি (Growth) হিসাবে রামের এই মনোভাব অবশ্য লক্ষণীয়। রাম যেন সীতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিবেক বিচার স্বাধীন সত্তা ত্যাগ করেছেন। তার নিজের কোন সঙ্কল্প নেই। অসাড়ভাবে বশিষ্ঠের আদেশ পালন ক'রে রাম যেন নিজেকেই নিজে শাস্তি দিচ্ছেন।—নির্দয় কর্তব্য নীরবে পালন করার মধ্যে যে আত্মপীড়ন ও আত্মক্ষয় রয়েছে, তাতেই যেন রামের সুখ। রাম অনুভবের অর্থাৎ হৃদয়ের টুটি চেপে ধ'রে, হৃদয়হীন কর্তব্যনিষ্ঠার আত্মক্ষয়কারী পরিণামকেই প্রমাণ করতে চান। ভিতরকার

কর্তব্যবোধের প্রেরণা থেকে রাম কাজ করতে অগ্রসর হননি বলেই—শূদ্রকের নববিধানের বাণী শুনে বলেছেন—"সত্য হোক, মিথ্যা হোক, কি একান্ত ভ্রম হোক, জানিয়াছ তুমি পালনীয় রাজার নিয়ম, দণ্ডযোগ্য তুমি।" রাজার নিযমের বিরুদ্ধে রামের মনে প্রতিবাদ না জমলে এমন কথা কিছুতেই বের হ'তে পারে না। যেমন পারে না—"আমার হৃদয় নাই······অনুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার—নীরস কর্তব্য সার স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।" (৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য)। রামের এই চারিত্রিক পরিণতি দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম ব্যক্ত হয়েছে এবং পঞ্চম দৃশ্যে পরিস্ফুট আকারে দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে—নাট্যকার একদিকে ভরতের মাধ্যমে রামেরমহত্ত্ব, রামের করুণা, রামের যন্ত্রণা এবং রামের ভ্রান্তির উপর, অন্যদিকে মাণ্ডবীর মাধ্যমে সীতার 'অসীম গভীর প্রেমের সমুদ্র'-এর উপর এবং নারীজাতির লাঞ্ছনার উপর, পরোক্ষভাবে আলোকপাত করেছেন।

দৃশ্যটির গঠনগত উপযোগিতা এইটুকু যে, রামের দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার সঙ্কল্প এবং দাক্ষিণাত্যে পঞ্চবটী বনে উপস্থিতির মধ্যে যে কালক্রম প্রত্যাশিত তা' এর দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে। ভরত রামের ভ্রান্তি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণটুকু করেছেন—শূদ্রকবধের পূর্বে তা' অত্যাবশ্যক এ কথা যদি বলা না যায়, তা' হ'লে দৃশ্যটিকে অপরিহার্য ব'লেও মনে করা চলে না।

চতুর্থ দৃশ্যে—পঞ্চবটী বনের স্মৃতি সম্ভোগের সাহায্যে পরোক্ষভাবে রামের বিচ্ছেদবেদনাতুর হৃদযের এবং রিক্ত জীবনের রূপটি দেখানো হয়েছে। দৃশ্যটিতে নাট্যকার কবিত্বোচ্ছ্বাসকে যত চরিত্রের মানসিক অবস্থার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপে পরিণত করেছেন ততই তা নাটকীয় হয়েছে। এই দৃশ্যটি দর্শকের কাছে প্রত্যাশিত বটে, কিন্তু নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে তার যোগ কত কি আছে বা নেই সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েই যেন নাট্যকার দৃশ্যটি যোজনা করেছেন। দৃশ্যটিকে পরবর্তী অনুভাবাদিতে প্রয়োগ করতে পারলে

কোন কথাই উঠত না অর্থাৎ পঞ্চবটীর স্মৃতি রামের পরবর্তী মানসিক অবস্থায় সংলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করলে, দৃশ্যটি অত্যাবশ্যক ব'লেই বিবেচিত হ'ত।

পঞ্চম দৃশ্যে—শূদ্রক-বধ ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এই দৃশ্যটিকে নাট্যকার একদিকে রামের হৃদয়হীন ও নির্বিচার নিয়মনিষ্ঠার নিদর্শন তথা চরিত্রের পরিণাম হিসাবে যেমন গ'ড়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে শূদ্রকের তপস্যাকে কেন্দ্র ক'রে, শূদ্রের অধিকার—সমানাধিকারতত্ত্ব—নব বিধানের বাণী প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন—সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন উদারতার পটভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতার নিষ্ঠুর রূপটি আঁকবার চেষ্টা করেছেন।

শূদ্রকবধ ব্যাপারের সঙ্গে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যোগ এইখানেই যে এই আচরণেও রাম নিয়মকে (কর্তব্যকে) অনুভবের (প্রেমের) উপরে স্থান দিয়েছেন এবং শুষ্ক নিয়মের অনুরোধে মানবতাবিরোধী কাজ করেছেন। এতে রাম চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবনতি যেমন সূচিত হয়েছে, তেমনি সূচিত হয়েছে, নাটকীয় ঘটনার দিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রশ্ন জাগে—নীরস ও নির্দয় কর্তব্য ক'রে রাম আর কত অন্তরাত্মার অবমাননা করবেন? চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের কার্য—প্রেমের অবমাননায় রামের অন্তর্দাহ—সীতাকে ফিরে পাওয়ার জন্য রামের ব্যাকুলতা দেখানো এবং রাম-সীতার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। প্রথম দৃশ্যে—অন্তঃপুরে এবং মধ্যরাত্রিতে রামের তীব্র মনস্তাপ প্রদর্শন করা হয়েছে—কর্তব্যের উপরে প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। কৌশল্যার প্রবোধবচনের প্রতিবচনে রাম তাঁর অনুতাপ ও অন্তর্বেদনাকে সমুৎসারিত ক'রে দিয়েছেন—প্রশ্ন তুলেছেন—

ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর?
শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়?

শূদ্রক-নিধন কার্যের জন্যও গভীর অনুতাপ প্রকাশ করেছেন: অপরাধীর শোচনা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন—"ধর্মের পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার?" তাঁর কাছে ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় সব-কিছু সন্দেহের পদাঘাতে চূর্ণ। দৃশ্যটিতে প্রতিক্রিয়ার মাঝ দিয়ে প্রতিবিধানের সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। তবে কৌশল্যাকে নিমিত্ত ক'রে রামের অন্তরের কথা ব্যক্ত করার চেষ্টা উচিত হয়েছে কি না—প্রশ্ন জাগতে পারে। তারপর রামের অত উত্তেজনার পরে হঠাৎ "নিদ্রাবস্থাপন্ন" হওয়া নাট্যকে নিদ্রা ব'লে মনে হ'তে পারে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—রামের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। রাম বশিষ্ঠের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের আদেশ স্পষ্টভাষায় অবহেলা করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন—"শত ঋষি বাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুণ্যস্মৃতি জানকীর।" সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিকে সহধর্মিণীর স্থানে বসিয়ে রামের অশ্বমেধযজ্ঞ করার সঙ্কল্প—বশিষ্ঠবিধি-লঙ্ঘনের প্রথম এবং সংজ্ঞান প্রচেষ্টা। "কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড"—এই root-idea-র প্রতিষ্ঠার আয়োজন এখানে আরো একধাপ এগিয়েছে, সঙ্কল্পহীন রামের মধ্যে আবার সঙ্কল্প জেগেছে—ব্যক্তি-সত্তাকে উপেক্ষা করতে রাম যে প্রস্তুত ন'ন তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে—বাসন্তীকে দিয়ে সীতার মনকে পতিসোহাগ-গর্বে পূর্ণ করা হয়েছে—তথা মিলনের বাধা অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সীতার জীবনের আর একটি গুরুতর সঙ্কটের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কুশীলব কোথায় রাজপ্রাসাদে অতুল বিভবে থাকবে, রাজপরিচ্ছদে ভূষিত থাকবে, আর কোথায় তারা নির্জন কুটীরে দীন জীবন যাপন করছে—বল্কল পরিধান ক'রে রয়েছে। রাজপুত্রদের এই অবস্থা দেখে কোন্ মায়ের প্রাণ স্থির থাকতে পারে? এ দৃশ্য করুণ বটে, কিন্তু সীতার পক্ষে আরো করুণ—কুশ-লবের আত্মপরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল। কুশীলবের প্রশ্ন জননী-সীতার পক্ষে এক মহাসঙ্কট।

এখানে, নাট্যকার সীতাকে সেই সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটের সম্মুখীন করেছেন। ঘটনাকে অর্থাৎ প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আযোজনকে, আগেই একটু এগিযে নেওয়া হযেছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে সহধর্মিণী কে হবে সেই কথা শোনার জন্য এবং কুশীলব যাতে রাজস্বত্ব লাভ করতে পারে সেই দাবী জানাতে—বাল্মীকি বিনা নিমন্ত্রণেই অযোধ্যায় গিয়েছেন। অবশ্য কুশীলবকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। (কুশীলবকে সঙ্গে নিযে গেলে নাট্যকারের কাহিনী পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।) এই দৃশ্যের প্রথমে, নাট্যকার সীতাকে পতিসোহাগ-গর্বে পূর্ণ ক'রে এবং দৃশ্যের শেষদিকে অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদ দিয়ে, সর্বতোভাবে অভাগিনী ক'রে তুলে, চমৎকার কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। গাম্ভীর্য থাকলে এবং সীতার অনুভাবাদি আরো স্বাভাবিক হ'লে দৃশ্যটি নিঁখুত হ'তে পারত।

চতুর্থ দৃশ্যের কার্য—অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে নিমিত্ত ক'রে রাম-সৈন্যের সঙ্গে, বিশেষতঃ শত্রুঘ্নের সঙ্গে, লব-কুশের যুদ্ধের সঙ্কল্প। পঞ্চম দৃশ্যের কার্য শত্রুঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ—শত্রুঘ্নের পতন। বলা বাহুল্য, মহাকবি বাল্মীকির লব-কুশকে রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আত্মপরিচয় দিতে হয়নি। উত্তর-চরিতে যুদ্ধের অবতারণা করা হযেছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ হযেছে বালকে বালকে এবং সীতার অজ্ঞাতসারে। এখানে যুদ্ধ হযেছে—শত্রুঘ্নের সঙ্গে এবং প্রায় সীতার জ্ঞাতসারেই। সীতার জ্ঞাতসারে যুদ্ধ যদি অসম্ভব হয়, তবে অজ্ঞাত-সারে যুদ্ধ নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। বিরাট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লব-কুশ যুদ্ধ করবে অথচ সীতা জানবেন না কার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম, এ কথা কল্পনা করা যায না। নাট্যকার তাঁর কাহিনী পরিকল্পনার খাতিরে এমনটি করছেন—এ কথা বললে নিশ্চয়ই পরিকল্পনার অবাস্তবিকতা বা দুর্বলতা ঢাকা পড়ে না।

ষষ্ঠ দৃশ্যে—প্রাসাদশিখরে, মধ্যরাত্রিতে, বিরহোন্মত্ত রামের 'জাগ্রত

তন্দ্রায়' সীতার আবির্ভাব এবং সীতার কাছে রামের জানু পেতে ক্ষমা ভিক্ষা —তথা সীতাকে গ্রহণের জন্য রামের আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখানো হয়েছে। জাগ্রত-তন্দ্রায় সীতাদর্শন রামচরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়। এই মানসিক অবস্থা সীতার সঙ্গে মিলনের ব্যগ্র উৎকণ্ঠাই ব্যক্ত করেছে অর্থাৎ নাটকের লক্ষ্যের দিকেই চরিত্রকে এগিয়ে দিয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কের মুখ্য কার্য—বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধে, 'কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়'—এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা, রামের কাছে লব-কুশের পরিচয় দেওয়া—সীতাকে গ্রহণ করার জন্য রামকে বাল্মীকির আশ্রমে এনে রাম-সীতার মিলন ঘটানো এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধানের পরে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে রাম ও সীতার পূর্ণ সুখের পানপাত্রকে ওষ্ঠাগ্র থেকে ভূতলে নিক্ষেপ করা।

প্রথম দৃশ্য—দণ্ডকাশ্রম। এই দৃশ্যে নাট্যকার শত্রুঘ্নের পতনে সীতার প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে, লব-কুশের কাছে তাদের পিতৃপরিচয় ব্যক্ত করেছেন এবং লব-কুশের মধ্যে ঘৃণার প্রতিক্রিয়া দিয়ে, সীতার বক্ষে দারুণ আঘাত হেনে দুঃখের শেষ অবধি দেখিয়েছেন। সীতার দুঃখের শেষমাত্রা পূর্ণ করবার জন্যই নাট্যকার সীতাকে রাম-সৈন্যের পরিচয় আগে জানতে দেননি। কিন্তু সে যে কতখানি একচক্ষু হরিণের কাজ, আগেই তা' বলেছি।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—রাজসভা। নাটকের মূলভাবটি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি ক'রে—রামের কাছে লবকুশের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে বশিষ্ঠ-বাল্মীকির তর্কযুদ্ধে—কর্তব্যের উপরে প্রেমের আসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে—বশিষ্ঠকে বাল্মীকির কাছে—কর্তব্যকে প্রেমের কাছে—পরাজিত করা হয়েছে অর্থাৎ সীতা-গ্রহণের প্রধান বাধা, বশিষ্ঠের বাধা অপসারিত করা হয়েছে। এই দৃশ্যে নাট্যকার বশিষ্ঠ-বাল্মীকির মধ্যে—যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন, তা'তে বশিষ্ঠ অপেক্ষা

বাল্মীকির দিকেই তিনি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। বশিষ্ঠের প্রধান যুক্তি বাল্মীকি এড়িয়ে গেছেন। বাস্তবিকই—"যে কারণে সীতা নির্বাসিত সেই হেতু বিদ্যমান অদ্যাপি মহর্ষি"—এই যুক্তির সন্তোষজনক উত্তর বাল্মীকি দিতে পারেননি। আমরা জানি সীতানির্বাসনের মূল কারণ বশিষ্ঠ ন'ন, মূল কারণ—লোকাপবাদ। সীতা নির্বাসনের দাবী বশিষ্ঠের কাছ থেকে প্রথম আসেনি—এসেছিল, অবশ্য পরোক্ষভাবে, অযোধ্যার প্রজার কাছ থেকেই। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নাটকে করা হয়নি। বাল্মীকি সীতার পক্ষ হ'য়ে যে 'শুদ্ধ সুবিচারে'র দাবী তুলেছেন সেই দাবী পূরণ করতে গেলে অবশ্যই সীতার সতীত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা দরকার। সে বিচারে রামের বিশ্বাস বা বাল্মীকির বিশ্বাস বড় প্রমাণ হ'তে পারে না। এমন কি বিভীষণাদি রাক্ষসদের সাক্ষ্যেও কোন কাজ হবে না। 'শুদ্ধ সুবিচারের' জন্য যে নিঃসংশয় প্রমাণ আবশ্যক তা' একমাত্র সীতাই দিতে পারেন—যেমন তিনি লঙ্কায় দিয়ে এসেছেন—অগ্নি-পরীক্ষা দিয়ে। যাই হোক এ সমস্যারও সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি। তারপর—"প্রেম না কর্তব্য বড় ?"—এ প্রশ্নের বিচারেও যুক্তির চেয়ে, আবেগোচ্ছ্বাস বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। বশিষ্ঠের মুখে আরো যে যে যুক্তি দেওয়া উচিত ছিল, তা' দিলে বিতর্কটি আরো নাটকীয় এবং সম্পূর্ণ হ'ত।

তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার, সান্ত্বনার অতীত ব্যথায় এবং আরোগ্যের অতীত ব্যাধির আক্রমণে ম্রিয়মাণা সীতাকে উপস্থাপিত করেছেন। সীতার রোগ—"যে রোগ পতির নিষ্করুণ কঠিন তাচ্ছিল্য, শতগুণ কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা"। এ রোগের উপশম—একমাত্র মৃত্যু ; সীতা মৃত্যুই কামনা করেন। মৃত্যুর আগে লব-কুশকে বাসন্তীর হাতে সঁপে দিচ্ছেন—রামের হাতে লব-কুশকে সমর্পণ ক'রে তাঁর অন্তিম নিবেদন রামকে জানাতে অনুরোধ করছেন। এই দৃশ্যের শেষাংশেই, প্রতীক্ষমানা সীতার ঐকান্তিক

রামদর্শনকামনায় প্রতিফলিত ক'রে রামের আগমন সূচিত করা হয়েছে। বাল্মীকির জয়লাভের ফলে রাম-সীতার মিলনের সমস্ত বাধা অপসারিত হওয়ার পরে, মিলন অবধি নাটকীয় কৌতূহল উদ্দীপিত রাখতে হ'লে মিলনের পথে নতুন বাধার সৃষ্টি করা একান্তই প্রয়োজনীয়। নাট্যকার সীতার মৃত্যু-মুহূর্তকে উপস্থাপিত ক'রে, এবং তার হৃদয়ে গভীর করুণ আবেগের সঞ্চার ক'রে, নাটকীয় কৌতূহল অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছেন।

চতুর্থ দৃশ্য—দণ্ডকারণ্যের প্রান্তভাগ—অভিমানক্ষুব্ধ লব-কুশের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎকার এবং অতি-অভিমানী লবের কাছে রামের ক্ষমা-প্রার্থনা, দেখানো হয়েছে। লব-কুশের অভিমান-ক্ষোভের অভিব্যক্তিতে দৃশ্যটি পর্যাপ্ত আবেগময়।

পঞ্চম দৃশ্যে—সীতার সঙ্গে রামের মিলন এবং ভূমিকম্পের ফলে সীতার পাতাল-প্রবেশ প্রদর্শিত হয়েছে। মূল ভাব-বৃত্তটি এখানেই সম্পূর্ণ হয়েছে। রাম 'সীতার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন' ক'রে—তাঁর মহারাজ-সত্তা মুছে ফেলতে চেয়েছেন—সমস্ত সংসার-নিয়মের উর্ধ্বে সুন্দর প্রেমের রাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছেন—যেখানে ব্যক্তিসম্পর্ক শুধু ব্যক্তির হৃদয় আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে—সমাজ-নিয়মের ধার ধারে না, যেখানে রাম শুধুই রাম, রাজা ন'ন, সীতা শুধুই সীতা, রাজ-দুহিতা বা রাজবধূ ন'ন। সীতাও 'সর্ব দুঃখ সর্ব ব্যথা' ভুলে—ঘোষণা করেছেন—'আজি পূর্ণ সুখ, শোক. তাপ, ক্ষোভ, দুঃখ নাহি এতটুকু।' রাম সীতার সর্বদুঃখ অসীম সৌভাগ্যে লীন হ'যে গেছে। এখানেই বাল্মীকির কাজ এবং আসল নাটকও সমাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু বিধির নির্বন্ধ এবং নাট্যকারের ইচ্ছা অন্যরূপ। যার জন্য কেউই প্রস্তুত নয় এমন একটি আকস্মিক উৎপাত (ভূমিকম্প) ঘটিয়ে—বিধাতা বা বিধাতারূপী নাট্যকার রাম সীতার পূর্ণ সুখের মুহূর্তে চিরবিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দিয়েছেন। আগেই বলেছি—এই ঘটনা অতি-আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত

এবং অতি নাটকীয়। কারণ নাটকের মূল বৃত্তের সঙ্গে এর কোন কার্য-কারণ-যোগ নেই অর্থাৎ নাটকের কোন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে বা কোন কার্যের রূপে এ ঘটনা ঘটেনি।

কেউ হয়ত বলতে পারেন—ভূমিকম্পে আকস্মিক ঘটনা হ'লেও অসম্ভব বা অসম্ভাব্য কোনকিছু নয় এবং এই নাটকে নিয়তিই ভূমিকম্পের রূপ ধ'রে এসে—রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে—এই কথা প্রমাণ করেছেন যে, ভাগ্যে সুখ না থাকলে, কারো সাধ্য নেই—সুখভোগ করবে, নিয়তি কেন বাধ্যতে?

রামের উক্তি— "আমার দুঃখের এই পূর্ণমাত্রা তবে।
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে
পূর্ণ সুধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে
পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে
সহসা ছুড়িয়া দিল, কঠিন ভূতলে"—

—এই পক্ষের যুক্তি হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথা কিছুতেই প্রমাণ করা যাবেনা যে এই নাটকের Root idea বা Premise—হচ্ছে "নিয়তি কেন বাধ্যতে"। যদি বলা যায়—রামের জীবনে কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত ট্র্যাজেডি দেখানোই নাটকের উদ্দেশ্য—তা হ'লেও, এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী নয়। সীতার ভূতল-প্রবেশের আগেই সে দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ সমাধান ঘ'টে গেছে। সুতরাং ভূতল প্রবেশ দ্বন্দ্বের অনিবার্য কোন পরিণাম নয়। রাম-সীতার এই বিচ্ছেদ বা ট্র্যাজিক-পরিণতি-দৈবকৃত। কোন ব্যক্তি বা সামাজিক বিধান এর নিমিত্ত কারণ নয়। এক্ষেত্রে দৈবের হস্তক্ষেপ ছাড়া ট্র্যাজেডি-পরিণাম ঘটানোর কোনও উপায় নেই। যেখানে দু'পক্ষেরই মনের আকাশ সম্পূর্ণ নির্মল, সেখানে বিনামেঘে ছাড়া বজ্রপাত ঘটানোর আর কি উপায়? এই কারণেই, নাটকখানি কমেডি হ'তে হ'তে হঠাৎ এবং শেষ মুহূর্তে ট্র্যাজেডির দিকে মোড় ফিরেছে। তবে এইটুকুই রক্ষা

য ভূমিকম্প আকস্মিক এবং আয়ত্ত বহির্ভূত হ'লেও প্রাকৃতিক ঘটনা; স্বতরাং ভূমিকম্পকে আমরা একেবারে অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিতে পারিনে; তাই এক্ষেত্রে যে পরিমাণে ভূমিকম্পকে সম্ভব ব'লে স্বাভাবিক ব'লে স্বীকার করি, সেই পরিমাণেই রাম-সীতার ট্র্যাজেডিকেও স্বীকার করতে বাধ্য হই।

যাই হোক, এই কথা বলতেই হবে যে নাটকখানি নির্দিষ্ট Premiseকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেনি। প্রধানতঃ—'কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়'—এই Premiseকে লক্ষ্য ক'রে নাটক গ'ড়ে উঠলেও শেষ দৃশ্যের শেষাংশে—ভিন্ন লক্ষ্যের অভিমুখে নাটকীয় কার্য এগিয়ে গেছে। এই দুটো লক্ষ্যকে বৃহত্তর তত্ত্বের অধীন করার চেষ্টা করলে, বলতে হবে—কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে রামের জীবনে এবং সীতার জীবনে যে শোচনীয় দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়েছিল এবং দ্বন্দ্বের সুখাবহ সমাধানের মুহূর্তে, প্রাকৃতির বিপত্তির ফলে—নিয়তি নির্বন্ধে—য চির বিচ্ছেদের শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল সেই দুঃখ দুর্দশা ও শোচনীয় পরিণতি উপস্থাপনা করাই—এই নাটকের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হবে—নাটকের মূল উদ্দেশ্য কি এই ছিল? উত্তরে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে—নাটকের নামকরণে এবং ভূমিকায় এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়নি। নামকরণ থেকে এবং ভূমিকা থেকে এই প্রমাণই সংগ্রহ করা যায় যে—নাটকের উদ্দেশ্য সীতার চরিত্রমাহাত্ম্য এবং দুঃখপীড়িত শোচনীয় জীবনের কারুণ্য উপস্থাপনা করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে সীতাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়ে যে ভাবে বৃত্ত-রচনা ঘটনাবিন্যাস করা উচিত ছিল, সেভাবে এখানে বৃত্ত-রচনা করা হয়নি। সীতার কেন্দ্রীয়ত্বের অধিকার রাম অনেকখানি কেড়ে নিয়েছেন। অবশ্যই, এই গঠন-গত ত্রুটিকে মৌলিক ত্রুটি ব'লেই গণ্য করতে হবে।

এই ত্রুটির ফলেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে—'সীতা' নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না। অবশ্য, যার কেন্দ্রীয়ত্ব বাঞ্ছনীয়, সে যদি কেন্দ্র থেকে স'রে

গিয়ে থাকে, তবে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে, নামকরণের সার্থকতা বিচার করার আগে কয়েকটা কথা ভেবে দেখা দরকার। প্রথম কথা এই সীতার কেন্দ্রীয়ত্ব ব্যাহত হ'লেও নাট্যকার সীতার চরিত্রমাহাত্ম্য এবং কারুণ্য উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন ; দ্বিতীয় কথা এই—এই নাটকে নাট্যকার নারীর অধিকার এবং প্রেমের দাবী নিয়ে যে সংগ্রাম করেছেন, সীতাই সেই সংগ্রামের নিমিত্ত কারণ ; অর্থাৎ সীতাকে আশ্রয় করেই নাটকের মূল সমস্যা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে—সীতা সর্বতোভাবে কেন্দ্রচ্যুত হননি—ঘটনা-বিন্যাসের দোষে যে পরিমাণে চোখের বাইরে গেছেন, সে পরিমাণে মনের বাইরে স'রে যাননি।

অঙ্গীরস ও আলম্বন বিভাব

সীতা-নাটকে, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসম্পন্ন সামাজিক মানুষের সমস্যা-সঙ্কটের, দুঃখদুর্ভোগের এবং শোচনীয় পরিণামের দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে নাটকখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক। তখনই প্রশ্ন হবে—ট্র্যাজেডি-রসাত্মক হ'লে, কার ট্র্যাজেডি? কাকে আলম্বন ক'রে রস নিষ্পন্ন হয়েছে? নাটকের ভূমিকা থেকে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাতেই নাট্যকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে—একথা সত্য ব'লে মনে করলে, এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় সীতার করুণ জীবন—এক কথায়, সীতার ট্র্যাজেডি। এই হিসাবে সীতাই এই নাটকের অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাব—সীতাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু নাটকের গঠন-বিশ্লেষণ পরিচ্ছেদে দেখাতে চেষ্টা করেছি—'Root-idea' নির্ধারণে বা Premise গঠনে গণ্ডগোল করায়, রামের ট্র্যাজেডির দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি অধিকমাত্রায় নিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ সীতার স্থলে রামই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদালাভ করেছেন। প্রশ্ন উঠবে—তবে কি রামের এই প্রাধান্য অঙ্গী-রস-নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়নি? মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটারই তো কথা। কিন্তু বিশেষ কারণে ব্যাঘাত মারাত্মক হ'য়ে ওঠেনি। রামের ও সীতার সম্পর্ক যদি এমন হ'ত যে একের ট্র্যাজেডি হ'লে অন্যের ট্র্যাজেডি হতেই পারে না, তাহ'লে premise-এর গণ্ডগোলের গুরুত্ব সহজেই ধরা যেত—শিব গড়তে বাঁদর গড়া যাকে বলে তাই হ'ত। কিন্তু রাম-সীতার সম্পর্কটি এমন যে সীতার ট্র্যাজেডির মধ্যেই রামের ট্র্যাজেডি এবং রামের ট্র্যাজেডির মধ্যেই সীতার ট্র্যাজেডি নিহিত। রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডির মধ্যে বলা চলে অন্বয়-ব্যতিরেক সম্পর্ক। রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডিতে রামের ট্র্যাজেডি। শুধু এই কারণেই এক্ষেত্রে Premise

বিভ্রাট তেমন মারাত্মক ক্ষতি করতে পারেনি। রামের প্রাধান্য ঘটলেও এবং রামকে কেন্দ্র ক'রে নাটকের বৃত্ত গ'ড়ে উঠলেও, সীতার জীবনের নিরুপায় দুঃখদুর্গতি এবং শোচনীয় পরিণামের দৃশ্য দর্শক-পাঠকের মনে যথেষ্টই রেখাপাত করে। রামের ট্র্যাজেডি এবং সীতার ট্র্যাজেডি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। একই শক্তির চাপে উভয়ের জীবনে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে। যে লোকাপবাদের কারণে সীতার নির্বাসন বা ট্র্যাজেডির আরম্ভ, সেই কারণেই অর্থাৎ সীতা নির্বাসনের কারণেই রামের জীবনে ট্র্যাজেডি। রাম-সীতার ট্র্যাজেডি যেন একই কারণের ভিন্নাশ্রয়ী কার্যরূপ। বশিষ্ঠ শুধু সীতার ট্র্যাজেডির জন্যই দায়ী নয় রামের ট্র্যাজেডির জন্যও সমান দায়ী। একই প্রতিকূল পরিস্থিতি উভয়ের জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছে—জীবনকে দুঃখ দুর্গতিতে পূর্ণ ক'রে তুলেছে। আপাতদৃষ্টিতে রামকে সীতার বিপরীত পক্ষের লোক ব'লে মনে হ'লেও, রাম ও সীতা একই পক্ষের লোক। এতখানি ঐক্য আছে ব'লেই লক্ষ্য এদিক-ওদিক স'রে গেলেও রচনা একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে পারেনি।

সীতার ও রামের ট্র্যাজেডি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বলেই, নাটকে যে ট্র্যাজেডি-রস নিষ্পন্ন হয়েছে, রাম এবং সীতা উভয়কেই তার আলম্বন-বিভাব বলা যায়। রামের এবং সীতার ট্র্যাজেডি, যুগপৎ আমাদের মনে জাগে ব'লে অর্থাৎ দু'টি জীবনের দুঃখদুর্ভোগ ও শোচনীয় পরিণাম হাত ধরাধরি ক'রে এসে আমাদের মনের কাছে আবেদন জানায়। বলে, নাটকখানিকে আমরা "যুগল-নায়ক" (Twin hero) নাটক বলতে পারি। অবশ্য, অধ্যাপক নিকল, তাঁর 'থিওরি অফ ড্রামা' গ্রন্থের—'ট্র্যাজেডির নায়ক' পরিচ্ছেদে—"Twin hero" আলোচনার প্রসঙ্গে, ইয়াগো এবং ওথেলোকে যে অর্থে 'Twin hero' বলতে চেয়েছেন ঠিক সে অর্থে আমি রাম-সীতাকে 'যুগল নায়ক' বলছি নে। অধ্যাপক নিকল 'নায়ক' নির্ধারণে, ঘটনানিয়ন্ত্রণকারী বিপক্ষ

শক্তিকে অস্বীকার করতে চাননি বলেই নাযকত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমি অঙ্গীরসের মুখ্য আলম্বন বিভাবকেই 'নায়ক' নির্ধারণে প্রধান বিচার্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং সেই হিসাবেই রাম-সীতাকে 'যুগল নায়ক'-এর মর্যাদা দিতে চেয়েছি। নিকলের মত স্বীকার করলে অর্থাৎ প্রতিনায়ককেও 'নায়ক' বললে, শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক নাটককেই 'twin hero' শ্রেণীতে ফেলতে হবে। তবে, যেখানে প্রতিনায়ক এবং নাযক উভযেরই জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটে—এবং নাট্যকার উভয়েরই ট্র্যাজেডি রূপ দিতে ইচ্ছুক হন, সেখানে নায়ককে এবং প্রতিনাযককে 'যুগল নাযক' বললেও বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে প্রতিনায়কের জীবন প্রধান রসের আলম্বন নয়, সেখানে নিশ্চযই সে কথা বলা চলে না। আগেই বলেছি—সীতা নাটকের পক্ষ বিচার করতে গেলে যদিও আপাতত: তিনটি পক্ষ—[(বশিষ্ঠ+রাম)+(সীতা)] দেখা যায়, বস্তুতঃ পক্ষ এখানে দু'টি। এক পক্ষে সমাজবিধানের প্রতিনিধি বশিষ্ঠ, অন্যপক্ষে রাম সীতা। প্রথম পক্ষের হৃদযহীন নিযম নিষ্ঠার অত্যাচারে, দ্বিতীয় পক্ষ নিরুপায অবস্থায দুঃখঃদুর্দশা ভোগ করেছে। সুতরাং রাম-সীতার যুগল-নাযকত্ব সমর্থনের পক্ষে বেশ জোরালো যুক্তি রয়েছে।

এবার রামের এবং সীতার ট্র্যাজেডির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, রামের এবং সীতার জীবনে দুঃখদুর্দশা ও শোচনীয় পরিণাম ঘটলেও, দুজনের ট্র্যাজেডির রূপ সর্বাংশে এক নয় এবং এক হওয়া সম্ভবও নয। কারণ—Egri-র ভাষায বলা যাক, প্রত্যেক চরিত্রের "Bone structure" ভিন্ন হ'তে বাধ্য। কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা ক'রে বললে, বুঝতে সুবিধা হবে। Egri বলতে চেয়েছেন বস্তুর যেমন (গভীরতা উচ্চতা প্রস্থ) তিনটি মান (demension) আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের আরো তিনটি 'মান' রয়েছে—(ক) শারীরতত্ত্ব (খ) সমাজতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব। ব্যক্তিকে

এই তিন তত্ত্বভূমিতে দাঁড করিয়ে না দেখলে, কিছুতেই তাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। এই তিন মানের বিশেষ পরিচয় দিতে গিয়ে, শ্রদ্ধেয় এগ্‌রি প্রত্যেক মানের বিশেষ বিশেষ 'জিজ্ঞাসা' বিষয়ে একটি তালিকা দিয়েছেন—

শারীরতত্ত্বের জিজ্ঞাসা—(ক) স্ত্রী অথবা পুরুষ,
(খ) বয়স
(গ) উচ্চতা ও ওজন
(ঘ) চুলের, চোখের ও চামড়ার রং
(ঙ) অঙ্গভঙ্গিমা (Posture)
(চ) আকৃতি বা রূপ
(ছ) বিকৃতি
(জ) বংশগত বৈশিষ্ট্য

সমাজতত্ত্বের জিজ্ঞাসা—(ক) শ্রেণী—(শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শাসক প্রভৃতির কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত)
(খ) বৃত্তি
(গ) শিক্ষা
(ঘ) পারিবারিক জীবন
(ঙ) ধর্ম
(চ) জাতি
(ছ) সামাজিক মর্যাদা
(জ) রাজনৈতিক মতবাদ
(ঝ) আমোদ-প্রমোদ, বিলাস ব্যসন

মনস্তত্ত্বের জিজ্ঞাসা—(ক) যৌন জীবন, নৈতিক মান
(খ) ব্যক্তিগত ইচ্ছা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা

(গ) আশাভঙ্গ, বড় আঘাত

(ঘ) মেজাজ

(ঙ) জীবন সম্বন্ধে মনোভঙ্গী

(চ) কোন গ্রন্থি বা বাতিক

(ছ) বহির্মুখী, অন্তর্মুখী বা উভয়মুখী

(জ) দক্ষতা (শিল্পে সাহিত্যে)

(ঝ) মস্তিষ্কের গুণ (কল্পনা, বিচার, বিশ্লেষণ)

(ঞ) বুদ্ধি-মাত্রা (I. Q.)

আসল কথা, প্রত্যেক চরিত্রের "bone structure" পৃথক এবং পৃথক ব'লেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারা সাড়া দিতে বাধ্য। এই কারণে, পরিস্থিতি এক হ'লেও দু'টি ব্যক্তি কখনই পুরোপুরি একভাবে আচরণ বা বুঝাপড়া করে না। রাম-সীতার সম্পর্কেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

রামের ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে রামের সামাজিক মর্যাদা অর্থাৎ রাম যে সমাজের লোক সেই সমাজের শ্রেণী বিন্যাসে রামের স্থান, তাঁর বংশাভিমান এবং তাঁর নৈতিক মান, রামের ট্র্যাজেডির জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। প্রথমতঃ রাম ক্ষত্রিয় এবং রাজা, এক কথায় সমাজের রক্ষাকর্তা বা অধিনায়ক। সাধারণ লোকের চেয়ে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশী। সাধারণ লোক যেখানে শুধু নিজ পরিবারের, রাজা রাম সেখানে সকল প্রজার দায়িত্ব বহন করেন। সুতরাং সকল প্রজার আস্থা তাঁর চাইই চাই। রাজার চরিত্রে প্রজার আস্থা যেখানে শিথিল, সেখানে রাজার শাসন করার অধিকারই পরোক্ষভাবে অস্বীকৃত হয়। এই কারণেই, রাজাকে রাজা থাকতে হ'লে, সর্বক্ষণে প্রজানুরঞ্জন করতে হবে এবং সাধারণ লোক যে পরিমাণে ব্যক্তি স্বার্থের গণ্ডী আঁকড়ে প'ড়ে থাকতে পারে, রাজা তা' পারেন না অর্থাৎ রাজার 'সামাজিক—সত্তা' অধিকতর প্রবল ও প্রধান না হ'য়ে পারে না।

তার সঙ্গে যদি বংশাভিমান এসে যুক্ত হয়, তা' হলে তো সোনায় সোহাগা। সত্যরক্ষার জন্য—'বহুজন হিতায়' আত্মত্যাগ করা যে বংশের চিরাচরিত ধর্ম, সেই বংশের সন্তানের পক্ষে দশের দাবী উপেক্ষা ক'রে সুখী হওয়া স্বাভাবিক নয়।

এ সব সত্ত্বেও সুখী হ'তে পারে সেই লোক—যার কোন নীতির বালাই নেই, স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির মূল্য যাঁর কাছে সামান্যই—ভোগ-সম্ভোগের বস্তু সম্বন্ধে কোন বাদ বিচার বা রুচি কিছুই নেই—কোন উপায়ে তৃষ্ণা মেটানোই যার কাছে বড় কথা। কিন্তু যাঁর নৈতিক মান অত্যন্ত উচ্চ, যে আদর্শবাদী—যে হৃদয়ের বা মস্তিষ্কের কোনও ব্যভিচার সহ্য করতে পারে, না, স্নেহ-প্রেম সত্য প্রভৃতির মূল্য ক্ষুণ্ণ হ'লে যে ব্যথা পায়, তার পক্ষে জীবনের সামঞ্জস্য হারিয়ে সুখী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সব ব্যক্তির জীবনে যখন ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন তা' এক মহা-সঙ্কটে পরিণত হয়। সে না পারে 'সামাজিক সত্তা'কে অস্বীকার করতে, না পারে ব্যক্তি সত্তার দাবী উপেক্ষা করতে।

রামের জীবনেও—দুই সত্তার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়ে মহাসঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। রামের সামাজিক-সত্তা চরিতার্থ—প্রজাপালনে রাজ্যরক্ষণে এবং কুল গৌরব বৃদ্ধিতে আর ব্যক্তি-সত্তা চরিতার্থ—দাম্পত্য-প্রেমে স্নেহ ভক্তি মমতায়। রাজ্যাভিষেকের পরেও সত্তা দু'টি নির্বিরোধে নিজ নিজ বাসনা পরিপূরণ ক'রে চলেছিল। কিন্তু একটি অতীত ঘটনা এসে, অদৃষ্টের মতো, রাম-সীতার জীবনকে মহাসঙ্কটের মুখে ঠেলে দিল। অপহৃতা এবং আবদ্ধা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিল। অবশ্যই এ সন্দেহকে একেবারে অহেতুক বলা চলে না। সাধারণের লোকের আর কি দোষ, লঙ্কায় স্বয়ং রামও সীতাকে প্রথমে সন্দেহের চোখেই দেখেছিলেন—বলেছিলেন—"তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছে···সীতা, তুমি দিব্যরূপা মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে

পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করে নি।" রামের মনেই যদি এতখানি সন্দেহ দেখা দিতে পারে তবে অযোধ্যার প্রজাদের দোষ কোথায়? যাই হোক, সীতার চরিত্র সম্বন্ধে এই লোকাপবাদ রাজারামের সামনে এক মহাসমস্যা রূপে উপস্থিত হ'ল। একদিকে, প্রয়োজন হ'লে প্রজানুরঞ্জনের জন্য—মাতা-ভ্রাতা পত্নী ত্যাগের সঙ্কল্প, অন্যদিকে অগ্নিপরীক্ষিত অপাপা এবং প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী সীতা। একদিকে কর্তব্যের আহ্বান—সামাজিক সত্তার দাবী, অন্যদিকে প্রেমের আহ্বান—ব্যক্তি সত্তার দাবী। রামের জীবনে চরম সঙ্কট—মহা অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত। সীতাত্যাগ রামের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার—আত্মহত্যারইনামান্তর; অন্যদিকে লোকাপবাদ অগ্রাহ্য করা, প্রজানুরঞ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করা—রাজ-সত্তা ত্যাগ করার সামিল। রাম অগত্যা কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হলেন। বশিষ্ঠ রাজ-কর্তব্যের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বলি দেওয়ার মন্ত্রণা দিলেন। সীতাত্যাগ অন্যায় বুঝেও, অগত্যা, রাম সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। বশিষ্ঠের নির্দেশ অমান্য করার মতো সাহস তাঁর ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শুধু বাইরের শক্তির চাপেই, রাম কর্তব্যের নামে বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করতে অগ্রসর হলেন। ভ্রাতা ভগিনীর ব্যাকুল অনুনয়েও তিনি টললেন না। কিন্তু মাতা কৌশল্যা কিছুতেই রামকে অন্যায় করতে—আত্মহত্যা করতে দেবেন না; মা হ'য়ে নতজানু হ'যে রামের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। রাম অগত্যা সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গের অনিবার্য অনুতাপে রাজা-রাম দগ্ধ হ'তে লাগলেন—সত্যভঙ্গের আত্মগ্লানিতে রাম নতজানু হ'য়ে ব্যাকুলভাবে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পতিপ্রাণা সীতার পক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য। সীতার প্রেম তো ছোট প্রেম নয়—'বিলাসের সম্ভাষণ' মাত্র নয়। বহু ক্লেশের বহু ত্যাগের নিকষপাষাণে এ প্রেম পরীক্ষিত। রাম যেমন সীতাকে অপাপা এবং প্রেমময়ী ব'লে

জানেন, সীতাও তেমনি রামকে প্রেমময় ব'লেই জানেন। সীতা কিছুতেই রামকে ছোট হ'তে দিতে পারেন না। নিজেই পতিসত্য রক্ষার জন্য অযোধ্যা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প জানালেন। তা'তে রাম নির্বাসনদায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'লেন বটে, কিন্তু নির্বাসনের মহা-সঙ্কট এড়াতে পারলেন না। রাম সীতাময় এবং সীতা রামময়; তবুও তাদের জীবনের মাঝে বিয়োগের দুর্ভেদ্য যবনিকা নেমে এল। দু'টি নিরপরাধ আত্মা অন্তর্দাহের তুষানলে নিক্ষিপ্ত হ'ল।

রামের অন্তর্দাহ—একদিকে প্রেমময়ী পত্নীর বিচ্ছেদে, অন্যদিকে বিনাদোষে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পাপ সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার অবিচারে এবং অন্যায়কে অন্যায় ব'লে বুঝেও, তার প্রতিবিধান করতে না পারার বেদনায়। রামের ট্র্যাজেডি—রাম যন্ত্রচালিতের মতো বশিষ্ঠের আদেশ পালন করছেন এবং করছেন এমন এমন কাজ যার সঙ্গে তাঁর কর্তব্যবোধের বা হৃদয়ের কোন যোগ নেই। শুধু যোগ নেই তাই নয়, যে কাজ করছেন তাঁকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা না ক'রে পারছেন না। হৃদয়বৃত্তির, এককথায় মানবতার, এই নিরুপায় অবদমনের অবস্থা অবশ্যই শোচনীয়। অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণার যাতনা অপেক্ষা, এই ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে,—হৃদয়ের সমস্ত স্পর্শ-কাতরতা ত্যাগ ক'রে—অসাড়ভাবে কর্তব্যপালনের নামে অকর্তব্য করা তথা তিলে তিলে অপমৃত্যু বরণ—কম শোচনীয় নয়। শূদ্রকবধ এই অসাড় কর্তব্যপালনজনিত অপমৃত্যুর চমৎকার নিদর্শন। X

কিন্তু আত্মহনন ক'রে কোন্ আত্মা শান্তি পাবে? উগ্র কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে রাম যতই হৃদয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করুন, উপবাসী হৃদয়ের হাহাকার বন্ধ করবেন—এমন শক্তি তিনি কোথায় পাবেন? হৃদয়ের জ্বালায় তাঁর 'উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, দীন শুষ্ক আঁখি, রুক্ষ কেশপাশ, পরিপাণ্ডু মুখ,—শীর্ণ দেহ'। মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন ছাড়া এ জ্বালা নির্বাপিত হবে না—তাই দেহপাত হ'লেই রাম যেন বাঁচেন। রাম আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছেন—অনন্ত প্রেমের

কি অবিচার করেছেন—প্রেমের কি অপমান করেছেন, সতীর প্রতি কি নৃশংসতা করেছেন। মনস্তাপের তাঁর শেষ নেই। চোখে ঘুম নেই। তন্দ্রা আসলেই সীতার মূর্তি এসে দাঁড়ায়—"স্থির শুষ্কহাস্যময়ী নীরব ভৎ'সনাসমা পাষাণপ্রতিমা"·· ···প্রাণ হুতাশে হু হু ক'রে উঠে· "মর্মে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে বৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণায়!" রামের মনে আজ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জেগেছে—'ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর? শান্তি চেয়ে চিন্তা বড়? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়?' কি কর্তব্য কি অকর্তব্য, কি ন্যায় কি অন্যায়, কি সত্য, কি মিথ্যা, কি ধর্ম কি অধর্ম—সন্দেহের আবর্তে সব তলিয়ে গেছে। তবু রাম তাঁর রাজসত্তাটিকে আঁকড়ে ধরে জীবন্মৃতের মতো কোনভাবে দিনযাপন করে চলেছেন।

কিন্তু বশিষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞ করার আদেশ দিয়ে নতুন এক সঙ্কটের সৃষ্টি করলেন। রাম সম্মতি জানাতেই বশিষ্ঠ বললেন—"এ যজ্ঞে শাস্ত্রীর প্রথা—স-সহধর্মিণী চাই অনুষ্ঠান, নহিলে নিষ্ফল যাগ"। যজ্ঞ স্থগিত করলে দেবগণ রুষ্ট হবেন। রাজ্য হবে শস্যহীন—'প্রজাগণ মরিবে দুর্ভিক্ষে', কিন্তু যজ্ঞ করতে গেলেও সহধর্মিণী চাই। আর এক উভয় সঙ্কট।

বশিষ্ঠ রামের কাছে আত্মত্যাগের নতুন দাবী তুললেন--দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে বললেন—রামের কাছ থেকে সীতার স্মৃতিটুকুও নির্বাসিত করতে চাইলেন। রামের ধৈর্য শেষসীমায় এসে পৌঁচেছিল—স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন--'পারিব না আর'। রাম এবার প্রকাশ্যে বশিষ্ঠের আদেশ অবহেলা করতে প্রস্তুত। বশিষ্ঠের মুখের 'পরেই বললেন—

——আর পারিবে না রাম।
ভস্ম কর, রুদ্ধ কর স্বর্গদ্বার—তাই যদি পরিণাম
তাই যদি শাস্তি তাহার—তথাপি জেনো ঋষিবর স্থির
শত ঋষিবাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুণ্যস্মৃতি জানকীর।'

শেষপর্যন্ত 'হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি'কে সহধর্মিণীর আসনে বসিয়ে যজ্ঞ করাই

স্থিরীকৃত হ'ল।

কিন্তু রামের মধ্যে বশিষ্ঠের আদেশ অবহেলা করার শক্তি আসলেও, নির্বাসিতা সীতাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা রামের মধ্যে দেখা যায়নি। প্রচলিত সংকীর্ণ সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, নিষ্ঠুর বিধির প্রতিকূলতা করবার, সীতার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হযেছে, তার প্রতিবিধান করবার তথা সামাজিক-সত্তা এবং ব্যক্তি সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবার উত্তম তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। তা'ই রামের অন্তর্দাহেরও নিবৃত্তি হযনি। 'সুখে নিদ্রা যায় পৌরজন, শুধু তার রাজার নয়নে নাহি সুপ্তি।' জাগ্রত তন্দ্রায় সীতার পাষাণ-প্রতিমা নীরব ভৎ'সনাসম বার বার উপস্থিত হয়েছে। রামের বক্ষে "অসীমা অসুপ্তি, অশান্তি, চিন্তা, অনন্ত তমসা ভীম হাহাকারপূর্ণ।" রাম 'তন্দ্রায় আবির্ভূ'ত' সীতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে প্রাযশ্চিত্ত করেছেন। তার বেশী কিছু করতে যাওয়ার যা অর্থ অর্থাৎ সীতাকে ফিরিয়ে এনে পূবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা অথবা প্রয়োজন হ'লে রাজত্ব ত্যাগ ক'রে সীতাকে নিযে আবার বনে যাওয়া—তা' করতে রাম প্রস্তুত ন'ন। সুতরাং অন্তর্দাহে দগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কি গত্যন্তর আছে? অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে বাল্মীকি যখন কুশীলবের পরিচয় দিয়ে, তাদের ন্যায্য পাওনা রাজ্যস্বত্ব ফিরিয়ে দেওযার জন্য এবং সীতাকেও সমর্পণ করার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন, তখনও রাম অভিমান এবং আত্মপীড়ন করতে বিরত হলেন না—বললেন—

—"না মহর্ষি। বিশ্ব ভিতরে
সবারই কলত্রপুত্রে আছে স্বত্ব. আছে অধিকার
কেবল রাজার নেই।"

দাম্পত্যজীবন যে প্রেমের ও কর্তব্যের সূত্রে আবদ্ধ বাল্মীকি রামকে সে সম্বন্ধে সচেতন করতে চেষ্টা করলেন,—রামকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

মেঘ সম পত্নী নহে পতির সম্পত্তিমাত্র, যবে

বাসনা রাখিবে, যবে বাসনা করিবে পরিহার
যেরূপ সুবিধা, রুচি, ইচ্ছা, কিংবা প্রবৃত্তি তোমার।

সীতা রামের পত্নী না হ'য়ে যদি সামান্য একজন প্রজা হ'তেন তা' হ'লেও রাজার কাছ থেকে তিনি শুদ্ধ সুবিচার দাবী করতে পারতেন। শুদ্ধ সুবিচার দান করতে রাজা বাধ্য। রাম বাল্মীকির যুক্তি অস্বীকার করলেন না, কিন্তু যুক্তি-অনুসারে কাজ করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। শেষপর্যন্ত বাল্মীকির যুক্তির কাছে বশিষ্ঠ পরাজয় স্বীকার করলে—'কর্তব্যের চেয়ে প্রেম বড়' এই সিদ্ধান্ত বশিষ্ঠ স্বীকার ক'রে সীতাগ্রহণে অনুমতি দান করলে—রামের সঙ্কট-জনক পরিস্থিতির অবসান ঘটল—সীতাগ্রহণের বাধা অপসারিত হ'ল।

বাল্মীকির আশ্রমে রাম-সীতার মধ্যে প্রত্যাশিত মিলন ঘটল। রাম-সীতার সমস্ত অতীত দুঃখকষ্ট অসীম সৌভাগ্যে বিলীন হ'য়ে গেল।

কিন্তু দেখতে না দেখতে এই সৌভাগ্য অন্তর্হিত হল। রাম-সীতার মিলনে দৈবই যেন প্রতিকূল। আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতে—ভূমিকম্পে, সীতা ভূগর্ভের মধ্যে পতিত এবং চিরতরে অন্তর্হিত হলেন। সুখের পূর্ণ সুধাপাত্র রামের অধরাগ্র স্পর্শ করতে না করতেই নিয়তি ছিনিয়ে নিয়ে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন—রামের দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হ'ল—দুঃখের আগুনে পূর্ণাহুতি পড়ল।

এবার রামের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—এই নাটকে নাট্যকার রামচরিত্রকে আলম্বন ক'রে—সামাজিক মানুষের চরম উভয় সঙ্কট এবং দ্বন্দ্বের রূপ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দুটো সত্তা দেখা যায়—একটা তার সামাজিক-সত্তা অর্থাৎ 'অহং' এর যে অংশ, সমাজের বিধি-নিষেধ আচার-বিচার মেনে চলাকে কর্তব্য ব'লে স্বীকার করেছে—সমাজের আর দশজনের সঙ্গে যে সব সামাজিক সম্পর্কে ব্যক্তি সম্পর্কিত আছে সেই সম্পর্কগুলিকে জীবনের সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য ব'লে মনে করেছে,—

অন্যটি ব্যক্তি-সত্তা, অর্থাৎ জীব হিসাবে ব্যক্তির যে মৌলিক বাসনা কামনা আছে, বিশেষ বিষয় আশ্রয় ক'রে সেই সব বাসনা চরিতার্থ করার সহজ প্রবৃত্তি। এই দুই সত্তার সামঞ্জস্যেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য। যেখানেই ব্যক্তি দু'এর একটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন, সেখানেই প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। এই সামঞ্জস্য নানাভাবে নষ্ট হতে পারে। ব্যক্তি-বাসনার সঙ্গে সমাজ বাসনার সংঘর্ষ মোটামুটি দুই অবস্থায় ঘটতে পারে—এক, প্রচলিত সমাজ-বিধানকে ব্যক্তি যখন মনে প্রাণে সত্য ব'লে স্বীকার করতে পারে না, সংকীর্ণদৃষ্টি সমাজের হস্তক্ষেপকে অন্যায় ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না, দুই—সমাজ-বিধানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যক্তি যখন সমতালে চলতে পারে না —সমাজের প্রগতিমূলক আচার বিচারকে অত্যাচার বা ব্যভিচার ব'লে মনে করে। এই বিরোধ তখনই সংকটে পরিণত হয়—যখন ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে--নিজের ইচ্ছার অনুকূল করতে অক্ষম হয় এবং সমাজের চাপে ব্যক্তিগত বাসনা-কামনাকে তার প্রেম বস্তুকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। রামের জীবনের যে-ট্র্যাজেডি—(সীতার সঙ্গে মিলন ঘটা পর্যন্ত যে ট্র্যাজেডি)—তাকে আমরা, আপাতদৃষ্টিতে, লসনের ভাষায়, "The agonized struggle of a weak will"—জনিত ট্র্যাজেডি বলতে পারি। সীতাকে লোকাপবাদ থেকে মুক্ত করতে তথা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশকে ব্যক্তি-স্বার্থরক্ষার অনুকূল করতে রাম উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করেন নি। সমাজ-প্রতিভূ বশিষ্ঠের কাছে ইচ্ছা শক্তি (will) সমর্পণ করার পর থেকেই, রাম শুধু অন্তর্দাহেই দগ্ধ হয়েছেন। প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম বলতে যা বুঝায় তেমন কোন সংগ্রাম তিনি করেন নি। সমাজ-বিধানের বা বশিষ্ঠবিধির বিরুদ্ধে অভিমান প্রকাশ—আর মনস্তাপে দগ্ধ হওয়া —এ ছাড়া নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি।

এখানেই প্রশ্ন উঠবে—তবে কি রামের ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার যোগ্যতা হয়নি? কেউ হয়ত বলতে পারেন—যদিও সমালোচক লসন বলেছেন—"The agonized struggle of a weak will, seeking to adjust itself to an inhospitable, environment, may contain elements of poignant drama". তবু তাঁর এ সিদ্ধান্তও স্মরণীয়—"But however weak the will may be it must be sufficiently strong to sustain the conflict. Drama can not deal with people whose wills are atrophied, who are unable to make decisions which have even temporary meaning, who adopt no conscious attitude toward events, who make no effort to control their environ-ment. The precise degree of strength of will required is the strength needed to bring the action to an issue, to create a change of equilibrium between the individual and the environment."

রামের এই "precise degree of strength" আছে কি? রাম সীতা-নির্বাসনের অন্যতম নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাক্রমে যেমন সীতা নির্বাসন ব্যাপারটি ঘটেনি, তেমনি তাঁর ইচ্ছায় সীতাগ্রহণও সম্ভব হয়নি। এক হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির ব্যাপারে ছাড়া রাম আর কোথাও তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। অবস্থার দীন দাস হ'য়ে রাম আচরণ ক'রে গেছেন। রাম চরিত্রে ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা কোথায়? বরং এই কথাই বলা চলে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে রামচরিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তাতে "Inefficient operation of the will"—এর চিত্রই বেশী ফুটেছে। এ কথা স্বীকার ক'রে নিয়ে, বলা যেতে পারে,—নাটক যেহেতু দৃশ্যাকারে জীবনের রসরূপ—রসরূপ ব্যক্ত হ'লে, ক্রিয়াশীল অথবা নিষ্ক্রিয় চরিত্রের সূত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব করা ছেলেমানুষি। "efficient operation of the will"—যেমন জীবনের রূপ, inefficient operation of the will—ও তেমনি জীবনেরই রূপ। রূপ যাহোক, তাকে রসোত্তীর্ণ ক'রে তোলাই বড় কথা। "A play lives by

its logic and reality" Gassner-এর এই কথাটি চরিত্র সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। পরিস্থিতি যদি বাস্তব হয়, পাত্র পাত্রীর কায়িক মানসিক বাচনিক আচরণ যদি সমুচিত এবং রসনীয় হয়, ত'াহলে—নায়কের সক্রিয়তা নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক করে লাভ কি ? রামের সঙ্কট ও দুঃখ দুর্ভোগের রূপ যদি রসনীয় হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সঙ্গে সঙ্গে রামও ট্র্যাজিক চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে, জন এস্ স্মার্ট মহাশয় 'ট্র্যাজেডি'-প্রবন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা' গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ; তিনি বলেছেন 'ট্র্যাজেডি' —বহুরকমের। তবে তাদের সামান্য ধর্ম—'element of calamity and suffering'। অবশ্য যে দুঃখকে দুঃখ ব'লেই মনে করে না—নির্বিকার চিত্তে স্বীকার ক'রে নেয়, তেমন দুর্বলস্বভাব ব্যক্তির ট্র্যাজেডি হয় না। · Tragedy involves reaction against calamity. The character who has been caught in the fatal snare struggles to escape, seeks to break through the net which is gathering about him, or if efforts unavailing, there is at least a reaction in the mind itself." রাম নিয়ন্ত্রিত বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছেন —জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি—একথা যত সত্য ; মানসিক প্রতিক্রিয়া (reaction in the mind) যথেষ্টমাত্রায় দেখিয়েছেন, এ কথাও তত সত্য। তারপর বহু বৎসরের মর্মান্তিক বিচ্ছেদের পরে পূর্ণ মিলনের মুহূর্তে আবার চিরতরে বিচ্ছেদ—অবশ্যই শোচনীয় ব্যাপার। যাঁর জীবনেই এমন ঘটনা ঘটুক, জীবনটিকে 'ট্র্যাজিক' না ব'লে উপায় নেই। এখানেই আরো একটি কথা বলার আছে এবং তা' বলা হয়েছে—রসনিষ্পত্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার প্রসঙ্গে। কতখানি নিষ্ক্রিয় ও নিরীহ হ'লে নায়ক 'ট্র্যাজিক' হ'তে পারবে না—এর মীমাংসা না করা পর্যন্ত, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না।

———

সীতা

রামের ট্র্যাজেডিকে, সংক্ষেপে এবং প্রধানতঃ, আমরা যদি ব্যক্তির সমাজ-সত্তার ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্কট এবং দ্বন্দ্বের ট্র্যাজেডি—সংকীর্ণ ও হৃদয়হীন সমাজ-বিধানের প্রবল চাপের তলে আত্মসমর্পিত ও অবনত, বিক্ষুব্ধ এবং অন্তর্দাহদগ্ধ প্রাণের ট্র্যাজেডি বলতে পারি, সীতার ট্র্যাজেডিকে আমরা বলতে পারি—মহৎ ভাবের (sentiment) বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে, নিরপরাধ জীবনের, স্বেচ্ছায় ভোগ-সুখে বঞ্চিত হওয়ার এবং চরম দুঃখ দুর্দ্দশা বরণ করার ট্র্যাজেডি। সীতার ট্র্যাজেডিকে আমরা সংক্ষেপে সেন্টিমেণ্ট-জনিত ট্র্যাজেডি—মহত্বের লাঞ্ছনার ট্র্যাজেডি—বলতে পারি। সীতার জীবনে—তাঁর সতীত্বে সন্দেহ অর্থাৎ লোকাপবাদ, চরম আঘাত এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু লোকাপবাদ সীতার জীবনে সঙ্কটের আকার ধারণ করেছে তখনই যখন তাঁর প্রাণসম রাম কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে সত্যভঙ্গ ক'রে মনস্তাপ ভোগ করেছেন সীতারই জন্য রাম মনস্তাপ ভোগ করবেন—প্রেমময়ী সীতা সহ্য করবেন কি ক'রে? সীতার প্রেম আত্মত্যাগ বিমুখ 'ছোট প্রেম' নয়,—তাঁর প্রেম সেই বড় প্রেম যা শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয় যে ভালবাসা আত্মত্যাগের দীক্ষা পায়নি—তা' কাম বা আসঙ্গলিপ্সার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি;—প্রেমের পর্যায়ে পৌছয়নি। সীতার ভালবাসা—'প্রেম'—রামের জন্য আত্মত্যাগে তা' প্রস্তুত।

রাম যেমন সীতার জন্য শেষ পর্যন্ত সত্যভঙ্গ করতে এগিয়ে গেছেন, সীতাও তেমনি রামের জন্য বনবাসে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন।

"পতিসত্য" রক্ষা করার জন্য সীতার আত্মত্যাগ করার এই সঙ্কল্পই, সীতার ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব দুঃখ দুর্ভোগ দেখা দিয়েছিল তাদের মূল নিমিত্ত-কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সীতার বনবাস-জীবনের যে দুঃখ দুর্ভোগ সব চেয়ে শোচনীয় হয়েছে তা' হচ্ছে—প্রথমতঃ বনবাস জীবনের সঙ্গে—

তাপসী জীবনের সঙ্গে—খাপখাওয়ানোর ব্যর্থ এবং করুণ সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ—সন্তানের কাছে পিতৃপরিচয় এবং আত্মপরিচয় না দিতে পারার মর্মান্তিক যাতনা—সন্তানের মর্মচ্ছেদী সন্দেহের কশাঘাতে মায়ের মর্মজ্বালা। আদর্শ নিষ্ঠার তথা সঙ্কল্পের প্রেরণায় সীতা বনে এসেছেন বটে, কিন্তু সঙ্কল্প ক'রে অতীত স্মৃতিকে তিনি মুছে ফেলবেন কেমন ক'রে?—হৃদয়ের সহজ আবেগকে নিরুদ্ধ করবেন কেমন ক'রে? সীতা তো মর্ত্যের মানুষ। এখানে যে সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী ব'সে শূন্যগৃহে দীর্ঘশ্বাস ফেলে! 'অতীত সুখ' এবং 'রাঘবের মুখ' ছাড়া আর কিছুই সীতার মনে জাগে না।]

—রাখিয়াছি চাপি এই ক্ষুদ্র
বক্ষে মোর ক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র;
শৃঙ্খলিত করিয়াছি মোর সব সাধ
শুষ্ক তপস্যায় তবু ভেঙ্গে যায় বাঁধ
অসতর্ক মুহূর্তে কখন, জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সে প্রেম, রুদ্ধ অশ্রুবারি ছোটে,

সীতা উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে নিজমুখে এ কথা না বলিলেও আমরা বুঝে নিতে পারি। বাসন্তীর সব সান্ত্বনা-বাণী ব্যর্থ ক'রে সীতা বাঁধভাঙ্গা আর্তনাদ করেন—

কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,
প্রিয়তম! কোথা তুমি?—পারিনে যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।

[যত গভীর যত আন্তরিক উভয়ের প্রেম, তত তীব্র তত অন্তর্দাহী বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। রামের প্রেমে যত একনিষ্ঠতা, সীতার প্রাণের কান্না তত উদ্বেলিত। সীতার মত পতি সোহাগ সৌভাগ্য কার আছে?

সীতার পতি-সোহাগ সৌভাগ্য বাস্তবিকই যে কোন নারীর ঈর্ষার বস্তু।

"যেই পতি স্নেহ থাকে নিরবধি, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহে, তুচ্ছ করি বিযোগ নিরাশ দুঃখ শত —অচল অটল স্থির পর্ব্বতের মত সেই পতিস্নেহ"—সীতার। সীতা এই দিক দিয়ে বড় ভাগ্যবতী। কিন্তু, সীতা কুশী-লবের জননীও বটেন। কুশী-লবের বর্তমান অবস্থা দেখে মায়ের প্রাণ স্থির থাকবে কেমন ক'রে? তাদের এই দীন অবস্থার জন্য দায়ী কে?—"অতুল বিভব সম্পদে রহিবে কোথা প্রাসাদে, ভূষিত রাজ-পরিচ্ছদে; কোথা তারা পরিহিত বল্কলে, কুটীরে, দীন নির্জ্জনে এখানে।"—সীতার এই আক্ষেপ অনিবার্য। এই আক্ষেপের চেয়েও মর্মান্তিক—মায়ের কাছে সন্তানের আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসার আঘাত এবং পরিচয় জানার পরে—"পুত্রের অশ্রুহীনা হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা"। এই ঘৃণার আঘাতের চেয়ে—"আর কি হইতে পারে পরে?"

আঘাতের উপর আঘাত আসে। যে পতিসোহাগ-সৌভাগ্যে সীতা বড় ভাগ্যবতী ছিলেন, সেই সৌভাগ্যের সম্বলটুকুও অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদ এসে কেড়ে নিয়ে যায়। আজ সবতোভাবে সীতা রিক্ত, সত্যই—"কোন্ রাজকন্যা রাজার গৃহিনী বীরমাতা হেন অভাগিনী। পরিত্যক্ত প্রতাড়িত যেন পথের কুক্কুর। তবু হেন কার পিতা, কার পতি, কার পুত্র?"

একদিকে 'পতির নিষ্করুণ কঠিন তাচ্ছিল্য,' অন্যদিকে শতগুণ কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা—এ মহাব্যাধির উপশম কোথায়? পতিসোহাগ-সৌভাগ্য ফিরে না এলে, এবং রাম কুশীলবকে পুত্র ব'লে গ্রহণ না করলে, এ ব্যাধির কোন প্রতিষেধ নেই।]

শেষ পর্যন্ত প্রতিষেধ সম্ভব হ'ল। ব্যাধির উপশম হ'ল—মিলনের সব বাধাই অপসারিত হ'ল। কিন্তু বিধাতা তখনও বাম। যার উপর মানুষের কোন হাত নেই এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ভূমিকম্পের কবলে প'ড়ে, সীতা ভূগর্ভে প্রাণ হারালেন—দুঃখিনীর জীবনে সুখের আলো জ্বলেই চিরতরে নিভে গেল।

সীতার এই পরিণতিতে এবং নাটকের এই উপসংহারে, বিশেষ এক তাৎপর্য—জীবনসংগ্রামের পটভূমির দিকে একটা উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। জীবনের পটভূমি—প্রকৃতি ও সমাজ। প্রকৃতি এবং সমাজ—এই দুই শক্তি-ক্ষেত্রের বুকে মানুষের জীবন-যাপনের লীলা বা সংগ্রাম চলেছে। জীবনের উপর যেমন সমাজের নানা বিধি নিষেধের বা সংস্কারের প্রভাব কাজ করছে, তেমনি সেখানে প্রাকৃতিক ঘটনারও বেশ খানিকটা প্রভাব রয়েছে। আমাদের জীবন শুধু সমাজেরই নিষেধ নিয়ন্ত্রিত নয়, প্রাকৃতিক ঘটনারও অধীন। সীতার ট্র্যাজেডিতে, নাট্যকার সমাজের এবং নিয়তিরূপা প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থ এবং নিরুপায় সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

তবে নাট্যকারের এই চেষ্টা কতখানি তাঁর সংজ্ঞান পরিকল্পনার ফল, এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ জাগতে পারে, তেমনি, এই চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে, সে-বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। মানুষের জীবনদ্বন্দ্বকে, প্রাকৃতিক শক্তির অনির্দ্দেশ্য রহস্যময়তার পটভূমিতে এবং সামাজিক বাধা-নিষেধের বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের পটভূমিতে রূপ দিতে হ'লে যে পরিমাণে বিশ্বপ্রকৃতি সচেতন এবং সমাজ-সচেতন ক'রে চরিত্রসৃষ্টি করা দরকার, এখানে তার বিলক্ষণ অভাব রয়েছে। নিয়তির উল্লেখ দু'একবার করা হয়েছে একথা ঠিক বটে, কিন্তু এ কথাও ঠিক, তা'তে বিশ্বরহস্যের পটভূমি স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেনি। তা' উঠেনি ব'লেই, সীতা-নাটক পড়ার সময় অদৃষ্টরহস্য-ঘেরা জীবনের ব্যর্থ সংগ্রামের রূপ স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয় না। ভূমিকম্পের আকস্মিক উৎপাত, শেষ-মুহূর্তে, সামাজিক অস্তিত্বের বাইরে—সমাজ-সত্তারও পিছনে—যে বিশ্বপ্রকৃতি রয়েছে সেই প্রাকৃতিক সত্তার প্রভাবের দিকে মনটাকে উৎক্ষিপ্ত করে বটে, কিন্তু উৎক্ষেপ ঐ ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক এবং অল্পক্ষণস্থায়ী।

তারপর—উপস্থাপনা-গত উৎকর্ষ-অপকর্ষের কথা। ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র, রস, সংলাপ প্রভৃতি উপাদানকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করবার প্রথা যা'ই থাক, এ কথা মানতেই হবে—কোন উপাদানকেই, নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করা যায় না। পরিস্থিতি কল্পনা থেকে চরিত্রকে অথবা চরিত্র থেকে সংলাপকে এবং রসকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সাধারণ সূত্র করলে এমনি একটা সূত্র করা চলে—পরিস্থিতি-কল্পনা যত বাস্তবানুগ হয়, চরিত্রের ভিত্তি অর্থাৎ সামাজিক সংস্থিতি তত দৃঢ় হয় এবং চরিত্রের কায়িক-মানসিক-বাচনিক আচরণ যত বাস্তবকল্প হয়, তত তার আবেদন অবিসংবাদী হয়—রস তত গাঢ় হয়, এককথায় সামগ্রিকভাবে সৃষ্টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গ্যাসনার মহাশয়ের—"A play lives by its logic and reality"—উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তাঁর মন্তব্যে সায় দিয়ে বলা যেতে পারে—ঔচিত্য এবং বাস্তবতার মধ্যেই নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত থাকে এবং এই দুই মৌলিক গুণের সদ্ভাবেই নাটক বড় নাটকে পরিণত হয়। পরিস্থিতির বাস্তবিকতার এবং চরিত্রের আচরণের ঔচিত্যের মাত্রার উপরেই নাটকের গুরুত্বের মাত্রা নির্ভর করে। কারণ ঔচিত্য পরিপোষণ করে বাস্তব-চেতনাকে, বাস্তব-চেতনা নিয়ন্ত্রিত করে লঘু-গুরুবোধ বা মনোভঙ্গীকে এবং মনোভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করে রসের প্রকৃতিকে ও তীব্রতাকে।

এই কারণেই, ট্র্যাজেডি বা ট্র্যাজেডি-জাতীয় গুরু-গম্ভীর রচনার জন্য সার্বভৌমিক ঔচিত্য এবং বাস্তবতা এত বেশী অত্যাবশ্যক।

সীতা-নাটকে এই সার্বভৌমিক ঔচিত্যের তথা বাস্তবতার দৈন্য আছে। পরিস্থিতি-কল্পনা এবং চরিত্রের আচরণ—আঙ্গিক, বাচনিক ও সাত্ত্বিক অভি-ব্যক্তি, সবক্ষেত্রে আমাদের বাস্তবতা-বোধ ও ঔচিত্যবোধকে তৃপ্ত করে না। প্রথম দুই অধ্যায়ে আমি ঔচিত্যহানির স্থলগুলি যথাসম্ভব নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি; কৌতূহলী পাঠক অবশ্যই সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর

জিজ্ঞাসাকে চরিতার্থ করবেন। এখানে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, সামাজিক ও নৈতিক আবেষ্টনীকে যে পরিমাণে পরিস্ফুট রূপ দিলে পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন জাগে না, এবং পাত্র পাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণকে যে পরিমাণে সহজ ও স্বাভাবিক করলে, ঔচিত্য-বোধ ষোল আনা বজায় থাকে, তা' এখানে সন্তোষজনক মাত্রায় পাওয়া যায় না। ফলে, নাটকের সামগ্রিক গুরুত্ব—শিল্পগত উৎকর্ষ--রসনিষ্পত্তির উৎকর্ষ বেশ হ্রাস পেয়েছে।

রসনিষ্পত্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিচারের কথা উঠলে কেউ হয়ত বলবেন—রাম-সীতাকে অবলম্বন ক'রে ট্র্যাজেডি-রস যে প্রত্যাশিত মাত্রায় সুনিষ্পন্ন হয়নি, তার কারণ ঔচিত্য ও বাস্তবতার দৈন্য নয়, তার কারণ রাম-সীতার নিরীহ স্বভাব—ইচ্ছাশক্তির বা সঙ্কল্পের অদৃঢ়তা, এককথায়--নিরীহ নিষ্ক্রিয়তা। এই আপত্তির সম্যক উত্তর দিতে হ'লে --নিরীহ (innocent) ও নিষ্ক্রিয় (inactive) নায়কের ট্র্যাজেডি হ'তে পারে কি না, হ'তে পারলে কোন্ অবস্থায় হ'তে পারে—এই সব প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে নাট্যতত্ত্ব শাস্ত্রে যে আলোচনা আছে তা' থেকে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হ'লেও, অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অবশ্যই উদ্ধার করা যায় এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে—বিশেষ অবস্থায় নিরীহ ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার কোন বাধা নেই। যেখানে ব্যক্তির ভিতরকার সংস্কার ও স্বভাব এবং বাইরের অর্থাৎ সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে শক্তিপরীক্ষা হওয়ার ফলে ব্যক্তির মধ্যে নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পায়—ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়া করতে গর্হিত কোন-কিছু করতে বিরত হ'য়ে, নিজের সঙ্গে নিজে বুঝাপড়া করতে করতে ক্ষয় পেতে থাকে—মর্মদাহে তিলে তিলে দগ্ধ হয়, সেখানেও জীবনের ট্র্যাজেডির রূপই ব্যক্ত হয়। আদর্শবাদের বা মানবতার মহিমা যতক্ষণ তাঁকে পরিত্যাগ না করে, বিলীয়মান জীবনের রশ্মি তার

অনুরাগ নিয়ে যতক্ষণ তাকে বেষ্টন ক'রে থাকে, ততক্ষণ তাঁর ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। এ কথা ভুলে গেলে ভুলই হবে—নাটক লোকবৃত্তানুকরণম্, লোকবৃত্তে আমরা জীবনের মহা-সঙ্কটের, দুঃখদুর্ভোগের ও বিপত্তির যে রূপ দেখি, সেখানে যেমন দেখি সক্রিয় ব্যক্তিকে তেমনি দেখি—

নিষ্ক্রিয়—এমন কি অতিনিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকেও। উদগ্রপ্রবৃত্তিসম্পন্ন দৃঢ়সঙ্কল্প ও উদ্যমী ব্যক্তির অভিচারী বাসনা, বাসনাপূরণের ব্যর্থ সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখে আমাদের যেমন ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগে,—সঙ্কটের দ্বারা পরিবেষ্টিত সৎ, আদর্শবাদী সংগ্রামী পুরুষের আদর্শরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম, সংগ্রামের ব্যর্থ পরিণাম, জীবনের শোচনীয় পরিণতির রূপ দেখে আমাদের মনে যেমন ট্র্যাজেডি-বোধ জাগে তেমনি, অতিসৎ, আদর্শবাদী নিরীহ এবং নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকেও নিরুপায়ভাবে দুঃখদুর্ভোগ করতে দেখে—অপরাধহীনতার অপরাধে শাস্তিভোগ করতে দেখে; প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে অগত্যা আত্মসমর্পণ করতে দেখে, ট্র্যাজেডি-বোধই জাগে। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, প্রতিকূল পরিবেশকে আক্রমণ করার মধ্যে—উদ্যমশীল প্রতিরোধের সংগ্রামের মধ্যে ইচ্ছার যে শক্তিরূপ ব্যক্ত হয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে—সঙ্কটের কাছে অগত্যা আত্মসমর্পণ করার মধ্যে শক্তির সেই রূপটি প্রকাশ পায় না, কিন্তু তা' ব'লে এ কথাও ঠিক নয় যে, নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতামাত্রেই শক্তিহীন এবং হেয়। চপলতায় বা বিক্ষোভে শক্তির যে ক্রিয়াচঞ্চল রূপ তা' হয়ত সেখানে থাকে না, কিন্তু স্থৈর্য ধৈর্য-সহিষ্ণুতায় শক্তির যে স্থির-সংযত রূপ, তা' অবশ্যই থাকতে পারে। ভোগের উদ্দাম ও ঐশ্বর্য যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি ত্যাগের অকিঞ্চনতা ও দুঃখভোগ কম মহিমান্বিত, কম চিত্তাকর্ষক নয়।

তারপর—যে কথা আগেই বলেছি—ট্র্যাজেডি বিশেষ একজাতীয় রস—বিশেষ একটি ভাবের আস্বাদন। এই ভাবটি ব্যক্ত হওয়াই, অর্থাৎ বিভাব-

অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ট্র্যাজেডি-সংবিদ্ জাগাই বড় কথা। পরিস্থিতি, নায়ক, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ "উপায়", "উপেয়" হচ্ছে রস। এই রস নিষ্পন্ন হয়েছে কি না এইটেই প্রধান বিবেচ্য। সঙ্কটের রূপ, সংঘর্ষ ও সংগ্রামের রূপ, পাত্র-পাত্রীর আচরণের রূপ, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভিন্ন হ'তে বাধ্য—কিন্তু সব ভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যটুকু পাওয়া যায়—তাকে অতি সংক্ষেপে বলা চলে—নিরুপায় ও ব্যর্থ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, নিরুপায় দুঃখভোগ ও শোচনীয় পরিণামের ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর আর্তি ও অস্তিত্ব-রহস্যকে ব্যক্ত করা। এই জীবনতৃষ্ণার বা আর্তির তীব্রতা এবং শোচনীয় পরিণতির বেদনা-গভীরতা তথা জীবনের অস্তিত্ব-রহস্য যতখানি ব্যক্ত হয় ততখানিই ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব। এত কথা বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, উদ্দেশ্য—শুধু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—নায়কের দ্বন্দ্বপরায়ণতার মাত্রা নিয়ে পাঠক যাতে অযথা বাদ্-বিসংবাদ করতে না যান, সেই বিষয়ে একটু সতর্ক ক'রে দেওয়া। 'পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম'—কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে, পদে পদে ভুল করার সম্ভাবনা আছে—এ কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতির জটিলতা অনুসারেই, সংগ্রামের রূপ ও তীব্রতা বেশীকম হয় এবং এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হ'তে পারে যেখানে পাত্র-পাত্রীর সংগ্রাম প্রায় আরম্ভেই শেষ হ'য়ে যায়; আর তা' হয় পাত্র-পাত্রীর দুর্ব্বলতার বা সংগ্রাম-বিমুখতার জন্য নয়; হয়—পরিস্থিতির জটিলতার ও অনিবার্যতার জন্য—অপ্রস্তুত আবির্ভাবের জন্য এবং যার বিরুদ্ধে দৈহিক বল বা বুদ্ধিকৌশল—শৌর্যবীর্য কোন কাজে লাগে না এমন এক অশরীরী আক্রমণের জন্য। এরূপ পরিস্থিতি নিয়তির মতোই দুর্বার—নিয়তির মতোই অমোঘ। শ্রেষ্ঠ পুরুষকারকেও এরূপ পরিস্থিতিতে নিরুপায়ভাবে, যাকে বলে 'প'ড়ে মার খাওয়া' তাই খেতে হয়। হিমালয়ের বাধা, সাতসাগরের বাধা, অস্ত্রবল বা ধনবলের বাধা—শৌর্যবীর্য দিয়ে যে সব বাধা অতিক্রম করা যায়, পুরুষকার

তা' অতিক্রম করতে পারে কিন্তু যে বাধা অদৃশ্য অথচ অমোঘ, যেবাধা সামান্য একটা বিশ্বাসের রূপ ধ'রে মনের বাসা বেঁধে থাকে, যে বাধা হৃদয়ের, সে বাধা করবে—লঙ্ঘন করবে, কে এবং কোন্ পুরুষকার দিয়ে ?

রামকে এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে—অশরীরী লোকাপবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, নিরুপায়ভাবে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এই অশরীরী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, ব্রহ্মাস্ত্রের-অধিকারী হ'য়েও, রাম কোন অস্ত্রই প্রয়োগ করতে পারেন নি। অদৃশ্য অথচ অনুপেক্ষণীয় যে শত্রু, তার হাতে নিরুপায় লাঞ্ছনা ভোগ করতেই হবে—রামকেও তা' ভোগ করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া রাম আর কিছুই করতে পারেন নি। অগত্যা পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেই তাকে তিলেতিলে অন্তর্দাহে দগ্ধ হ'তে হয়েছে। এই ধরণের নিরুপায় আত্মসমর্পণ এবং নিষ্ক্রিয় অসাড়তা নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি-নায়ক হওয়ার যোগ্যতা নষ্ট করে না। নিষ্ক্রিয়তা যেখানে অনিবার্য এবং স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়—নিষ্ক্রিয়তা যেখানে চরিত্রের নৈতিক সত্তার মহিমার অভিব্যক্তি হ'য়ে প্রকাশ পায়, সেখানে নিষ্ক্রিয়তা নিশ্চয়ই ট্র্যাজেডিরসের পরিপন্থী নয়। নিষ্ক্রিয়তা যেখানে মহত্ত্বের অপঘাত, মহত্ত্বের অপচয়, মহত্ত্বের লাঞ্ছনা—মানবমহত্ত্বের বিপত্তিও বিনষ্টি অভিব্যঞ্জিত করে, সেখানে তা' উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজেডিরই উপাদান হ'তে পারে ?

রামের মধ্যে, সীতার ট্র্যাজেডিতেও—নিরুপায় দুঃখদুর্দ্দশা ভোগের মধ্যে, মহত্ত্বের চরম লাঞ্ছনার ট্র্যাজেডিই ব্যক্ত হয়েছে। এ কথা আগেই ব'লে এসেছি—'সীতা'-নাটকের সীতা বাল্মীকির সীতার মতো সম্পূর্ণ "innocent" নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে এবং বনবাসের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত তাঁর নিজেরই। অবশ্য একথা বলার তাৎপর্য এ নয় যে সীতা 'bad'। সীতার ট্র্যাজেডির মূলে তাঁর 'Self-willed passion' অর্থাৎ পতি-

প্রেমের আতিশয্য রয়েছে, এ কথা ঠিক বটে কিন্তু এ কথাও ঠিক—পতি-প্রেমের ঐকান্তিকতাকে নিশ্চয়ই যথার্থ 'দোষ' বলা চলে না। গুণের আধিক্যকে যদি দোষ বলা চলে তবেই সীতা দোষী, –'flawless'-ন'ন। কিন্তু নৈতিক গুণপণার দিক দিয়ে সীতা শুধু তো "good"-শ্রেণীর চরিত্রই নয়, সীতা রীতিমত—"too good"-শ্রেণীর চরিত্র।

এতখানি চরিত্রমাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও, পরিস্থিতির চক্রে প'ড়ে সীতা শোচনীয় দুঃখভোগ ভোগ করেছেন। পরিস্থিতিই যেন সীতার জীবনে নিয়তি হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সীতা কি দিয়ে সংগ্রাম করবেন? অতীতজীবনকে—রাবণকর্তৃক অপহৃতা সীতাকে, লঙ্কায় অবরুদ্ধা সীতাকে, 'মহিষী-সীতা' জীবন থেকে মুছে ফেলবেন কি ক'রে? দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া লোকাপবাদের কণ্ঠরোধ করবেন তিনি আর কোন্ উপায়ে? লোকাপবাদের সামনে ব্রহ্মাস্ত্রধারী, রাবণ-বিজয়ী রাম যেমন নিরুপায়, সীতাও তেমনি নিরুপায়। উভয়ের ভাগ্যেই ট্র্যাজেডি অনিবার্য। কারণ রাজা রামকে স্বমহিমা থেকে ভ্রষ্ট না ক'রে লোকাপবাদ-লাঞ্ছিত সীতার পক্ষে অযোধ্যায় থাকা এবং রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব নয়। স্বেচ্ছায় বনে না গেলেও, জীবনের শোচনীয় পরিণতি তিনি এড়াতে পারতেন না। রামকে ছেড়ে যাওয়ায়, এবং ছেড়ে থাকায় যেমন ট্র্যাজেডি —আবার রামকে আঁকড়ে থাকারও তেমনি ট্র্যাজেডি,—অবশ্য ভিন্ন ধরণের ট্র্যাজেডি। এই উভয় সঙ্কটরূপী পরিস্থিতির হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। যত অপরিহার্য, তত দুর্নিবার এই পরিস্থিতি। এই ধরণের সংগ্রাম-ব্যর্থ-ক'রে-দেওয়া পরিস্থিতির আবর্তে প'ড়ে যখন কোন বহুগুণাধার মহাপ্রাণ ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় ভাবে মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ভোগ করে, দুঃখ-দুর্দ্দশার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে শোচনীয় পরিণতির তলে তলিয়ে যায়, তখন ব্যক্তির সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ট্র্যাজেডি-সংবিদ জাগে।

অতএব নিষ্ক্রিয়তার যুক্তি তুলে রাম-সীতার ট্র্যাজেডি-নায়কত্ব নাকচ করবার কোন যুক্তিযুক্ত এবং শাস্ত্রসম্মত কারণ নেই। ট্র্যাজেডি রস খুব ভাল জমেনি—এ কথা ঠিক বটে, কিন্তু না জমার কারণ—রাম-সীতার নিষ্ক্রিয়তা নয়, না জমার কারণ পরিস্থিতির বাস্তবতার (reality) এবং চরিত্রের আচরণ ঔচিত্যের (logic) ত্রুটি। বলা বাহুল্য, রস খুব ভালভাবে না জমা এবং রসোত্তীর্ণ না হওয়া এক কথা নয়—যেমন, দেহে প্রাণসারের দৈন্য এবং প্রাণহীনতা এক কথা নয়।

আ[illegible]মগীর নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান

নিম্নের আলোচনা শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের

History of Aurangzib (Vol—III)

অবলম্বনে লিখিত

যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরেই (১৬৭৮ খ্রীঃ, ২৮শে নভেম্বর, ১০ই পৌষ, ১৭৩৫ সাল) ঔরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মাড়োয়ার অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে আজমীর পৌঁছিলেন এবং খান-ই-জামান এবং তাহির বেগকে যোধপুরে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এই সময় লাহোর হইতে সংবাদ আসিল—যশোবন্ত সিংহের দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে; কিন্তু ঔরঙ্গজেবের নীতির কোন পরিবর্তন হইল না—মাড়োয়ারে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

তখন মাড়োয়ারের রাঠোর বীরগণ যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহের দাবী উপস্থাপিত করিতে দিল্লী গমন করিলেন কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হইল না। ঔরঙ্গজেব মাড়োয়ারের অধিকার ইন্দ্র সিংহকে দান করিলেন (২৬শে মে, ১৬৭৯)। রাঠোর বীরগণ হৃতমান ও প্রত্যাখ্যান হইলেন বটে, কিন্তু মনের তেজ একটুও হারাইলেন না, দুর্গাদাসের নেতৃত্বে তাহারা মোগল সৈন্যের অগণ্য সংখ্যার দৃঢ় ব্যূহ ভেদ করিয়া দিল্লী হইতে অজিত সিংহকে ছিনাইয়া লইয়া আসিলেন। এই সংবাদ মাড়োয়ারে পৌঁছাতেই রাঠোর বীরগণ কঠোর আক্রমণে মোগলদিগকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। মোগল প্রতিনিধি দিলদার খান নাগোরে পলাইয়া গেলেন—'মৈর্ত্তা' ও 'শিওনা' মোগলের গ্রাস হইতে মুক্ত হইল।

এইভাবে মুখের শিকার ছুটিয়া যাওয়ায় ঔরংজীব যত স্তম্ভিত, তত ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। সরবুলন্দ খানের অধীনে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং এক পক্ষ পরে নিজেই তিনি আজমীরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে সৈন্য আনিয়া বলবৃদ্ধি করিতে এবং মোহম্মদ আকবরের নেতৃত্বে এবং তয়ব্বর খানের নায়কত্বে অভিযান চালাইতে লাগিলেন। একটী খণ্ড যুদ্ধের পরেই রাঠোরগণ গেরিলা-যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

ঔরংজীব মাড়োয়ারে অত্যাচার ও পীড়নের তাণ্ডব তুলিলেন। উদয়পুরের মহারাণা কোন মতেই উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। অজিত সিংহের মাতা একে মেবারী কন্যা, তারপর আশ্রয়প্রার্থিনী, মহারাণা অজিতকে আশ্রয় দিলেন এবং অবশ্যম্ভাবী মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য শক্তি সংহত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ উদয়পুরের সহিত ঔরংজীবের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া গেল।

১৬৭৯ খ্রীঃ ঔরংজীব উদয়পুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাসান আলি খান সাত হাজার অগ্রগামী সৈন্যসহ প্রধান সেনাবাহিনীর জন্য পথ প্রস্তুত করিতে রাণার রাজ্যে প্রবেশ এবং আনুষঙ্গিক লুটপাট করিতেও লাগিলেন। রাণা দেখিলেন, সমতল ক্ষেত্রে মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া আর আত্মক্ষয় করা একই কথা। এই কারণে তিনি সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রজাদের সরাইয়া পার্ব্বত্য দুর্গের মধ্যে লইয়া গেলেন। 'দোবারী' গিরিপথ হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত প্রদেশ বাদশাহের হস্তগত হইল—এক রকম বিনা যুদ্ধেই পরিত্যক্ত উদয়পুর নগরী মোগলগণ অধিকার করিল (৪ঠা জানুয়ারী, ১৬৮০) এবং বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

হাসান আলি খান রাণার অনুসন্ধানে পার্ব্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিখোঁজ হইয়া গেলেন। মোগল-শিবিরে দারুণ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কেহই সাহস করিয়া ভিতরে যাইতে চাহে না—এমন অবস্থা। জনৈক তুরানী

সহ সেনাপতি মীর সিহাবুদ্দীন অতি সাহসে ও কৌশলে হাসান আলি খানের সন্ধান উদ্ধার করিলেন। হাসান আলির সৈন্যবল আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইলে তিনি মহারাণার শিবির আক্রমণ করিলেন এবং উদয়পুরের ১৭৩টী মন্দির ধ্বংস করিলেন। অন্যদিকে "চিতোর"ও মোগল-অধিকৃত এবং তথাকার ৬৩টী মন্দির ধূলিসাৎ হইল। মেবারের শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছে মনে করিয়া ঔরংজীব (২২শে মার্চ্চ) আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই মনে করাই ঔরংজীবের হিসাবের বড় ভুল। মেবার ও মাড়োয়ারের মধ্যে যে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী তাহাই ছিল মহারাণার প্রধান ঘাঁটি। মহারাজের বড় সুবিধা ছিল এই যে তিনি ইচ্ছামত পূর্বে বা পশ্চিমে যে-কোন দিকে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু মোগল পক্ষে উদয়পুর, রাজসমুদ্র ও দেওসুরি এই তিনটী প্রবেশপথ অধিকার না করা পর্য্যন্ত মাড়োয়ার এবং মেবারের সহিত সংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল।

মোগলগণের সম্মুখে সংযোগ রক্ষার সমস্যা বড় সমস্যা। ঔরংজীব আজমীরে ফিরিয়া যাইতেই রাজপুতগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং চারিদিক দিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। আকবরের শিবির একদিন হঠাৎ আক্রান্ত হইল, মহারাণা পার্বত্য শিবির হইতে অবতরণ করিয়া "বেদনোর" জিলায় অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন, এমন কি, আজমীরের সহিত আকবরের সংযোগপথ বন্ধ হয় হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। মোগল শিবিরে মহাতঙ্ক দেখা দিল। আকবর মহারাণার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভীমসিংহ ঝড়ের মত এক এক স্থানে আক্রমণ করিয়া মোগল সৈন্য নষ্ট এবং শিবির বিশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন এবং মোগল-সেনাপতিরা ভয়ে অসাড় হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন ('Our army is motionless through fear'—so Akbar complains)। ক্রোধে ও ক্ষোভে ঔরংজীব অস্থির হইয়া আকবরকে মাড়োয়ারে সরাইয়া দিলেন এবং কুমার আজমকে

চিতোরে অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল—পূর্ব হইতে আজম দোবারি গিরিপথে, উত্তর হইতে মোয়াজ্জম সমুদ্রপথে এবং পশ্চিম হইতে আকবর দেওসরি গিরিপথে আক্রমণ চালাইবেন। কিন্তু আজমের ও মোযাজ্জমের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং আকবর কিছু কাল যাইতে না যাইতেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিলেন।

মাড়োয়ারে যাইয়া আকবর 'সোজাত'-এ ঘাঁটি করিলেন এবং 'নাদোল' (গঙ্গোযার জিলার প্রধান সহর) অধিকার করিয়া সেখান হইতে সৈন্যাধ্যক্ষ তহব্বর খাঁকে দিয়া 'দেওসুরি' পথে কমলমীর প্রদেশ অধিকার করিবার পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ মোগলদের প্রাণে এমন আতঙ্ক সঞ্চারিত করিয়াছিলেন যে তহব্বর খাঁ "নাদোল" যাইবার পথে "খারোয়া"তে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। বার বার তাগিদের পর তহব্বর 'নাদোল' পর্য্যন্ত পৌছিলেন বটে, কিন্তু গিরিপথে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন। আকবর গিরিপথে প্রবেশ করিতে কঠোর আদেশ দিলেন। অগত্যা তহব্বর খাঁ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ভীমসিংহের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল (ঈশ্বর দাসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। ইহার পরেই আকবরের এবং তহব্বর খাঁর মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল—তহব্বর খাঁর মাধ্যমে রাজসিংহের সহিত আকবরের কূটনৈতিক সংযোগ স্থাপিত হইল। ১৬৮০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে তহব্বর খাঁ বেশ ঢিল দিলেন, তাঁহার না ছিল কোন উৎসাহ, না ছিল কোন ঐকান্তিকতা। ইতিমধ্যে মহারাণা রাজসিংহ (১৬৮০, ২২শে অক্টোবর) দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই অস্ত্র ত্যাগ করিল না। ঔরংজীবের কড়া তাগিদে আকবর ও তহব্বর খাঁ গিরিপথে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন, যুদ্ধও করিলেন এবং ঝিলওযারা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াও লইলেন (২২শে নভেম্বর), কিন্তু ১৬৮১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী আকবর রাজপুতগণের সহিত মিলিত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, নিজেকে

সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং রাজমুকুট ছিনাইয়া লইতে আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তবে যাত্রার ফল ভাল হইল না; আকবর না ছিলেন কৌশলী, না ছিলেন একাগ্র উদ্যমী। ফলে নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, আর বিদ্রোহী ও বিভ্রান্ত তয়ব্বর খাঁ মোগলপক্ষে যোগ দিতে যাইয়া নিহত হইলেন।

এই সময়ে, উভয় পক্ষই সন্ধির জন্য উদগ্রীব হইয়াউঠিয়াছিল। বিকানীরের শ্যামসিংহ মধ্যস্থ হইয়া (১৪ই জুন, ১৬৮১) কুমার আজমের সহিত দেখা করিলেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি-সেতু স্থাপন করিলেন। বাদশাহ ঔরংজীব নতুন মহারাণা জয়সিংহের নিকট 'শোকপরিচ্ছদ' পাঠাইয়া মহারাণা রাজসিংহের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং সন্ধির দুইমাস পরে বীর ভীমসিংহ সম্রাট ঔরংজীবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে গেলেন ও মোগলের অধীনে কার্য্যও গ্রহণ করিলেন। ঔরংজীব ভীমসিংহকে রাজা উপাধি দিয়া আজমীরে স্থাপিত করিলেন।

নিম্নে লিপিবদ্ধ ইতিহাস টড সাহেবের রাজস্থান হইতে গৃহীত, কিন্তু
ইহা রাজস্থানের আক্ষরিক অনুবাদ নহে।

যখন রাজসিংহ ১৬৫৪ খ্রীঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন সম্রাট সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন এবং তাঁহার পুত্রগণ সেই সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে শক্তি-সংগ্রহে ও ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। দারা, সুজা, ঔরংজীব ও মোরাদ প্রত্যেকেই রাণা রাজসিংহকে পক্ষে টানাটানির জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন, কারণ প্রত্যেকেই জানিতেন রাজপুতশক্তি যাহার পক্ষে যোগ দিবে, তাহারই ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শেষ পর্য্যন্ত রাণা দারার পক্ষে যোগ দিলেন, কিন্তু দারার ভাগ্যকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। ঔরংজীবের ভাগ্যের জোর এত বেশী ছিল যে, সমস্ত সংহত শক্তি বার বার পরাজিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত ঔরংজীবই সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৬৫৯)।

এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পরে, ঔরংজীবের দুর্নীতির ফলে রাজসিংহকে সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল। কয়েকটী ঘটনা এমন ভাবে সন্নিপাতিত হইল যে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে অসি নিষ্কোষিত করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকিল না। ঘটনাগুলি এই—

কাবুলের অন্তর্গত জামরুদে যশোবন্ত সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যে জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে ঔরংজীব রাজপুত দমনের গোপন ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৬৭৯, ২রা এপ্রিল তিনি সমস্ত হিন্দুর উপরে 'জিজিয়া কর' ধার্য্য করিলেন এবং ৫ই জুলাই যশোবন্তের শিশুপুত্র অজিত সিংহকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। আরে একটী ঘটনা এই সময়ে ঘটিয়াছিল। মোগল বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর পাণিপীড়ন (প্রাণপীড়ন ছাডা কি) করিবার আগ্রহে কন্যাটীকে আনিবার জন্ম দুই হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী ঘৃণাবশেই অথবা রাজসিংহের প্রতি অনুরাগবশেই করুন, বাদশাহের প্রস্তাব রাজপুতানীর তপ্ত তেজস্বিতা লইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং রাণা রাজ-সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া পুরোহিতের হস্তে পত্র প্রেরণ করিলেন। রাণা অগত্যা শরণার্থিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং মোগল সৈন্যের বিরাট আয়োজন নিষ্ফল করিয়া রাজকুমারীর প্রাণ ও মান উভয়ই রক্ষা করিলেন। শিকারহারা ঔরংজীবের মনে ক্রোধের ও প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই শোচনীয় পরাজয়—জিজিয়ার বিরুদ্ধে রাজসিংহের বিনয়মিশ্র তীব্র প্রতিবাদ-পত্র এবং অজিতসিংহকে আশ্রয়দান—এই তিনটী ব্যাপার একযোগে ঔরংজীবকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল—ঔরংজীব মেবার আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। পুত্রদের এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আকবর আসিলেন বাঙ্গালা হইতে, আজিম কাবুল হইতে এবং মোয়াজ্জম

আসিলেন দাক্ষিণাত্য হইতে। এই বিরাট সৈন্যবল লইয়া ঔরংজীব মেবার অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন।

ওদিকে রাণা রাজসিংহ আরাবল্লীর শিখর-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ ও শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মোগলগণ সমতল প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন—চিতোর, মণ্ডলগড, মন্দাসর, জিরণ, এবং অন্যান্য ঘাঁটিও দখল করিলেন। ঔরংজীব দোবারি গিরিপথের সম্মুখে শিবির সংস্থাপিত করিয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ আকবরকে উদয়পুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। আকবর প্রথমে বিনা বাধায় অগ্রসর হইলেন এবং জনশূন্য রাজধানীতে শিবির স্থাপন করিলেন। তারপর গোগুণ্ডার অভিমুখে অভিযান করিতে যাইয়া আকবর গিরিপথের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁহার আর কোন উপায়ই ছিল না। এমন সময় জয়সিংহের 'অতি-নির্বিচার উদারতা' (ill-judged humanity) আকবরকে শুধু অনশনের এবং আত্ম-সমর্পণের হাত হইতেই বাঁচাইল না, ঝিলোয়ারার পথে চিতোর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল।*

ওদিকে দিলীর খাঁ মাড়োয়ার হইতে দেউসরি গিরিপথ দিয়া অবাধে

* শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় এই কাহিনী বিশ্বাস করেন না। আর "মানুচি" এ সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস করেন না। মানুচি তদীয় "ষ্টোরিও-ডো-মোগর" নামক গ্রন্থে এই ঘটনাটীর অন্যরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে রাণা স্বয়ং ঔরংজীবকেই আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন—এমন কি উদীপুরী বেগমও রাণার হস্তে বন্দিনী হইযাছিলেন। রাণা ঔরংজীবকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উদীপুরীকে সসম্মানে বাদশাহের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশেষ লক্ষণীয়—ওর্মি (Orme) তাঁহার ফ্রাগমেটস্ নামক গ্রন্থে ঔরংজীবকেই অবরুদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

অগ্রসর হইতে হইতে বিক্রম সোলাঙ্কি ও গোপীনাথ রাঠোরের কঠোর আক্রমণের সম্মুখীন হইলেন, ("অসম্ভব"—যদুনাথ সরকার বলেন)। ফাল্গুন মাসে (১৬৮০, ফেব্রুয়ারী) রাঠোরদিগের সাহায্যে রাণা দোবারি গিরিপথে ঔরংজীবকে পরাজিত করিয়া চিতোরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। শ্যামল দাস চিতোর এবং আজমীরের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঔরংজীব ক্ষুব্ধ চিত্তে আজমীর ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে তিনি রোহিল্লা খানের অধীনে পুত্রদের জন্য রসদ ও সৈন্য পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খান সাহেবও 'পুর-মণ্ডলে' পরাজিত হইয়া আজমীরে ফিরিয়া গেলেন (সরকার একথাও বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে ঔরংজীবের বা আকবরের ঐ ধরণের পরাজয় অসম্ভব)।

রাণার পুত্র ভীমসিংহও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনি গুজরাট আক্রমণ করিলেন, ইদর অধিকার করিলেন এবং বহু নগর লুণ্ঠন করিলেন। রাণার দেওয়ান দয়াল সাহ মালব লুণ্ঠন করিলেন এবং জয়সিংহের সহিত যোগ দিয়া কুমার আজমকে আক্রমণ করিলেন ও পলায়নে বাধ্য করিলেন। এইরূপে মেবার মোগল মুক্ত হইল। ওদিকে ভীমসিংহ, নৈশ আক্রমণে মোগল-শিবির হইতে ৫০০ গবাদিপশু কাড়িয়া লইলেন এবং গণোরাতেও তযব্বর খাঁকে পরাজিত করিলেন।

জয়ের পরে জয়লাভ করায় রাণা উল্লসিত হইলেন এবং আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে চক্রান্তের টোপ ফেলিতে লাগিলেন। আকবর টোপ গিলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না—পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আজমীরে ঔরংজীব তখন প্রায় নিঃসঙ্গ। মোয়াজ্জম ও আজিম দূরের পথে অথচ আকবর ছিলেন কেবলমাত্র একদিনের দূরে। ঔরংজীব অগত্যা ছলের আশ্রয় লইলেন—আকবরের-নামে পত্র লিখিয়া দুর্গাদাসের শিবিরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কৌশল ফলিয়া গেল।

রাজপুতরা আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন, তয়ব্বর খাঁ ঔরংজীবকে হত্যা করিতে যাইয়া নিজেই নিহত হইলেন। ইতিমধ্যে মৌজাম ও আজিম সসৈন্যে উপস্থিত হইতেই ঔরংজীব নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইলেন। আকবর দুর্গাদাসের সাহায্যে কোন রকমে পালাইয়া মারাঠাবীর সম্ভাজির কাছে গেলেন এবং সে স্থান হইতে ইংরেজ জাহাজে চড়িয়া পারস্যে পাড়ি দিলেন।

এই সময়ে বিকানীররাজ শ্যামসিংহ মধ্যস্থ হইয়া মেবারের সহিত মোগলের সন্ধি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন।

নাটকে গৃহীত উপাদানের ঐতিহাসিকতা

এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে চারিটী বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমবায়ে আলমগীর নাটকখানি রচিত হইয়াছে—আলমগীরের পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের (এবং পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয়ত্বের) রূপ উপস্থাপিত হইয়াছে। এই চারিটী কাহিনী—(১) রূপকুমারী কাহিনী, (২) ঔরংজীব-উদিপুরী কাহিনী, (৩) ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনী, (৪) মাড়োয়ার ও মেবারের বিরুদ্ধে ঔরংজীবের অভিযান কাহিনী। ইহাদের মধ্যে উদিপুরী কাহিনী যেমন বাদশাহ ঔরংজীবের পারিবারিক গণ্ডীর ব্যাপার, তেমন ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনীটীও রাণা রাজসিংহের পারিবারিক পরিধির ঘটনা; আর রূপকুমারী কাহিনী রাজনৈতিক সংঘর্ষ কাহিনীরই একটী উপধারা—মুখ্য রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও ইহা রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর একটী বিশেষ অর্থাৎ দ্বৈত মর্য্যাদা আছে। একদিকে রাজকুমারী ঔরংজীবের পারিবারিক পরাজয়ের নিমিত্ত কারণ আবার অন্যদিকে মেবার আক্রমণের অন্যতম কারণও। যাহা হউক উল্লিখিত চারিটী প্রধান কাহিনীর সমবায়ে নাটকখানির কাহিনী গঠিত।

এখন, এই কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক কি না এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই যে নাটকখানির ঐতিহাসিকতার সাধারণ রূপ নির্ভর করিতেছে—এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা দেখি,—এই চারিটী কাহিনীই এক হিসাবে ঐতিহাসিক। আণুবীক্ষণিক গবেষণার আলোকে কাহিনীগুলির দুই একটী ভিত্তিহীন বলিয়া ধরা না পড়িতে পারে এমন নহে, কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয় না বা চলে না বলিয়াই কোন ঘটনা অনৈতিহাসিক হইয়া যায় না—যদি মর্য্যাদাশালী কোন বিবরণে উহার উল্লেখ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে ঐতিহাসিক বলিতে ন্যায়ত আমরা বাধ্য। এই হিসাবে নাটকখানির মূল কাহিনীগুলি ঐতিহাসিকই বটে। রূপকুমারী সম্বন্ধে বা ভীমসিংহের জন্মরহস্য বিষয়ে টড সাহেবের রাজস্থানে স্পষ্টবিবরণ পাওয়া যায়, তারপর ঔরংজীবের উদিপুরী সম্পর্কে যে দুর্বলতা ছিল তাহাও ইতিহাস-কথিত—আর মাড়োয়ার ও মেবারের বিরুদ্ধে ঔরংজীবের অভিযান তো আলমগীরের জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

কিন্তু নাট্যকার কাহিনীগুলি যথাযথরূপে প্রয়োগ করেন নাই। কোন কোন কাহিনীকে এত কল্পনা-মাংসল করিয়াছেন যে অনেক পরিমাণে উহা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটীর পরিণতি নিজের খেয়ালেই অনৈতিহাসিক করিয়া ফেলিযাছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে রূপকুমারী বৃত্তান্তকে নাট্যকার নাটকে যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে অনৈতিহাসিকতার মাত্রা অনেক পরিমাণে প্রকট হইয়া পড়িযাছে। কামবক্সের রূপনগরের রাজকুমারীর রূপ পরখ করিতে যাওয়া এবং উদিপুরীর শিবিরে রূপকুমারীর 'সম্রাজ্ঞী মা'কে দেখিতে যাওয়া শুধু কল্পনাই নহে, খাঁটি উৎকল্পনা। রূপকুমারী-কাহিনীকে বিস্তার করিবার অধিকার নাট্যকারের অবশ্যই আছে, কিন্তু আছে বলিয়াই তিনি সম্ভাব্যের গণ্ডী মুছিয়া ফেলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনীর কথা ধরা যাক্। টড সাহেব

'বুনেরা'র রাজার মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন—

"A few hours only intervened between his entrance into the world and that of another son called Bhim. It is customary for the father to bind round the arm of a new-born infant a root of that species of grass called—'*amirdhob*' —the imperishable '*dhob*'···The Rana first attached the ligature ronnd the arm of the youngest apparently an oversight though in fact from superior affection for his mother. As the boys approached to manhood, the Rana apprehensive that this preference might create dissention, one day drew his sword and placing in the hand of Bhim (the elder) said, it was better to use it at once on his brother than hereafter to endanger the safety of the state. This appeal to his generosity had an instantaneous effect and he not only ratified 'by his father's throne' the acknowledgement of the sovereign rights of his brother but declared to remove all fears—he was not his son if he again drank water within the pass of Dobari—His cup bearer (panairi) brought his silver goblet filled from the cool fountain but as he raised it to his lips, he recollected··· poured the libation on the earth·· ···he proceeded to Bahadoor Shah. ··· but quarrelling with the imperial general he was detached with his contingent westof the Indus where he died.

দেখা যায় রাজস্থানের মতে ভীমসিংহ সিন্ধুতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু নাটকে দেখা যায় ভীমসিংহ 'দোবারি' গিরিপথে ঔরংজীবের সম্মুখে প্রাণতাগ করেন। কিন্তু সরকার লিখিত *History of Aurangzib* নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—"Two months after the treaty the heroic Bhim

Shimha paid his respectsto the emperor and was taken into Mugul service with his son." শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় এই সম্বন্ধেই পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"Bhim Simha was created a Raja and posted at Ajmer for the war with the Ratho.s" সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে নাট্যকার ভীমসিংহের যেরূপ পরিণাম ঘটাইযাছেন তাহা রাজস্থান-সমর্থিত এবং ইতিহাস-কথিতও নহে।

তৃতীয়তঃ বীরাবাঈ-এর ভীমসিংহের প্রতি স্নেহ-আসক্তি নির্দ্দোষ কল্পনা বটে, কিন্তু 'দোবারী-ঘাটে' (২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) বীরাবাঈ যে দৃশ্য দেখাইয়াছেন, —মাতৃত্বের নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি হিসাবে তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইলেও ঘটনাটীর কোন ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি নাই। ঘটনাটী চমৎকার রোমাঞ্চকর। চতুর্থতঃ কামবক্‌সকে পেঁছাইয়া দিতে জয়সিংহের সঙ্গে যাওয়া এবং কিছুক্ষণ পরেই অতিনাটকীয়ভাবে ভীমসিংহের ঔরংজীবের সম্মুখে,—বিশেষতঃ দিল্লী-প্রাসাদ-রংমহল-এ উপস্থিতি অসম্ভব অতিকল্পনা। নাট্যকারের এই কল্পনার মূলসূত্র খুব সম্ভব টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত—অবশ্য উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিয়া। রাজস্থানে পাওয়া যায় যে আকবর যখন গিরিপথে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন জয়সিংহ আকবরকে উদারতাবশে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চিতোর পর্য্যন্ত পেঁছাইয়াও দিয়াছিলেন। রাজস্থানের এই কাহিনীটুকু কামবক্‌সের সহিত জয়সিংহের সঙ্গী হিসাবে যাওয়ার পরিকল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, আর ইহারই সহিত জড়ানো হইয়াছে মানুচির "স্টোরিয়ো-ডো-মোগর" গ্রন্থের বর্ণিত কাহিনী। কথিত আছে একদিন বাদশাহ জয়সিংহের মুখোমুখি পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং উদারতার ছল করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নাট্যকার এই দুই 'কথা'কে একত্র করিয়া যে সমীকরণ করিয়াছেন, তাহা অতিকল্পনায় পরিণত হইয়াছে। রংমহলের মর্য্যাদার দিকে নাট্যকার একটুও

দৃষ্টি রাখেন নাই। মোগলের রংমহলকে এত বে-আবরু ও 'বেওগারিস' কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

পঞ্চমতঃ ঔরংজীবের উদিপুরী দুর্ব্বলতা। রূপনগরের রাজকুমারীর সহিত উদিপুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস-কথিত না হইলেও অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নহে। শেষ বয়সের প্রণয়িণী—'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' উদিপুরী যে নিজ প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য রূপকুমারীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা ঔরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই হিসাবে উদিপুরীর প্রেমের রাজ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা নির্দ্দোষ পরিকল্পনা। কিন্তু আপত্তি এখানে নহে; আপত্তি এই যে, উদিপুরীকে নাট্যকার একেবারেই বে-আবরু ও বেসামাল করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাস-কার শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"—Aurangzib's youngest and best loved concubine Udipuri Mahal, the mother of Kambaksh—The contemporary Venetian traveller Munuchi speaks of her as a Georgian slave-girl of Dara-Shukho's harem who on the downfall of her first master become the concubine of his victorious rival. She seems to have been a very young woman at the time as she become a mother in 1667, when Aurangzib was verging on fifty. She retained her youth and inflicece over the Emperor till his death and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kambaksh and overlooked her freaks of drunkenness which must have shocked so pious a Muslim". নাটকে ঔরংজীবের উদিপুরী মোহ সুন্দরভাবেই দেখান হইয়াছে কিন্তু উদিপুরীকে 'স্থান-কাল-পাত্র' নিরপেক্ষ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ মাড়োয়ার অধিকার এবং মেবার অভিযানের কথা:—ইতিহাসে

আছে—যশোবন্তের মৃত্যুর পরে দুর্গ দাস অজিত সিংহকে ঔরংজীবের কবল হইতে ছিনাইয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাড়োয়ারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। মহম্মদ আকবরের সেনাপতিত্বে এবং তয়ব্বর খাঁর নায়কতায় এই অভিযান অগ্রসর হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মহারাণা রাজসিংহ যুদ্ধে যোগদান করেন। মেবার অধিকার করিবার জন্য ঔরংজীব প্রায় সর্বশক্তি নিযুক্ত করিলেন কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। কেহ কেহ বলেন—ঔরংজীব নিজেই গিরি-পথের মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজসিংহ উদারতা-বশে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন (যেমন মানুচি, ওর্মি প্রভৃতি)। এই কথা অনেক ঐতিহাসিক অস্বীকার করিলেও ইহার ঐতিহাসিকতা কাব্যের ক্ষেত্রে অন্ততঃ অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে ভীমসিংহের জলপাত্রহস্তে প্রবেশ ও অন্তিম শয়ন এবং ঔরংজীবের মুখে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা অনৈতি-হাসিক এবং অসঙ্গত কল্পনা। তারপর সপ্তমতঃ দিলীর খাঁ-কে যে পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে আকবরের সহিত দিলীর খাঁ'র জামাতা-শ্বশুর সম্বন্ধ বিষয়ে ইতিহাসে কোনও কথাই জানা যায় না। *History of Aurangzib* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় আকবরের ইতিহাস যেটুকু দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এ সম্পর্কের কোন আভাসই নাই। তারপর ঔরংজীবের ওয়াজিরের (প্রধান মন্ত্রী) তালিকায় যে কয়জনকে পাওয়া যায়, ফাজিল খান, জাফর খান (১৬৬৩-৭০), আসাদ খান (১৬৭৬ হইতে ৩১ বৎসর) তাঁহাদের মধ্যে দিলীর খাঁর নাম নাই, তারপর বক্‌শিদের নামের তালিকায়ও তাঁহার নাম নাই। অন্যান্য খান-ই-সামান, 'সদর-উস্‌-সাদুরস' কাজী প্রভৃতির তালিকাতেও দিলীর খাঁকে পাওয়া যায় না। দিলীর বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। রাজপুত-যুদ্ধের সময় দিলীর খাঁ উত্তরভারতে ছিলেন—ইতিহাসের সাক্ষ্যে এই সংবাদই পাওয়া যায়। ১৬৭৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ঔরংজীব খান-ই-জাহানকে

দাক্ষিণাত্য হইতে ডাকিয়া পাঠান এবং দিল্লীর খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়া দেন। উক্ত খান-ই জাহানই মাড়োয়ারে অভিযান চালাইয়াছিলেন। অতএব দিলীর খাঁকে অত অন্তরঙ্গ করিয়া অঙ্কন করিবার কোন হেতু নাই। ১৬৭৬ খ্রীঃ ৮ই অক্টোবর হইতে পরবর্তী ৩১ বৎসর পর্য্যন্ত আসাদ খান উজীর (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন অর্থাৎ রাজপুত-যুদ্ধের সময়ে দিলীর খাঁ উজীর ছিলেন না। সুতরাং দিলীর খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত নহে।

তারপর উদিপুরীর ঐতিহাসিক পরিচয়। নাটকে উদিপুরীকে "আরমানী বিবি" বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইতিহাসে নানা মত দেখা যায়: ঔরংজীবের সমসাময়িক ভিনিসীয় ভ্রমণকারী মানুচির মতে উদিপুরী দারা-শিকোর হারেমের দাসী-কন্যা, জাতিতে জর্জ্জীয়, ওর্মির মতে সিরকাশিয়ান, টড সাহেব ওর্মির মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"Orme calls her a Cashmerian, certainly she was not a daughter of the Rana's family. Though it is not impossible she may have been of one of the great families of Shahpura or Bunera (then acting independently of the Rana) and her desire to burn shews her to have been Rajpoot". দেখা যাইতেছে টডসাহেব উদিপুরীকে রাজপুত কন্যাই বলিতে চাহেন। ঐতিহাসিক সরকার টডের মত গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না। যাহাই হউক, উদিপুরীকে 'আরমানী বিবি' বা 'কাশ্মিরী বেগম' বলায় অনৈতিহাসিকতা-দোষ ঘটে নাই।

উপসংহারে বলা যায় যে, নাটকখানি যে কয়টি কাহিনীর সমবায়ে রচিত, উহারা মূলতঃ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু নাট্যকার অতিকল্পনা দ্বারা উহাদের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। নাটকের চরিত্রগুলির প্রায় সব কয়টাই নামতঃ ঐতিহাসিক এবং কার্য্যতঃ আতিশয্য দোষে দুষ্ট হইলেও প্রায়-ঐতিহাসিক। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে পুরোহিত দীপচাঁদ নামতঃ অনৈতিহাসিক কিন্তু কার্য্যতঃ ঐতিহাসিক এবং নারী-চরিত্রের মধ্যে 'সুজাতা' নামে ও কার্য্যে নিছক কাল্পনিক।

আলমগীরের সাধারণ সমালোচনা

'আলমগীর' পঞ্চাঙ্ক একখানি ঐতিহাসিক নাটক*—দিল্লীর বাদশাহ ঔরংজীবের—দিগ্বিজয়ী আলমগীরের জীবনের পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনার উপাদান-সমবায়ে রচিত। বলা যাইতে পারে যে, 'কাশ্মীরী বেগম' তরুণী ভার্য্যা উদিপুরীর সহিত কৌশল-দ্বন্দ্বে বা শক্তি-প্রতিযোগিতায় এবং মেবারের রাণা রাজসিংহের সহিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বে অপরাজেয় আলমগীরের শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয়ত্ব দেখান তথা তাঁহার অদ্ভুত জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করা নাটকখানির মুখ্য উপস্থাপ্য। পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলি মনে হয় নাটকের বহিরঙ্গ, নাটকখানির অন্তরঙ্গ আকৃতি ঔরংজীবের জটিল ও বহুরূপী ব্যক্তিত্বের নানামুখী অভিব্যক্তি-পরম্পরা—পরাজয়ের ভিতর দিয়া অপরাজয়ত্বের প্রতিষ্ঠা। নাটকখানিতে ১৬৭৮ খ্রীঃ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসরের রাজ-

* এই নাটকখানি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর "বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী" কর্তৃক (ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানীর বাঙ্গালা বিভাগ) প্রথম অভিনীত হয়! নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (অধ্যাপক) শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ. এবং এই অভিনয়েই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রথম ও শুভ অবতরণ।

[প্রথম রজনীর পাত্র-পাত্রী: আলমগীর—শিশির ভাদুড়ী, এম.এ, রাজসিংহ—প্রবোধ বসু, গরীব দাস——নৃপেন বাবু,—ভীমসিংহ—সত্যেন দে, দয়াল সা—শীতল, কামবক্স—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসিংহ— গোপাল ভট্টাচার্য্য, বীরাবাঈ—বসন্তকুমারী, রূপকুমারী—প্রভা।]

নৈতিক ঘটনাকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই মূল ভিত্তির সহিত আনুষঙ্গিক রূপে রূপকুমারী-কাহিনী, ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনী এবং উদিপুরী-কাহিনীকে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, নাটকখানির মূল-কাহিনী উপাদান প্রধানতঃ চারিটী—(১) আলমগীর-রাজসিংহ-কাহিনী, (২) আলমগীর-উদিপুরী কাহিনী, (৩) রূপকুমারী-কাহিনী এবং ভীমসিংহ-জয়সিংহ কাহিনী।

নাটকে দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হইয়াছে এবং একই কালীন পরিসরে করা হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের একটীর নাম দেওয়া যায়—পারিবারিক আর একটি রাজনৈতিক। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীরকে এই দুইটি দ্বন্দ্বের সন্মুখীন করা হইয়াছে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আলমগীরের প্রতিযোগী তাঁহারই মোহিনী প্রেয়সী উদিপুরী—দেহের রূপে, মনের গুণে বিমোহিনী উদিপুরী। এই উদিপুরীর রূপের অহংকার ভাঙ্গিবার জন্য আলমগীর রূপনগরের রূপকুমারীকে অন্তঃপুরে আনিবার যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন, দৃঢ়তর সঙ্কল্পের সহিত উদীপুরী অপরাজেয় আলমগীরের সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিযাছেন, অপরাজেয়কে সত্যই পরাজিত করিয়াছেন। আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আলমগীরের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—রাজপুত-গৌরব মহারাণা রাজসিংহ—অপরাজিত রাজসিংহ। রূপকুমারীকে ছিনাইয়া লইয়া রাজসিংহ আলমগীরের মুখের গ্রাসই কাড়িয়া লইয়াছিলেন আর যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিতসিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়া আলমগীরের আলমগীরত্বকেই ক্ষুন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আলমগীর সর্ব্বশক্তি নিযোগ করিবাও এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারেন নাই —দেবাগিরি গিরিগুহার মধ্যে আবদ্ধ হইযা পিপাসায় আর্ত্তনাদ ও রাজসিংহের কাছে অনুচ্চারিত বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই ক্ষেত্রের পরাজয়ই নাটকের উপস্থাপ্য বহিরঙ্গ।

নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয়

ভারতীয় সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি অনুসরণ করিলে আমাদের নাটকখানির প্রধান রসটী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—'কোন্ রসের নাটক?'—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। অন্যভাবে বলা যায় যে—নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিণাম আমাদের যে বিশেষ ভাবটি উদ্রিক্ত করিয়া থাকে, সেই ভাবটিকে নির্ণয় করিতে হইবে। কেবলমাত্র সুখ-পরিণাম বা দুঃখ-পরিণাম—এই দুইভাগে ভাগ করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, যে বিশেষ স্থায়ীভাব নাটকটির ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া ব্যক্ত বা রসতা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই বিশেষ স্থায়িভাবটীকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—উপলব্ধি করিতে হইবে—"the main spirit" বা "impression"কে ("*the unity of impression* which the auther always strives to produce")—Sarcey in *A theory of the Theatre*.*

প্রশ্ন এখন এমন কোন স্থায়িভাব নাটক হইতে পাওয়া যায় কি না? কেহ হয়ত বলিবেন যে এই ধরণের কোন বিশেষ ভাব প্রধান হইবেই এমন কি কথা আছে? আধুনিক অনেক নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণ করিবার অথবা সমস্যা সমাধানের ঝোঁক অত্যধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই সকল নাটকে রস-সৃষ্টির দিকে যতটা লক্ষ্য না থাকে, বিশ্লেষণ ও সমাধানের বা প্রচারের দিকে ততোধিক লক্ষ্য থাকে। এই সকল নাটকে কোন একটী ভাব স্থায়ী বা প্রধান হয় এমন কথা বলা চলে না; অতএব রসের প্রশ্ন সব ক্ষেত্রে না তুলাই উচিত। নাটক রসাত্মক হইবেই এমন কি কথা?

* It is rather interesting to note that, their insistence on impression, these modern critics were anticipated by the ancient writers on Sanskrit drama—"The theory Drama" By A. Nicoll.

এই ধরণের যুক্তির আপাত-ঔজ্জ্বল্য যতই থাক, আমার মনে হয়, ইহার ভিত্তি খুব পাকা নহে। চরিত্র-বিশ্লেষণ, চরিত্র-সৃষ্টি, সামান্য-উপস্থাপন কাব্য সৃষ্টির উপায়, লক্ষ্য নহে। চরিত্র-সৃষ্টি বলিতে কয়েকটী প্রধান ভাব-বন্ধের (dominant sentiment) প্রবণতার ফলে, ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কি কি ভাবে আচরণ করে না করে তাহাই রূপায়িত করা বুঝায়। আর সমস্যা উপস্থাপনা তখনই কাব্য বলিয়া গৃহীত হয়, যখন সমস্যাটী ব্যক্তির চরিত্রের মধ্য দিয়া উপভোগ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং, 'ভাব' বিহীন চরিত্র অসম্ভব এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে প্রধান 'স্থায়িভাব' পাওয়া একেবারে অসম্ভব হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সমালোচক এলারডাইস্ নিকলের কথা স্মরণ করা যায়। Unity of impression সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আধুনিক সমালোচকদের 'impression'-প্রবণতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—"This however, may be said :—That every great drama shows a subordination of the particular elements of which it is composed to some central spirit by which it is inspired and that any drama which admits emotion not so in subordination to the main spirit of the play will thereby be blemished." সমালোচক নিকল সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রের আলোচনা-পদ্ধতিকে "Oriental Approach" বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"This system of Oriental Approach is in essential agreement with that of those who emphasise all-important the 'idea' or "impression" received from witnessing a dramatic "work of art."

যাহাই হউক, আলমগীর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও উহার প্রধান ভাব আছে এবং চরিত্রটীর প্রধান ও স্থায়িভাব—"উৎসাহ"—বীর

রসের স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাবটীই যে আলমগীর চরিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত বা নিষ্পন্ন হইয়াছে নাটকের দৃশ্যগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই উপলব্ধি করা যায়। দিগ্বিজয়ীর অটল অভিযান, অকম্পিত আত্ম-প্রত্যয় ও নিভীকতা এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও কৌশল আলমগীর চরিত্রের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম—প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বর্ম্ম কখনও আলমগীরের দেহ হইতে বিচ্যুত হয় নাই—এমন কি পরাজয়ের দুর্দিনেও নহে। পরাজয়ের পরিবেশেও আলমগীর এমন দৃঢ়ভাবে তাঁহার অপরাজেয়ত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে পরাজয়ই যেন পরাজিত হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই—চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে ঔরংজীব কোন বাহিরের শত্রু দ্বারা নির্জিত নহেন, যেখানে আপনার নিজ্ঞান সত্তার হস্তেই নিজে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত, সেখানেও আলমগীর নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন নাই—আত্মপ্রত্যয়ের গরিমা-দীপ্তিতে পূর্ব্বের মতই তিনি ভাস্বর। চিরবিজয়ীর অটল আত্মপ্রত্যয়—"পুণ্য তো আছেই এবং চিরদিন থাকবে। আমার সাহস আছে এবং চিরদিনই থাকবে। সে সাহসের মালিক দুনিয়ার একমাত্র আমি।"*

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে—একটী মাত্র কথা ক্ষণপ্রভার দীপ্তিতে সমগ্র চরিত্র-ভূমিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। ভীমসিংহ যখন বলিলেন—"যদি দুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করি?"—আলমগীর শুধু বলিলেন—"ক্ষুদ্র বালক! আমি আলমগীর! আমি আলমগীর!" —এই একটীমাত্র কথা চরিত্রটীর বজ্রকঠোর

---

* জুলিয়াস সিজারকে মনে পড়ে—

...danger knows full well
That Caesar is more dangerous than he :
We are two lions littered in one day,
And I the elder and more terrible.

আত্ম-বিশ্বাসকে—সমগ্র সত্তাকে যেন এক এক নিঃশ্বাসে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।*

তারপর, পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে—দিলীরও সুন্দর আলোক-পাত করিয়াছেন—"আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর আছে কি না জানি না।" শেষ দৃশ্যে (পঞ্চম অঙ্ক, দ্বাদশ দৃশ্য) দোবারি গুহাপথের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আলমগীর যে অনমনীয় ইস্পাত-সুকঠিন মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর বীরত্বেরই দীপ্ত প্রকাশ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তিনি মৃত্যুকে শাসাইয়াছেন—নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয় যেন তাঁহার সত্তা হইতে দীপ্ত তেজে বিচ্ছুরিত হইয়াছে—"দাঁড়াও মৃত্যু দূরে—আমি আলমগীর। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর কখনও মরতে পারে না—"

"না—না—আমি আলমগীর!" এই উক্তি নির্ভীক বীরত্বের প্রদীপ্ত শিখা। অপরাজেয় বীরত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আলমগীরের মধ্যে অস্থিরভাবে বিরাজ করিয়াছে এবং সেই কারণেই পরাজিত হইয়াও আলমগীর অপরাজেয়ই রহিয়া গিয়াছেন।

এই হিসাবে, বলা যায় যে উৎসাহই আলমগীরের প্রধান স্থায়িভাব এবং নাটকখানি, আপাত-দৃষ্টিতে অন্যরূপ মনে হইলেও, প্রকৃতিতে 'বীর-রসাত্মক'।

আলমগীর ট্র্যাজেডি না কমেডি

আলমগীর নাটকখানির শ্রেণী-পরিচয় করা বেশ একটু দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ নাটকখানি আকৃতিতে একরূপ, প্রকৃতিতে অন্যরূপ। নাটকখানির

*ম্যাকবেথের উক্তিই যেন উহ্য রহিয়াছে—

—The mind I sway by and the heart I bear
Shall never sag with doubt nor shake with fear.

মধ্যে আপাতঃ যাহা চোখে পড়ে, তাহা আলমগীরের পরাজয়—পারিবারিক ক্ষেত্রে উদিপুরীর কাছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেবারের রাণা রাজসিংহের কাছে। উদিপুরী প্রেমের রাজ্যে আধিপত্য রক্ষা করিতে আলমগীরের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল আর রাজসিংহ যশোবন্তের পুত্র অজিত সিংহকে আশ্রয় দিয়া এবং জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করিয়া আলমগীরের বিরুদ্ধাচরণ তথা আলমগীরত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন—আলমগীরের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই আলমগীর কার্য্যত পরাজিত সুতরাং নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রে দ্বন্দ্ব-সমস্যার তৃপ্তিকর সমাধান ঘটিয়াছে এ কথা বলা যায় না। কারণ প্রতিক্ষেত্রেই তিনি পরাজিত।

বাস্তবিক নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলমগীর আত্মিক ভারসাম্যের হিসাবে একটী বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিত্ব—(Frustrated Soul). কি পারিবারিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কোন ক্ষেত্রেই তিনি বাধা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহার ভাগ্যে পরাজয়—অধিকন্তু মনোবিকারের প্রকোপে চরিত্রটী অপ্রকৃতিস্থ, এক সত্তার (নিজ্ঞ'ান-আসংজ্ঞান)কাছে তাহারই অন্য সত্তা শোচনীয় ভাবে নির্জিত। জাগ্রত অবস্থায় আলমগীর প্রবল-প্রতাপ কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায়—"এক একদিন এক একটা মশার গানেও···শিউরে উঠেন···"। তাহার আত্ম অন্তর্বিরোধে খণ্ডিত। উদিপুরীর ভাষায় বলা যায়—তাঁহার মধ্যে—"দুটো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমায় তখন আসলটা জেগে ওঠে। আবার নকলটা যখন জাগে তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়; বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।" এই দিক দিয়া চরিত্রটির ব্যক্তিত্বে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ (dissociation of personality) ঘটিয়াছে দেখা যায় এবং দেখা যায় যে চরিত্রটী শুধু বহিঃশক্তির কাছেই পরাজিত তাহা নহে, নিজের কাছেও নিজে

নির্জ্জিত ও লাঞ্ছিত। । অতএব, যে আলমগীর চরিত্র একটা অন্তর্ভিন্ন বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই যাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই—উদিপুরীর কাছে যিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত, রাজসিংহের হস্তে যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দী হইযাছেন এবং ইসলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিতেই যিনি নিজের আসল সত্তার কাছে "কাফের" গালি শুনিযাছেন—এক কথায় এতদিক দিয়া বিপর্য্যয় আসিয়া যাঁহাকে ঘিরিযাছে, সেই আলমগীর "শোচনীয" এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। এতবড় একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের শোচনীয় দুরবস্থা—বাস্তবিকই "sight of a losing struggle"—ট্র্যাজেডিরই অনুকূল পরিবেশ। এই হিসাবে, চরিত্রটীকে ট্র্যাজেডি-করুণ বলিবার বেশ একটা ঝোঁক আসিতে প্যার, মনে হইতে পারে যে আলমগীর নাটকখানি ট্র্যাজেডি করুণ নাটক।

কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার এই যে নাটকখানি 'ট্র্যাজেডি' হইয়া উঠে নাই—উহার পরিণাম বিষাদান্তক নহে। প্রথমতঃ যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আত্ম-বিদারণের জন্য, উভয় সত্তার সংঘর্ষ ও সংক্ষোভের জন্য করুণ হইয়া উঠে, সেই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে পাওয়া যায় না। যেটুকু আছে তাহা নাটকখানিকে ট্র্যাজেডির বিষাদময় মহিমা দিতে অক্ষম। দ্বিতীযতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, নাটকখানির পরিণাম বিষাদময বা শোচনীয় নহে। উপসংহারে যদিও আলমগীরকে পরাজয়েরই পরিবেশের মধ্যে দাঁড় করানো হইয়াছে, তবু উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে আলমগীরের অপরাজেয়ত্বের মহিমাই পরিব্যাপ্ত; অধিকন্তু উভয়পক্ষই (মোগল-রাজপুত) হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনার এমন এক শ্রেয়স্কর ও প্রশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে যে, জয় পরাজয়ের হিসাব-বুদ্ধি মহনীয় একটী চেতনায় আছন্ন হইয়া গিয়াছে।

নাটকের উপসংহারে পরাজিত অথচ আত্মিক বলে অপরাজের

আলমগীর মেবারের মহারাণা রাজসিংহকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অতএব নাটকখানি ট্র্যাজেডি পরিণাম পায় নাই এবং পায় নাই বলিয়াই—নাটকখানি কমেডি—আরো নির্দ্দিষ্টভাবে বলিলে—ট্র্যাজি-কমেডি, কারণ বহিঃপ্রকৃতিতে ট্র্যাজেডির আবহাওয়া থাকিলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে কমেডি।

নাটকখানির সাহিত্যিক স্থান

'আলমগীর' নাটকখানি যে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা এ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই একমত। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"আলমগীর ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।" বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষও লিখিয়াছেন—"আলমগীর ক্ষীরোদ-প্রসাদের কীর্তির বিজয় বৈজয়ন্তী।" বাস্তবিক, আলমগীর নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার মধ্যে শুধু শ্রেষ্ঠই নহে, এই নাটকে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই নাটকে চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্ব স্ফুরণে এবং রচনাবিন্যাসে নাট্যকার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বের রচনায় সে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং এমন কথা বলা যায় যে, আলমগীর ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাট্যকার জীবনে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে। নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে—তাহাতেও এই কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, 'আলমগীর' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের নতুন শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এক কথায় বলা চলে—আলমগীর পাকা হাতের রচনা। এই নাটকে যেমন পাওয়া যায় তাঁহার সমবেদনশীলতার পরিচয়, তেমনি পাওয়া যায় প্রকাশক্ষমতা—কাব্যিক বাগ্‌রীতি—চমৎকার বাগ্‌ভঙ্গিমা।

সমবেদনশীলতার ফলে রাজসিংহ, বীরাবাঈ, ভীমসিংহ, আলমগীর, উদিপুরী প্রভৃতি প্রায় চরিত্রগুলিই অনুভাব-সবল—প্রাণবান্ অর্থাৎ ইহারা শুধু কথাই বলে নাই, অনুভবও করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ উন্নত 'ধারণা-শক্তি'র ফলে চরিত্রের মানসিক ও আত্মিক প্রকৃতি জটিলতর ও বিচিত্রতর হইয়াছে এবং এই কারণেই মানসিক ব্যাপকতার ও গভীরতার ফলে বাগ্-বিন্যাসেও আসিয়াছে নবতর সংস্থা—নতুন অনুভূতির আকারকে নতুন রীতিতে প্রকাশ করার চেষ্টা। এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রকাশ-ক্ষেত্রে, নিও-ক্লাসিকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রোমাণ্টিকের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে রাজসিংহ বলেন—"আকাশ সেখানে কখনও মেঘের অবগুণ্ঠন মুখে দেয় না। পাহাড় সেখানে, কাঁদতে জানে না। বায়ু সেখানে অগ্নিকণায় নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে।" এখানে আলমগীরের কথা—"ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, যোগী, সন্ন্যাসী—তাদের মাথার উপর কর! সে টাকা আদায় হয়ে যখন আমার রাজকোষে প্রবেশ করবে—ঘরের এককোণে তার সমস্ত জড় করলেও তা' মেজের সমতলত্ব দূর করতে পারবে না।········ হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে—আমি শুনে হাসবো। মুসলমান আমার জয় ঘোষণা করবে—আমি শুনে কাঁদবো।" এখানে উদিপুরীর বাগ-ভঙ্গিমা—"·········পুত্র হ'ল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সে আপনার মুখ-সাদৃশ্য লাভ করতে পারলে না। চক্ষুতারকায় সে সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। তার বর্ণে কাশ্মীর পাহাড়ের সেই অরুণগর্ভ তুষারশ্রী জড়িয়ে গিয়েছে। তার মুখনানায় সমস্ত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কাশ্মীর-কুসুমের বিজড়িত রহস্য, তার হৃদয়ে অজস্র উচ্ছ্বসিত সেই সমস্ত কুসুমগন্ধের প্রেরণা। তার রূপের অন্তরাল থেকে কাশ্মীরী প্রকৃতি নিত্য আমাকে শুনিয়ে বলে—আর কেন সখী, ও অসার সৌন্দর্যের মাঝে, তুমি ফিরে এস।" এখানে বীরাবাঈ বলেন—"জয়সিংহ! আমি দেখেছি প্রভাতের অরুণ আমাকে

অন্ধকারবর্ণা প্রেতিনী করবার জন্য উদয়াচলের অন্তরালে বসে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত করছে।" এই ধরণের প্রকাশ-ভঙ্গীর দৃষ্টান্ত বহুস্থলেই পাওয়া যায়।*

দেখা যায়, এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিবিড়তর সহৃদয়তার, ব্যাপকতর কল্পনা-শক্তির এবং সুষ্ঠুতর প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন।

নাটকের নানা রস ও ভাব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে যে ভাবকে স্থায়িরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম উৎসাহ এবং উহা বীররসেরই স্থায়িভাব। অন্যান্য চরিত্রেও এই ভাব পাওয়া না যায় এমন নহে, ভীমসিংহ উহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই রস ছাড়াও নাটকে বাৎসল্যরস, হাস্যরস প্রভৃতিও সৃষ্টি করা হইয়াছে। রাজসিংহের ও 'বীরাবাঈ'-এর মাধ্যমে বাৎসল্য; গঙ্গাদাস, গরীবদাস এবং দযালশার মাধ্যমে প্রভুভক্তি ও দেশভক্তি, কামবক্সের আলম্বনে মাতৃভক্তি; আকবর-মোসাহেব রামসিংহের আশ্রয়ে হাস্যরস এবং উদিপুরীর মাধ্যমে পতি-প্রেম সৃষ্টি করিয়া নানা রসে ও ভাবে নাটকখানিকে নাট্যকার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

আর, ভাবের দিক দিয়াও নাটকখানির আকর্ষণ কম নহে। প্রভুভক্তি, দেশপ্রীতি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, উদার মনুষ্যত্বাভিমান, নির্নিমেষ কর্তব্য-নিষ্ঠা নানা চরিত্রের আশ্রয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'জাতির

---

* এই ধরণের বাগ্-ভঙ্গিমা দেখিয়াই ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়া ফেলিয়াছেন—"কয়েকটী নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়িয়া ক্ষীরোদচন্দ্র সংলাপের ঔচিত্যের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের ভাষা কুত্রাপি বিজাতীয় হয় নাই"।

গ্লানির সময় মহাত্মা'র আবির্ভাব ঘোষণা, 'সত্য'কে অস্ত্ররূপে এবং 'ত্যাগ'কে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবার অনুপ্রেরণা, অস্ত্রবলের উপরে আত্মবলের মর্য্যাদা স্থাপন—"অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি"র আয়োজন—"বিলাসিতাকে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ" করার সঙ্কল্প (পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) যুগমনের প্রভাবে এবং যুগমনকে আকর্ষণ করিতেই উপস্থাপিত হইয়াছে এবং উহারা নাটকখানির ভাব-মূল্যই বৃদ্ধি করিযাছে। অধিকন্তু হিন্দু-মুসলমান মিলন-মন্ত্রের প্রচার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যের আকারেই নাটকে স্থান পাইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের চাপে ঐতিহাসিক সত্যকে পর্য্যন্ত নাট্যকার বাঁকাইযা ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন —হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতি উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়া আলমগীরকে দিয়া রাজসিংহকে আলিঙ্গন করাইয়া ছাড়িয়াছেন, তথা যুগের জন্য একটি অতি মূল্যবান এবং অত্যাবশ্যক প্রচারকার্য্য করিয়াছেন।

তারপর, চারণীগণের গীতি (পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)—'ভাষা নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব জাগর-গান'কে শুধু কথাই বাঁধে নাই সুরে সুরে সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। রাজপুতগণের জাগরণকে উপলক্ষ্য করিয়া নাট্যকার ভারতের নব-জাগরণকে যে বন্দনা করিয়াছেন তাহা ভারতের প্রত্যেকটী হৃদয়কেই স্পর্শ করিযাছে এবং আজও করে—কারণ "আবাল বৃদ্ধ মায়ের সেবক—মায়ের সেবিকা নারী"। আর আজও সকলে—"বিজয়-নিশান তুলিয়া আকাশে" মাতৃভূমির জয়গান গাহিতে চাহে।

এই ভাব-মূল্য বা বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রসঙ্গেই নাটকখানির রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা সুসঙ্গতই হইবে। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা—নারীপুরুষ নির্বিশেষে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মদান করা, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া জাতীয়তাবোধকে নিবিড করিয়া তোলা—মহাত্মা গান্ধীর

আত্মবলের সংগ্রামে দেশবাসীর অভূতপূর্ব্ব সাড়া এবং আত্মবলের সংগ্রামের প্রতি জাতির ঐকান্তিক আস্থা ও সহযোগিতা জাগ্রত করা এই সকল সামাজিক প্রেরণার এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব-গভীর চরিত্র সৃষ্টির শৈল্পিক প্রেরণার সংযোগে নাটকখানি রচিত। বলা যাইতে পারে অতীত কাহিনীর কাঠামোতে নাট্যকার বর্ত্তমান ভাবের প্রতিমা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। আলমগীর পুরাতন হইলেও তাঁহার নানা সত্তার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, (আধুনিক র‍্যাশার এবং রাজপুতদের দেশপ্রাণতা প্রথিত থাকিলেও) মহাত্মার আবির্ভাবের সংকেত (১৯২১ খ্রীঃ নাটকখানি রচিত ও প্রথম অভিনীত), অস্ত্রবল অপেক্ষা আত্মবলের উপর অধিক গুরুত্বারোপ, বিলাসিতা-বর্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জনের নির্দ্দেশ নূতন পরিবেশের প্রেরণা হইতেই আসিয়াছে। যুগ-চেতনার প্রেরণা হইতে আসিয়াছে এমন সব উপাদান বাছিযা লইলে দেখা যাইবে নাটকখানি পুরাতন ইতিহাস লইয়া লিখিত হইলেও উহার ভাব ও কল্পনা রচনাকালীন আবহাওয়া হইতেই গৃহীত এবং রচনার প্রেরণাও সেখান হইতেই আসিয়াছে। আর না আসিয়াও পারে না। যুগের ব্যক্ত বা বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাকেই সংজ্ঞানে বা আসংজ্ঞানে প্রত্যেক স্রষ্টাই রূপ দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কারণ সৃষ্টির বড উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া এবং ঐ আনন্দ নির্ভর করে ব্যক্তির অর্থাৎ সমাজের বাসনা চরিতার্থ করার উপরেই। যুগের প্রবৃত্তির সহিত যে-রচনার কোন যোগ থাকে না সে-রচনা যুগমনে কোনও আনন্দদায়ক আবেদন জাগাইতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই মূল্য-বিচারে হেয় হইয়া থাকে।

নাটকের গঠন-বৈশিষ্ঠ্য

নাটক-রচনার সময় তিনটী ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রাচীন সমালোচকগণ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাদের বলা হইয়াছে—(১) কাল-ঐক্য (Unity of Time), (২) স্থান-ঐক্য—(Unity of Place) (৩) বিষয়-

ঐক্য (Unity of Theme)। কিন্তু "কাল-ঐক্য" এবং "স্থান-ঐক্য" রীতি বহুকাল আগেই লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে এবং আজকাল রক্ষণ অপেক্ষা লঙ্ঘনের দ্বারাই রীতিটীকে অতি বেশী সম্মান দেখান হয়। তবে 'বিষয়-ঐক্য' রীতি এক হিসেবে 'নাই' আবার অন্য হিসাবে 'আছে'ও বলা চলে। আরিষ্টটল প্রভৃতি বিষয়-ঐক্য বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার হিসাবে 'বিষয়-ঐক্য' রীতিও বহু আগেই লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'বিষয়-ঐক্য'কে একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে 'বিষয়-ঐক্য' আজও আছে—রচনার মূল বা প্রধান উদ্দেশ্যের ধারা ধরিয়াই সে 'ঐক্য' গড়িয়া উঠিয়া থাকে। আধুনিক সমালোচকের অনেকে এই ঐক্যকেই অন্যভাবে 'Unity of Impression' বলিয়া থাকেন। কিন্তু খাঁটি 'বিষয়-ঐক্য' বলিতে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ উপস্থাপ্য বিষয় ছাড়া অবান্তর কোন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নহে, একটা নাটকে একটী বিষয়কেই অভিব্যক্ত করিতে হইবে, এবং অন্য অবান্তর ঘটনা আসিয়া নাটকের মুখ্য ঘটনা-প্রবাহের ধারা বিচ্ছিন্ন না করিয়া ফেলে সে দিকে কড়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে—এই 'বিষয়-ঐক্য'ও আজ উপেক্ষিত। আজিকার নাটকে (বাঙলা নাটকে) এই ধরণের 'বিষয়-ঐক্য' দেখা যায় না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অবান্তর ঘটনার ভিড খুবই বেশী—প্রধান কাহিনীর পাশাপাশি একাধিক অপ্রধান কাহিনীর নিজস্ব নিজস্ব গতিবৈচিত্র্য লইয়া বিরাজ করিয়া থাকে। ফলে দূর-নিকট সকল আত্মীয়-স্বজনের যৌথ পরিবারের মত আকারে যেমন হয় উহা বড় প্রকারে তেমন হয় বিচিত্র। বাংলা নাটক—ঐতিহাসিক নাটক অবশ্য,—এই দিক দিয়া বেশ একটী নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার কাহিনীর লক্ষ্যাভিমুখী গতি তো থাকেই—উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে চলে এবং পরিণাম খুঁজিয়া থাকে।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই নাটকখানি

(আলমগীর) গঠনের দিক দিয়া শুধু যে আকারে বড় এবং প্রকারে বিচিত্র তাহাই নহে, নাটকখানি বিশৃঙ্খল ও 'দ্বৈত-উদ্দেশ্য'ক। ইহা যেন দুই কাণ্ডে বিভক্ত: এক, উদিপুরী-রূপকুমারী কথার পূর্ব্বকাণ্ড; দুই, আলমগীর-রাজসিংহের যুদ্ধের উত্তরকাণ্ড। একটী শেষ হইলে আর একটি কাণ্ড যেন আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে। দুইটী উদ্দেশ্য প্রধান হইয়া পড়ায় নাটকখানির 'বিষয়-ঐক্য' খুবই ব্যাহত।

তবে একটী কথা যে এখানে না বলিবার আছে এমন নহে: একই সময়ে পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে অসম্ভব ঘটনা তাহা বলা চলে না। এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন এমন কোন চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করিলেই যদি 'বিষয়-ঐক্য' না থাকে, তাহা হইলে বিষয় ঐক্য অপেক্ষা সত্য ও স্বাভাবিককেই বেশী শ্রদ্ধা করা সঙ্গত। কথাটী সত্য, কিন্তু আপত্তি সেখানে নহে, আপত্তি এই যে ঘটনাবিন্যাস এমন হইয়া পড়িয়াছে যে নাটকখানির পর্ব্বভাগ স্পষ্টাকারেই চোখে পড়ে। এবং মনে হয় যে-বিষয়কে প্রারম্ভে বীজরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা উপসংহার-পরিণাম লাভ করিবার পরে আর একটি আনুষঙ্গিক বিষয় পরিণতি খুঁজিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথম দৃশ্যটির উপস্থাপনা অন্যরূপ হইলে এবং রূপ-কুমারী কাহিনীকে অত প্রশ্রয় না দিলে নাটকের ঐকিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিত—এ অনুমান অন্যায় নহে। তবে একথাও অবশ্য বলা উচিত যে প্রথম দৃশ্যে উদীপুরী অর্থাৎ রূপকুমারী কাহিনী অগ্রাধিকার পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ-নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যে একেবারে শোনা যায় নাই এমন নহে। নাটকের বীজ যে দ্বিমুখী তাহা একটি কথার মধ্যেই পাওয়া যায়—"এত যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তার ভিতরেও রূপনগরওয়ালীকে আনবার জন্য যদি সম্রাটের ইচ্ছা জেগে উঠে"? কিন্তু দেখা যায়, মুখপাতে উদিপুরীর সঙ্কল্পের উপরেই বেশী পরিমাণে আলোকপাত করা হইয়াছে।

এই ত্রুটি ছাড়াও ঘটনা-বাহুল্য, অবান্তর ঘটনার সমাবেশ নাটকখানির গঠনগত অন্যতম ত্রুটি। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ঘটনার ভিড় এবং ভূমিকার বাহুল্য না থাকিলে নাটকটী উৎকৃষ্ট হইত।" নাটকখানির দৈর্ঘ্য বাস্তবিকই ক্লান্তিদায়ক। এই কারণে কোন্ কোন্ অংশ বাদ দিলে মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রস-হানি হইবে না তাহাও নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে।* দেখা যায়, প্রায় দৃশ্যেই তারকা চিহ্নিত অংশ আছে এবং দুই একটী গোটা দৃশ্যও বর্জ্জনীয় হইয়া আছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এই সকল অংশ ত্যাগ করিলেও "মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রসহানি ঘটিবে না"। অতএব অবান্তরের পরিমাণ যে কম নহে বলাই বাহুল্য এবং নাটকখানির গঠন খুব পরিপাটি নহে—এই সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য।

নাটকে চরিত্র-সৃষ্টি

নাটক-তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ এলারডাইস নিকল মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন যে, উচ্চাঙ্গের নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য—"penetrating and illuminating power of characterisation"—অর্থাৎ অন্তরস্থপ্রবেশী ও সমুদ্ভাসী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে এই ক্ষমতার দৈন্য আছে—পূর্ব্বেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং সেখানেই একথা বলা হইয়াছে যে, মাত্র দুই একটী স্থলেই নাট্যকার চরিত্র-সৃষ্টিতে সন্তোষজনক সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আলমগীর নাটক ক্ষমতা-দৈন্যের সেই ব্যতিক্রম স্থল। এই নাটকে নাট্যকার যেমন দেখাইয়াছেন দ্বন্দ্ব-চেতনা,

* দ্রষ্টব্য : অভিনয়ে সময় সংক্ষেপের প্রয়োজন হইলে * [ ]* অংশগুলি ও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য পরিত্যাগ করিলে মূল নাটকের সৌন্দর্য্য বা রসহানি ঘটিবে না।

তেমন দেখাইয়াছেন সহৃদয়তা। তাই প্রায় চরিত্রেরই মন ও হৃদয় বেশ সংলক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

রাণা রাজসিংহ: রাণা রাজসিংহের মধ্যে রাণা-সত্তা এবং জনকসত্তা পরিস্ফুট স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চরিত্রটীকে সুতীব্র ভাবাবেগে প্রাণবান্ করিয়া তুলিযাছে। তাঁহার দুই সত্তার দ্বন্দ্ব, আপাতবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যেই আত্ম-প্রকাশের উপায় করিয়া লইয়াছে। অন্তর্বিরোধেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে বিরোধাভাসিত বচনভঙ্গীতে। চরিত্রটীর 'অনুভাব' মাত্রা (emotional core) খুবই প্রশংসীয়। কল্পনা-শক্তিও কম প্রশংসনীয় নহে—অনুভাবের গতির বেগ ও বৈচিত্র্য উপযুক্ত বাচনিক বন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে।

বীরাবাঈ: বীরাবাঈ রাঠোর কন্যা, বীরাঙ্গনা—মহারাণা রাজসিংহের যোগ্যতমা ধর্ম্মপত্নী; এই পরিচয অপেক্ষাও বীরাবাঈর আরো একটী বড় পরিচয়—বীরাবাঈ স্নেহময়ী মাতা। সাধারণ মানুষের মোহে তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন মায়ের স্নেহের সর্ব্বত্যাগী সাধনা দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তিই বড় দিগ্‌দর্শক—"প্রাচীন দেওয়ান! মাথার দিক দিয়ে চেয়ো না। যদি পার একবার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ভীমসিংহকে রাজ্যাধিকারী করতে হয়ত এখনও আমি ইতস্তত: করতে পারি, এমন কি বাধা দিতে পারি। কিন্তু যাকে শৈশবে বুকে তুলে স্তন্যদান করেছি, আঠারো বৎসর মাতৃস্নেহে পালন করেছি, দয়াল সা, তার অদর্শনক্লেশ আমি মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পাচ্ছি না।"

চরিত্রটী মাঝে মাঝে অতিমাত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেও একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে চরিত্রটীর গুরুত্ব সন্তোষজনক এবং আন্তর চেহারা একহারা নহে। দোষে-গুণে স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যেই উহা রহিয়াছে।

আলমগীর : তারপর কেন্দ্রীয় চরিত্র—আলমগীর। চরিত্রটীর পরিকল্পনায় নতুনত্বের মাত্রা খুবই লক্ষ্যণীয়। অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বহির্দ্বন্দ্বে চরিত্রটী খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে এবং 'দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব মন্দ ফুটে নাই' (সু-সেন)। কিন্তু মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আসল-নকলের দ্বন্দ্বটী খুব সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মানসিক বিক্রিয়ার স্থায়িত্ব ঐরূপ হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। তবে রঙ্গমঞ্চের পক্ষে বিক্রিয়াটুকু খুবই উদ্দীপক এবং শক্তিশালী হইয়াছে—মনস্তত্ত্বের হিসাবে যে ভুলই উহাতে থাকুক। দ্বিতীয়তঃ ঔরংজীবের হিন্দু-বিদ্বেষের যে ব্যাখ্যাটী নাট্যকার উদিপুরীর মুখে দিযাছেন তাহার নতুনত্বের আকর্ষণও কম নহে। উদিপুরীর উক্তিতে—"তাই সে স্বপ্ন-স্মৃতি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়। সূক্ষ্ম জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে; তারই আতঙ্কে আপনি কি করবেন কিছু ঠিক করতে না পেরে, সমস্ত ভিন্ন-ধর্ম্মীদের উপর অত্যাচার করেন। মনে করেন—তারা কাফের। তাদের উৎপীড়ন করতে পারলেই আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবেন"—। কাফের উৎপীড়নের যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওযা হইয়াছে তাহা অভিনব এবং সেই হিসাবে উহা নাট্যকারের সমীক্ষণ শক্তিরই পরিচায়ক। সচেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সংযোগে, ব্যক্তি-চরিত্রের পরিকল্পনায়—ব্যক্তি-চরিত্রকে সচেতন-অবচেতন মানসিক ক্রিয়ার একক ক্ষেত্রে পরিণত করায়—চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতাই নির্দ্দেশিত করে। 'আলমগীর' ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্টি-প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বাস্তবিক, ব্যক্তিত্বের জটিল রূপ অবধারণ করিবার, চরিত্রে অনুভাব প্রাণ-সঞ্চার করিবার এবং প্রকাশনে কল্পনা-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

তবে নাটকখানির মধ্যে যে যে ত্রুটি পাওয়া যায় তাহাও কম নিন্দনীয়

নহে। গঠন-পরিপাট্যের দৈন্য বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ ত্রুটী ছাড়াও নাটকখানির বড় আর একটী ত্রুটী—ঘটনা-বিন্যাসের অযৌক্তিকতা বা অনৌচিত্য। চমক সৃষ্টির দিকে অত্যধিক ঝোঁক থাকায় ঘটনা-বিন্যাসে কার্য্য-কারণ-বাঁধুনি বার বার ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে—স্থান-কাল-পাত্রের ঔচিত্যভাবেই উপেক্ষিত হইয়াছে। আর একটী বিষয়ও উল্লেখনীয়—চরিত্রের ভাষায় দুই একস্থলে কৃত্রিম কল্পনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে এবং কয়েকটী চরিত্র নিছক 'ভাবে-ভরা ফানুস' হইয়া পড়িয়াছে—চরিত্রের আচরণে উৎকল্পনার অতিরঞ্জন প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বিয়োগান্ত হইলে নাটকখানি মেলোড্রামার পর্য্যায়েই স্থান পাইত।

উপসংহারে এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, ক্ষীরোদপ্রসাদ আর কোন নাটক না লিখিয়া কেবল 'আলমগীর' লিখিলেই নাট্যকার হিসাবে স্মরণীয় হইতে পারিতেন। আর, ত্রুটীবিহীন রচনা যখন এ পর্য্যন্ত একখানিও হইয়াছে কি না সন্দেহ, শেক্সপীয়রের সুবিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলিতেও যখন বহু আপত্তিকর খুঁত রহিয়াছে, তখন উল্লিখিত ত্রুটীগুলির জন্য 'আলমগীর' নাটককে অতি হেয় বলিবার কোন কারণ নাই। এমন অনেক সমালোচকও আছেন যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে একখানিও নাটকের মত নাটক চোখে দেখেন না এবং উন্নাসিকের মত বলেন—'বাংলায় নাটক কোথায়?—বাংলায় নাটক একখানিও লেখা হয়নি'।* এইসকল মোহগ্রস্ত দিঙনাগ সমালোচকদের উপেক্ষা করিয়া বাংলার উল্লেখযোগ্য নাটকের তালিকায় 'আলমগীর'কে সসম্মানে স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে 'আলমগীর' নাটকের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের সহিত মৌখিক আলাপের অভিজ্ঞতা।

বনফুলের শ্রীমধুসূদন

বাংলা সাহিত্যে বনফুল

'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত—প্রায় সাড়ে দশ শতাব্দীর ব্যাপ্তি। বাংলা সাহিত্যের বয়সও এই সাড়ে দশ শতাব্দী—এক হাজার পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী। এই কাল ব্যাপ্তিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে : দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত—(আদি+ মধ্যযুগ) 'প্রাচীন যুগ' এবং পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর—'আধুনিক যুগ' নামে পরিচিত। এই যুগ-বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়---এই বিভাগ শুধু কাল ব্যবধানের দূরত্ব বা অতীতত্ব হিসাব করিয়া অথবা জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক বাঁক বা সন্ধি-কালকে ভিত্তি 'করিয়াই' করা হয় নাই ; ইহার মূলে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ একটি ঐতিহাসিক সন্ধি-যুগকে দেখা গেলেও এই যুগ-বিভাগের আসল ভিত্তি দুই যুগের সাহিত্যের রীতি, রূপ ও রসের প্রকৃতি-গত পার্থক্যটুকু। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সমাজ-বিবর্ত্তন স্তব্ধ হইয়া ছিল, সমাজের দেহে মনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এ কথা সত্য নয় বটে, কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য—এই পর্য্যন্ত, সাহিত্যের রূপ রসের প্রকৃতি প্রাচীনত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল অবধি সাহিত্য-শিল্পের প্রকাশ-রীতি কেন শুধু সুর ও ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইয়াছিল এবং বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ ধর্ম্মমূলক হইয়াছিল এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন যথারীতিই ঘটিয়াছে কিন্তু যাহাকে বলে "বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন" তেমন কিছু ঘটিতে পারে নাই।

হিন্দু-বৌদ্ধ শাসনাধিকারে যে রাজ-অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল,

মুসলমান অধিকারে তাহাতে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মুসলমান শাসকরা (পাঠান-মোগল) শিল্পে-সাহিত্যে দর্শনে-বিজ্ঞানে কোন অংশেই উন্নত না থাকায়, বরং অধিকতর অনুন্নত থাকায়, বাংলার সামাজিক জীবনের সহজ গতিকে তাহারা অনেক পরিমাণে ব্যাহতই করিয়াছিল। অন্ততঃ এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য—যে হিন্দু-সংস্কৃতিতে নূতন কিছু যোগ করার যোগ্যতা তাহাদের ছিলনা। এই কারণেই, পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়কে—ইংরেজ শক্তির বিজয়কে, অনেক ঐতিহাসিক "নবযুগের সূচনা" বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—In 1957 we crossed the frontier and entered into a great new world···it was the begining slow and upper-ceived of a glorious dawm···On July 23, 1757 the middle ages of India ended and her modern age began. ১৭৫৭ খ্রী: ভারতের মধ্যযুগের অবসান—আধুনিক যুগের প্রারম্ভ। ইংরেজ-শক্তির বিজয়লাভকে এই ভাবে অভিনন্দন করায আমাদের অনেকেরই মন কেমন কেমন না করিয়া পারে না, কিন্তু ঐতিহাসিক সরকার মহাশয় যে অর্থে ইহাকে "glorious dawn"-এর সূচনা বা "great new world"-এ প্রবেশ বলিয়াছেন, তাহাতে আপত্তি করা চলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্পে-সাহিত্যে সমুন্নত ইংরেজ জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটা—তথা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সভ্যতার সহিত সংযোগ লাভ করিবার সুযোগ লাভ করা, জীবনী-শক্তিহীন জাতির পক্ষে অবশ্যই সৌভাগ্যের কথা। যদিও এ কথা খুবই সত্য যে ইংরেজ-শাসকরা আমাদের কম শক্তহাতে শাসন করেন নাই বা কম জোরে শোষণ করেন নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তেমনি সত্য—যে "ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ)—এবং "আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই" জাগাইয়াছে।

সত্যের অপলাপ না করিলে এ কথা বলিতেই হইবে—ইংরেজ জাতির জীবনের আঘাতে আমাদের জীবন জাগিয়া উঠিয়াছে এবং "দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্য কুঞ্জে ফুলের উৎসব" যেমন করিয়া জাগায়, ঠিক তেমন করিয়াই ইংরেজ সাহিত্যের দক্ষিণে হাওয়া আমাদের সাহিত্য-কুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে—উন্নততর সভ্যতার আলোক-আকর্ষণে আমাদের সভ্যতা পাপড়ি মেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়েকটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে ইংরেজ-অধিকার কি ভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে নূতন পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে এবং জাতির আত্মবিকাশের তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি নয়া বাংলার গোড়া পত্তন করিয়াছে—অসঙ্কোচে এ কথা বলা যায়। প্রথম ঘটনা—১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে "The particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathens"—নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই সমিতির উদ্দেশ্য—"Conversion of the Heathen"—সিদ্ধ করিতে টমাস এবং উইলিয়াম কেরী বাংলায় আসেন এবং ক্রমে শ্রীরামপুর মিশন—ঘাঁটি স্থাপন করেন। অনুপ্রবেশের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষা-শিক্ষা চাইই চাই। সুতরাং সকলের আগে চাই—মুদ্রাযন্ত্র এবং বাংলা অক্ষর। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া টমাস ও কেরী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অজ্ঞাতসারেই বাঙালী জাতির মহোপকার করিয়া বসেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ হইতে দুর্লঙ্ঘ্য একটি বাধা সরাইয়া দেন। এই সঙ্গেই স্মরণীয় —১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রতিষ্ঠিত বাংলা হরফ তৈয়ারীর কারখানা এবং আমাদের পঞ্চানন কর্মকার মহাশয়।

মুদ্রাযন্ত্রের জীবনী-শক্তি যোগায় অক্ষর-কারখানা। সুতরাং কারখানাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য এবং

কথাটি এই-যে মুদ্রাযন্ত্রই মানুষের প্রকাশকে—ভাষাময় রচনাকে—দেশ-কাল-পাত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে। প্রকাশের পর্য্যায়গুলির দিকে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায়—প্রথমে 'বলা'র স্তর, দ্বিতীয়—'লেখা'র স্তর, তৃতীয়—'মুদ্রণে'র স্তর। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই তিনটি স্তরের সম্পর্ক আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। **কথিত প্রকাশের** পর্য্যায়ে শ্রুতি ও স্মৃতি আশ্রয় করিয়া প্রকাশকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সুতরাং দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে সে প্রকাশ সীমাবদ্ধ। **লিখিত প্রকাশের** স্তরে, দেশ-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা কিছুটা দূর হয় বটে কিন্তু পূর্ণ মুক্তি সম্ভব হয় না। পূর্ণ মুক্তি আসে—**মুদ্রিত প্রকাশের** স্তরে। প্রকাশকে তখন আর সামাজিক অনুষ্ঠান-উৎসবের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না এবং তাহা হয় না বলিয়াই সাহিত্যের রূপে-রসে বৈচিত্র্য দেখা দিয়া থাকে। এই কারণেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ব্যাপার। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে, শাস্ত্র-সাহিত্যকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সামর্থ্য যাহার আছে, তাহার আবির্ভাবে যে জাতির মানস-মুক্তি ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনা—গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কর্ত্তৃক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে **"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা"**। পাদ্রীদের বাংলা শিখিবার প্রেরণা আসিয়াছিল ধর্মপ্রচারের আবেগ হইতে—আর এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—ভারতবর্ষকে ভালভাবে শাসন-শোষণের নাগপাশে বাঁধিবার জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে। উদ্দেশ্য উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই যাহা করা হউক, আমাদের লাভের ঘরে অঙ্ক জমিতে লাগিল। বাংলা ভাষাই যে শুধু ব্যাকরণের সূত্রে সংগ্রথিত সংগঠিত হইল তাহা নহে, বাংলা সাহিত্যে নূতন রূপ-রসের ফসল ফলিতে আরম্ভ করিল। এই কলেজের পণ্ডিত-পাদ্রীদের হাতেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল।

রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩), গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ (১৮০২), তারিনীচরণ মিত্রের—ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্সীর—তোতা ইতিহাস (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির হিতোপদেশ (১৮০৮), হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ-পরীক্ষা (১৮১৫), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদার্থ কৌমুদী এবং উইলিয়াম কেরীর গ্রন্থাবলী :—(১) নিউ টেষ্টামেণ্ট (১৮০১), (২) বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১), (৩) কথোপকথন (১৮০১), (৪) ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—মোশার ব্যবস্থা (১৮০২), (৫) কৃত্তিবাসের রামায়ণ (১৮১২), (৬) কাশীদাসের মহাভারত (১৮০২), (৭) ওল্ড টেষ্টামেণ্ট—দাউদের গীত (১৮০৩), (৮)—ঐ—ভবিষ্যদ্বাক্য (১৮০৭), (৯) ঐ—যিশরালের বিবরণ (১৮০৯), (১০) ইতিহাস মালা, (১১) বাংলা-ইংরাজী অভিধান (১৮১৫-২৫)—এই সকল রচনার সাহিত্যিক মূল্য কিছু থাক আর না থাক—ঐতিহাসিক মূল্য খুবই বেশী। ইহারাই নব-যুগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রাচীন প্রকাশ-রীতির এবং বিষয়বস্তুর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ইহাদের এই মুক্তিপথে যাত্রা, বাংলা সাহিত্যকে নবদিগন্তের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। তৃতীয় **ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—১৮১৭ খৃঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।** ইংরাজী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিযা দিয়া এই কলেজ বাঙালীর মনে-প্রাণে—সমাজ-জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য-শিল্প, দর্শন-বিজ্ঞান, নূতন আকাশের মুক্তি এবং এক নূতন আলোকরশ্মি লইয়া বাঙালীর কাছে উপস্থিত হইল—মস্তিষ্কে উদ্দীপিত করিল নূতন নূতন মননের আবেগ, হৃদয়ে সঞ্চারিত করিল জগৎ ও জীবনকে নূতন আবেগে উপলব্ধি করার ঐকান্তিক আস্পৃহা।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কলেজই বাঙালীকে নবভাবে নব ভাবনায় দীক্ষা দিয়াছিল। 'আধুনিক বাংলা' বলিতে যে বাংলাকে বুঝায় তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিল। এ কথা বলিলে অন্যায় করা হইবে না যে হিন্দু কলেজই আধুনিক বাংলার হৃদয়-মন গঠন করিয়াছিল।

আর একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা গেজেটি'—সমাচার দর্পণের আগে কি পরে তাহা যত তর্কের বিষয়ই হউক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, সাময়িক-পত্রই নবযুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়াছিল—(এখনও প্রধান বাহন)। মুদ্রাযন্ত্রের অনিবার্য্য শুভ ফলের মধ্যে—সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্র অন্যতম। শিক্ষিত বাঙালীর নবোন্মেষিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ভুলিলে চলিবে না—বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই প্রথম সাময়িক পত্রে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও তাহাই হয়। এই সমস্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সমষ্টিগত ফল— বাংলার নব জাগরণ—জ্ঞানে-ভাবে-কর্মে নূতন করিয়া বাঙালীর আত্মোপলব্ধির সাধনা। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই দেখা যায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, দীনবন্ধু, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদ-প্রসাদ এবং আরো অনেকের সাহিত্য-সাধনার ফলে বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডার কাব্য-মহাকাব্য-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বিগত নয় শতাব্দীর সাধনার সহিত তুলনা করিলে এই সমৃদ্ধি অবশ্যই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইবে। বিংশ শতাব্দীর দানের পরিমাণ, শতাব্দীর অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই যে মাত্রায় পৌঁছিয়াছে, তাহা যে কোন জাতির পক্ষেই সৌভাগ্য-সূচক বলা যাইতে পারে। কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের সংখ্যা ও

গুণগত উৎকর্ষ লইয়া, বাঙালীর আর তেমন লজ্জা বা দৈন্য প্রকাশ করিবার কারণ নাই। বাংলা-সাহিত্যে 'শক্তির আয়োজন তেমন সন্তোষজনক হয় নাই বটে, কিন্তু "ভোজের আয়োজন" হইয়াছে—যথেষ্টই। এই আয়োজনে, কাব্য-নাটকের পরিমাণ যা-চাই মাত্রায় পাওয়া না গেলেও, গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্য যে প্রায় সমুদ্রের বিশালতার কাছাকাছি গিয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে—স্বীকার করিতেই হইবে—নয় শত বৎসরে আমরা যাহা পাই নাই, দেড়শত বৎসরে তাহার শত-সহস্রগুণ পাইয়াছি। কিন্তু এই পাওয়া কি আকস্মিক? অকারণ? যত বিস্ময়করই এই জ্ঞান-কল্পনা-কর্মের বিভূতি মনে হউক ইহা কিন্তু কোন আকস্মিক বা দৈব-ইচ্ছার ফল নহে। ইহার পিছনে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-কল্পনা কর্মের সাধনা প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে। প্রতীচ্যের এবং আমাদের নিজেদের বৈজ্ঞানিক সাধনার, দার্শনিক সাধনার, শিল্প-সাধনার এবং জীবন-চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করাইয়া দেখিলেই ইহার কারণটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। শুধু বাঙালীর জীবনেই নয়, বিজ্ঞান-দর্শনেও এই দেড়শত বৎসর যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। এই দেড়শত বৎসর বিজ্ঞান এত দ্রুত এবং এত দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার ফলে মানব-সভ্যতা যেন এক লাফে অনেক শত বৎসরের ব্যবধান ডিঙাইয়া গিয়াছে। এই সময়েই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়াছে। প্রকৃতির এবং জীব জগতের রহস্যের গভীরতম প্রদেশে বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রচক্ষুর আলোক প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়েই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের-বলে-বলীয়ান হইয়া বস্তুবাদী দর্শন দিগ্বিজয়ীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলেই বাস্তব এবং মানস সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ায় উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ, উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তেমনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাও বাড়িয়া গিয়াছে। রাশিয়াতে ও

চীনে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বা সাম্যবাদের দ্বন্দ্বে প্রত্যেক সমাজই অস্থির ও অশান্ত—অবশ্য কেহ বেশী আর কেহ কম, এই যাহা পার্থক্য। বস্তুবাদী-দর্শন জগৎ এবং জীবনে বিধাতার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না বলিয়াই সমাজ-ব্যবস্থাকেও 'বিধাতার বিধান' অতএব অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করে না—মনে-করে সমাজ ব্যক্তির সমবায়েই গঠিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই সামাজিক কার্য্য পরিচালনায় এবং কুসমাজের ধনসম্পদে সমান অধিকার আছে। বিজ্ঞান মানুষকে জগৎ ও জীবন দেখার নূতন দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরোক্ষভাবে নূতন সমাজ শ্রেণীবিহীন শোষণমুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রেরণাও যোগাইয়াছে। সে মানুষের অমৃতের সন্তান হওয়ার মর্য্যাদা কাড়িয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু বিনিময়ে, মানুষকে, সামাজিক জীব হিসাবে পূর্ণ মর্য্যাদায় বাঁচার অধিকার দাবী করিতে প্রেরণা দিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই—দেখা যায়, সমাজ-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সংস্কার লইয়া ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তির অধিকার, সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনে এবং শ্রেণী বিভাগে উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার স্থান, শ্রেণীদ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি, পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার উৎপত্তি শ্রীবৃদ্ধি এবং বিলয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মানব-সমাজকে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সর্বপ্রকার শাসনের ও শোষণের কবল হইতে মুক্ত করার আবেগ, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ-দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই আবেগকে সংক্ষেপে—সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আবেগ বলা যাইতে পারে। দেখা যায় বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদও অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রেই বাস্তবতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে এই বাস্তবনিষ্ঠাকে আমরা বলিতে পারি—**দার্শনিক বাস্তব-বাদিতা** (Philosophical Realism) অধ্যাত্মবাদের সহিত বস্তুবাদের

বিরোধ শাশ্বতিক। উনবিংশ শতাব্দী হইতে এই দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদ কোণঠাসা হইলেও সংগ্রাম এখনও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছায় নাই,—বস্তুবাদ অবিসংবাদিত আনুগত্য আজও লাভ করে নাই। অশিক্ষিত জনসাধারণ এখনও অন্ধ বিশ্বাসে এবং কুসংস্কারের পঙ্কেই ডুবিয়া আছে। যাহা হউক, দর্শনের ক্ষেত্রে বাস্তববাদিতা বলিতে কার্য্যতঃ বস্তুবাদী দর্শনকে স্বীকার করাই বুঝায় এবং সেই স্বীকৃতি অন্যতম আধুনিক মনোভাব।

এই বাস্তববাদিতার সাধারণ রূপ দেখা যায়—অতিপ্রাকৃতকে (supernatural) বিশ্বাস না করায় অর্থাৎ জগৎ এবং জীবনকে প্রাকৃতিক সামগ্রী রূপে স্বীকার করায়। "সুপারন্যাচারালিজম"—এই বিপরীত মতবাদকে, যদি "ন্যাচারালিজম" বলা যায়—বলা হইযাও থাকে—তাহা হইলে বলিতেই হইবে দার্শনিক বাস্তববাদিতার সহিত প্রাকৃতবাদিতা (Naturalism) অবিচ্ছেদ্য যোগেই যুক্ত। এই বাস্তববাদিতার বিশেষ একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে—মানুষের—জৈবিক সত্তাকে বড়ো করিযা দেখার মধ্যে। এই প্রবণতাকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—জীবতাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা (বাওলজিকাল রিয়ালিজম ?) মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও বাস্তববাদিতার প্রসার ঘটিতে থাকে। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে বাস্তববাদিতার (Psychological Realism) প্রবণতা প্রকাশ পায়—মনের জগতেও কার্য্য-কারণ নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করায় এবং মানসিক ক্রিযায় সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করায়। জীবতাত্ত্বিক যেমন ব্যক্তির মৌলিক বাসনার-রহস্য ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র, মনস্তাত্ত্বিক তেমনি ব্যক্তি-মনের রহস্য ব্যক্ত করিতে প্রবণায়িত। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের আলোকে ইহাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত। মানসিক ক্রিযার জটিলতা প্রকাশ করার দিকেই ইহাদের ঝোঁক বেশী। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে বাস্তববাদিতা তাহাকে আমরা বলিতে পারি—সোসিযোলজিক্যাল রিয়েলিজম। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হইযাছে। সংক্ষেপে এখানে বলা যায় সমাজতাত্ত্বিক বাস্তব-

বাদী বিশেষভাবে মানুষের সামাজিক জীবনকে শাসন-শোষণমুক্ত অবস্থায় উন্নীত করার স্বপ্ন দেখে—সাধনা করে বা প্রেরণা যোগায়। ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখকে ইহারা সমাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করে। শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং মুক্ত জীবনের পক্ষে, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার পক্ষে সংগ্রাম করা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ-বিংশশতাব্দীর আধুনিকতা মূলতঃ এই সকল প্রবণতার মধ্যেই নিহিত। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে—উল্লিখিত বাস্তববাদের মূল খাতেই প্রকৃত আধুনিকতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাচীনের সহিত আধুনিকের পার্থক্য দেখাইতে হইলে—জীবন-দর্শনের তথা নানা মনোভাবের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াই দেখাইতে হইবে। পূর্ব্বের আলোচনা অনুসারে, প্রকৃত আধুনিক বলা যায় তাঁহাকেই যিনি বিজ্ঞান-সমর্থিত দার্শনিক বাস্তববাদে এবং তদানুষঙ্গিক মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও সমাজ-নৈতিক বাস্তববাদে পূর্ণ-মাত্রায় বিশ্বাসী। তবে দার্শনিক বাস্তববাদে বিশ্বাস না করিয়াও অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হইয়াও কেহ কেহ আধুনিকতার অন্যান্য প্রবণতা প্রকাশ করিতে পারেন: যেমন জীবনলীলাকে স্বরূপে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন—নিরাসক্ত চিত্তে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির জটিল দ্বন্দ্বকে রূপ দিতে পারেন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমাজের ও ব্যক্তির স্বাধীনতার পক্ষে—ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগের জন্য সংগ্রাম করিতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে আধুনিকতার সাধারণ প্রবণতা প্রকাশ করিতে পারেন। তাই বলিয়া তাঁহাদের পূর্ণ আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

শাশ্বত আধুনিকের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যেকথা বলিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; তিনি লিখিয়াছেন—"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদগত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই

উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক"। নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা আধুনিকতার শাশ্বত লক্ষণ হইতে পারে কিন্তু নিরাসক্ত চিত্ত কথাটির অর্থ খুব সুনির্দিষ্ট নহে বলিয়া ভুল বুঝিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সমগ্রদৃষ্টিতে দেখার মধ্যে দার্শনিক সংস্কার প্রবেশ করিতে বাধ্য। এই দার্শনিক সংস্কার যদি বৈজ্ঞানিকসিদ্ধান্ত ভিত্তিক বস্তুবাদী দার্শনিক সংস্কার হয় তাহা হইলে—আমাদের দেওয়া আধুনিকতার লক্ষণের সহিত কোন বিরোধ থাকিবে না। তাহা না হইলে নিরাসক্ত চিত্তে দেখাকে আধুনিকতার সামান্য লক্ষণ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষভাবে আধুনিক বলা যায় তাঁহাকেই যাহার মধ্যে আধুনিকতার বিশিষ্ট রূপটি সর্বতোভাবে অভিব্যক্ত—যিনি পরাদর্শনে, সমাজ-দর্শনে, নীতি-দর্শনে, সর্বদর্শনেই আধুনিক—যিনি জ্ঞানে আধুনিক—অনুভবে আধুনিক এবং এষণাতে আধুনিক। বলাবাহুল্য এই জাতীয় আধুনিক আধুনিকের পরাদর্শ। এই পরা-আদর্শে কেহ পৌঁছিয়াছেন কি না সে প্রশ্ন ভিন্ন বটে কিন্তু এই পরা-আদর্শের সহিত মিলাইয়া মিলাইয়াই আধুনিকতার মাত্রা তারতম্য বিচার করিতে হইবে ; বিচারের অন্যকোন পথ নাই। অবশ্য সব আধুনিকই যে সমানভাবে সমস্ত প্রবণতা ব্যক্ত করিবেন এমন কোন কথা নাই। তাই প্রবণতার প্রাধান্য অনুসারে, আধুনিকদের আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করিতেপারি ; তবে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে—এই শ্রেণী বিভাগ মোটামুটি বিভাগ মাত্র।

(ক) একশ্রেণীর আধুনিকের দৃষ্টি এবং সৃষ্টি জীব-বিজ্ঞান অনুশাসিত। ইহারা মৌলিক বাসনা কামনার বৃত্তের মধ্যেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া, বাসনার উলঙ্গ রূপটিকে প্রকাশ করিতে চাহেন। (খ) আর এক শ্রেণীর

আধুনিকের দৃষ্টি ও সৃষ্টি মনঃসমীক্ষণ-শাসিত। মানসিক ক্রিয়ার জটিলতা—সংজ্ঞান-অসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান মনের রহস্যময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপ দেওয়ার দিকেই ইহাদের ঝোঁক। ইহারা এক কথায়—মনস্তত্ত্ব-রসিক। (গ) আর এক শ্রেণীর আধুনিকের—দৃষ্টি সমাজ-নৈতিক সমস্যা ও উহার সমাধানের দিকে প্রধানতঃ নিবদ্ধ। ইহা খুবই মোটামুটি বিভাগ। ঝোঁকের প্রাধান্যই এই বিভাগের ভিত্তি। একাধিক ঝোঁক একজনের মধ্যে থাকিতে পারে এবং থাকেও। সুতরাং এই শ্রেণী চিহ্ন প্রয়োগ করিবার আগে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। নহিলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িবার আশঙ্কা আছে এবং সে আশঙ্কা খুবই বেশী।

যাহা হউক প্রতীচ্যের এই সব আধুনিকতার প্রবণতা—(দার্শনিক মনস্তাত্ত্বিক— নীতিতাত্ত্বিক— সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা)—প্রতীচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ঐ কূলের সব ঢেউই এই কূলে আসিয়া আঘাত দিয়াছে। উহারা যাহা সাধনা করিয়া লাভ করিয়াছে আমরা তাহা দান হিসাবে অনায়াসেই পাইয়াছি। উহাদের জীবনের সহিত সমান তাল রাখিয়া চলিতে না পারিলেও, উহাদের মননের অনুমনন করিতে, অথবা রীতি ও রুচির অনুকরণ করিতে আমাদের বাধে নাই। পিছনে পিছনে চলিলেও আমরা খুব পিছাইয়া থাকি নাই। উহাদের উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা এবং আমাদের উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার—মাত্রার দিক দিয়া সমান নহে, তবু উহাদের মধ্যে স্পষ্ট একটা বিম্ব—প্রতিবিম্ব ভাব লক্ষ্য করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত, আধুনিকত্বের ক্রম বিকাশের ধারা পর্য্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে—নানামুখী প্রবণতার অস্ফুট প্রকাশ হইতে সুপরিস্ফুট প্রকাশ পর্য্যন্ত আধুনিকতার সব রূপই কম বেশী আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত পর্বে ভাগ করিয়া লইতে পারি :—

প্রথম পর্ব—১৮০০ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত। ইহাকে "প্রস্তুতি পর্ব" বলা যায়। এই সময়ে, বাংলা ভাষা সংগঠিত হয়, বাংলা গদ্য সাহিত্যের গোড়া-পত্তন হয়—প্রকাশ রীতিতে এবং প্রকাশ্য বিষয়েও নূতনের আবির্ভাব ঘটে—রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভবানীচরণ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া জাতির নূতন জীবন-স্পৃহা, সংকীর্ণতামুক্ত উদার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অস্ফুটাকারে ব্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্ব—[১৮৫৮ (১৮৬৫) ১৮৭৩] বিদ্যাসাগর রঙ্গলাল—মধুসূদন বিহারীলাল—ভূদেব—দীনবন্ধু—বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির যুগ। ১৮৬৫ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে পর্বটির পশ্চিম দিগন্ত নূতন রশ্মির আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে—তৃতীয় পর্বের সূচনা হয়, নূতন জীবনাবেগের তীব্র অনুভূতিতে, ইহাদের প্রত্যেকেরই শিরা উপশিরা, উষ্ণ রক্তের দ্রুত প্রবাহে চঞ্চল, দেহ-মনে রোমাঞ্চিত আবেশ বিহ্বলাতে, চোখ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

তৃতীয় পর্ব—[১৮৭৩—(১৮৮০)—১৮৯৩]—বঙ্কিমচন্দ্র (কেন্দ্রপুরুষ) রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির যুগ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব হইতেই—রবীন্দ্রনাথের নূতন জ্যোতি সাহিত্যাকাশে নব প্রভা সঞ্চার করিযা আসিযাছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতিও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জাতিকে সর্বতোভাবে মুক্ত করিবার জন্য—ইহারা যে সাধনা করিয়াছেন ব্যক্তির প্রাণ-মন-আত্মার মুক্তির জন্য যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আধুনিকত্ব বা প্রগতিশীলত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

চতুর্থ পর্ব—[১৮৯৩-১৯২০] রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র-লাল, প্রভাতকুমার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন,

কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, মোহিতলাল প্রভৃতির কাল। **পঞ্চম পর্ব:**—১৯২০ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত: **রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগ বটে,** কিন্তু অতি আধুনিকতার কলকল্লোলে এই **পর্ব** মুখরিত। এই আধুনিক গোষ্ঠীর কালি কলমে সেই অতি-আধুনিকতার নূতন রঙ ও রেখার বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। **কাব্যে** রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, জসিমুদ্দিন, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, হুমায়ূণ কবীর, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি; **গল্পে উপন্যাসে**—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, নরেশ সেনগুপ্ত, মনীন্দ্র বসু, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়* **বনফুল**, মনোজ বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল বুদ্ধদেব বসু, প্রভৃতি; **নাটকে**—রবীন্দ্রনাথ, বরদা দাশগুপ্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, নিশিকান্ত বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ, অমৃত বসু, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, সতীশ ঘটক, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, **বনফুল**, মনোজ বসু প্রভৃতির রচনায় এই পর্ব সুসমৃদ্ধ। **ষষ্ঠ পর্ব**—১৯৪০ হইতে আজ পর্যন্ত অতি-আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে পূর্ববর্তী পূর্বের অনেকেই আছেন—আরো অনেকে আছেন, নূতন নূতন কবি, কথা-সাহিত্যিক, নাট্যকার। **কাব্যে** জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র, দীনেশ দাস, সমর সেন, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, মনীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অশোক বিজয় রাহা, সুকান্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, শিবদাস চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি **গল্পে-উপন্যাসে**—গোপাল হালদার, সুবোধ ঘোষ, সুশীল জানা, নরেন মিত্র, নারায়ণ গাঙ্গুলী, নবেন্দু ঘোষ, বিমল কর, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষ ঘোষ, কুমারেশ বসু, সাবিত্রী রায়, সুবোধ মজুমদার প্রভৃতি এবং **নাটকে**—মহেন্দ্র গুপ্ত, অয়স্কান্ত বক্সী, প্রমথনাথ বিশী, বিজন ভট্টাচার্য্য, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীদাস লাহিড়ী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী, শীতাংশু মৈত্র প্রভৃতি।

বলা বাহুল্য—প্রত্যেক পর্বে প্রত্যেক বিভাগেই আরো বহু নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিস্তার ভয়ে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাঁহাদের রচনার মূল্য যে উল্লিখিতনামাদের রচনার মূল্য হইতে সবদিক দিয়াই কম তাহা যেন কেহ মনে না করেন। আর একটা কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার। আধুনিক যুগের লেখকমাত্রেই সর্বতোভাবে আধুনিক—এ কথা মনে করিলেও ভুল করা হইবে। আধুনিকতার সাধারণ লক্ষণ অনেকের মধ্যেই পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু বিশেষ লক্ষণটি—অর্থাৎ দার্শনিক বাস্তববাদিতা —জীবতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা এবং সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদিতা প্রভৃতির মধ্যে আধুনিকতার যে বিশেষ লক্ষণ রহিয়াছে—তাহা কম লেখকের মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইবে। আমরা দেখিতে পাই—অনেকেই অধ্যাত্মবাদের গণ্ডী পার হইতে পারেন নাই। তবে জীবনের রূপকে, যথাসম্ভব অনাসক্তভাবে আঁকিতে গিয়া আধুনিক প্রবণতার একাধিক প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ দার্শনিক বাস্তববাদিতা খুব সচেতন ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও—অজ্ঞাতসারেই জীবতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদের খানিকটা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ সমাজ সমস্যা ও শোষণ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার রূপটিকে স্পষ্টভাবে ধ্যানের ধনে পরিণত করিতে পারেন নাই। সুতরাং নামে আধুনিকের সংখ্যা যত বেশী, কার্যে আধুনিকের সংখ্যা ততো বেশী হইবে না।

* * * *

"বনফুল"—পর্ব-বিভাগ অনুসারে—পঞ্চম পর্বের (ষষ্ঠ পর্বেরও) সাহিত্যিক। ১৯১৮ হইতে আজ পর্য্যন্ত বনফুল তাঁহার সৌরভ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রাঙ্গন বনফুলের বর্ণে-গন্ধে আমোদিত। কবিতা-গল্প উপন্যাস-নাটকে বনফুলের যেন শতদল বিকাশ—পাপড়িতে পাপড়িতে বর্ণ-

গদ্যের বিচিত্র বাহার। কবিতা ও নাটকে তাঁহার দান যাহাই হউক, গল্প-উপন্যাসে বনফুল একাই একশো। সমগ্র রচনার মধ্যে, ভাবনা-কল্পনা-অনুভব শক্তির বিভূতি লইয়া যে "বনফুল" আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ এক নজরে ধরিবার মতো নহে।

"বনফুল" বনফুল হইতে পারেন, কিন্তু খুব গহন বনের ফুল নহেন—বুনো ফুল নহেন। পরিচয়ে প্রকাশ—"১৩০৬ বঙ্গাব্দে পূর্ণিয়া জেলার মনিহারি গ্রামে জন্ম। আদিবাস হুগলি জেলার শেয়াখালায়। শিক্ষা মনিহারি ও সাহেবগঞ্জ ইস্কুলে। পরে হাজারিবাগ থেকে আই-এস-সি পাস করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন; ফাইনাল পরীক্ষা দেবার ঠিক আগে পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ খোলে এবং বিহারের প্রবাসী ছাত্রদের সেখানে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়। ১৯২৭ অব্দে সেখান থেকে এম, বি, বি, এস পাশ করেন। কলিকাতায় কিছুকাল ডাক্তার চাকবর্ত খানের সহকারীরূপে ল্যাবরেটারির কাজ করেন। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার হন। এখন ভাগলপুরে থাকেন" (বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প) উদ্ধৃত পরিচায়িকাংশ হইতে জানা যাইতেছে—বনফুল অতি দুর্গম বন প্রদেশের ফুল নহেন এবং বুনো ফুলও নহেন। শিক্ষাদীক্ষার অভাব তাহার ঘটে নাই। যুগের সেরা শিক্ষা—ইংরেজী শিক্ষা—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই তিনি পাইয়াছেন। আর যে বৃত্তিটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও এক হিসাবে বৈজ্ঞানিকেরই বৃত্তি—"ডাক্তারি"।

অবশ্য, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাওয়া বা বৈজ্ঞানিকের বৃত্তি গ্রহণ করা—বড়ো কথা নহে। বড়ো কথা হইলে, এতদিনে অতিপ্রাকৃতে-বিশ্বাসমূলক আচার-বিচার কুসংস্কার অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। সুতরাং বড়ো কথা—**বৈজ্ঞানিক সংস্কারটি** পাওয়া—জগতকে ও জীবন-লীলাকে বিজ্ঞান-স্থাপিত সিদ্ধান্তের আলোকে দেখা। যতটুকু বুঝা যায়—বনফুলের মধ্যে বিজ্ঞানের-দেওয়া শিক্ষা পাকা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিকোণে

অতিপ্রাকৃতের মর্য্যাদা তেমন নাই। "নেচারালিজম্" যে অর্থে "সুপার নেচারালিজম্"এর বিপরীত সেই অর্থে বনফুল মোটামুটি প্রাকৃতবাদী (naturalist)। অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত কোন দৈবশক্তিতে তিনি ততো বিশ্বাসী নহেন। তাহাই তিনি বিশ্বাস করেন যাহা যুক্তি-সিদ্ধ—যাহা অভিজ্ঞতা লব্ধ। তবে তাঁহার রচনায় অতিপ্রাকৃত-জগতে-বিশ্বাসের উপাদান না মিশিয়াছে এমন নহে, কিন্তু সেগুলি আসিয়াছে—প্রাকৃতকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় হিসাবেই—রচনার আঙ্গিক হিসাবেই—মানুষের আচরণে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের ও সংস্কারের প্রভাব দেখাইবার প্রয়োজনেই। বনফুল অদৃশ্য লোকের কাহিনী বলিয়াছেন দৃশ্যলোকের মানস-সত্যকে সংকেতে ব্যক্ত করিবার জন্যই। অপ্রাকৃত প্রায় কাহিনীগুলির উদ্দেশ্যও একই। যেমন:—'অধরা' গল্পের অধরার চোখের জল—বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির জল মাত্র। 'প্রজাপতি' গল্পে দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্মতির পরেই আশার কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতির উড়ে যাওয়া, মনস্তাত্বিক সংকেত মাত্র। "মালা বদল" গল্পের "অপরূপ-রূপসী" গানের সুরের রূপকমাত্র। "একই ব্যক্তি" গল্পে অদৃশ্য লোকের সাহায্যে বনফুল একই ব্যক্তির মুখ ও মনের অনৈক্যটি দেখাইতে চাহিয়াছেন। আমার মনে হয়—"ছাত্র" গল্পটিতেই বনফুলের প্রাকৃতবাদিতার বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের আচরণ তো শুধু তাহার সংজ্ঞান সত্তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞানের অংশও সেখানে আছে। বহু দিনের সংস্কার মানসিক প্রবণতারূপে ভিতরে থাকিয়া মানুষকে এমন সব কাজ করায় যাহার সহিত মানুষের সংজ্ঞান সত্তার কোন যোগই নাই।

বনফুল থার্ড মাষ্টারকে স্বপ্নে দেখিয়া উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙিয়া তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গায় তর্পণ করিতে ছুটেন বটে কিন্তু 'নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত' হন। ফ্রয়েড চার্বাক যিনি পড়িয়াছেন—বিজ্ঞানের বই যাঁহার খুব প্রিয় এবং প্রায়ই পড়েন—তাঁহার কাছে তর্পণ অবশ্যই 'অযৌক্তিক আচরণ' হইবে। এই রচনাগুলিতে রহস্যবাদের ছোঁয়াচ আছে বটে, কিন্তু

এ রহস্য অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বের রহস্য নয়—মনের রহস্য—মানুষের জটিল আচরণের রহস্য। এই কারণেই বনফুলকে প্রচলিত অর্থে রহস্যবাদী বা অতিপ্রাকৃতবাদী বলা ঠিক হইবে না। অবশ্য 'অদৃশ্যলোকে' গল্প-গ্রন্থের দুই একটি গল্পে—যেমন "নন্দীক্ষ্যাপা", "স্বপ্ন", "হিসাব"—অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের ছোঁয়াচ না লাগিয়াছে এমন নহে। তবে এই জাতীয় গল্প লেখায় বনফুলের "সাহিত্য ধর্মের জন্মান্তর" বা 'শিল্পীর নবজন্ম' সূচিত হইয়াছে—এ কথা বলা যায় না। বনফুলের নিজের ঘোষণা মনে রাখা দরকার—মনে রাখা দরকার তিনি ফ্রয়েড চার্বাক পড়া লোক। তাঁহার নিজেরই স্বীকৃতি—বিজ্ঞানের বই আমার খুব প্রিয়—প্রায়ই পড়ি। কবি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।—"জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর কোনো অতীন্দ্রিয় মোহ নেই, তেমনি কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরক্তি নেই। "দার্শনিক পরিভাষায় যাকে তটস্থ দৃষ্টি বলে, তাঁর দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। জীবন সত্যের নিরীক্ষায় কোনো পূর্বধার্য তত্ত্বের অনুশাসন স্বীকার না করে সর্ব সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে বহু পরীক্ষা ও বহু পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে জীবনকে জানার যে আবেগ, তাঁর ব্যক্তি মাননে সেই আবেগই প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল।"

যাহা হউক, বনফুল চার্বাক-পন্থী দর্শন পড়িয়াছেন এবং খুব সম্ভব বেশী করিয়া পড়িয়াছেন ফ্রয়েডকে অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান। এক কথায়, বনফুল মনস্তত্ত্ব-প্রসক্ত, মনস্তত্ত্বরসিক। এই প্রসক্তি তাঁহার শিল্পি-সত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কত কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা সম্যক জানিতে হইলে, প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসের রীতি এবং বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। এখানে সে অবকাশ নাই। দিগ্‌দর্শন হিসাবে—'সে ও আমি' 'বৈতরণী তীরে' 'অগ্নি' প্রভৃতি মনঃসমীক্ষণ-প্ররোচিত-'রীতি'র উপন্যাসগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের প্রভাব, বনফুলকে আশ্রয়

করিয়া আমাদের সাহিত্যে ভালভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পূবে আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদিতার কথা বলিয়াছি, বনফুলের মধ্যে আধুনিকতার সেই প্রবণতারই একটা বিশেষরূপ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া একথাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না—বনফুলের উপস্থাপনা রীতি অনেকটা সংকেত-ধর্মী অর্থাৎ যাহাকে যথার্থ 'রিয়েলিষ্ট' বলে বনফুল তাহা নহেন। জীবন-সত্যকেই তিনি রসরূপ দিয়াছেন বটে, কিন্তু যে রূপ-কল্পনা বা অঙ্গরচনা তিনি করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকতা অপেক্ষা সাংকেতিকতা বা ভাবতান্ত্রিকতাই বেশী প্রশ্রয় পাইয়াছে। তাহার রচনা পড়িয়া একথা মনে না হইয়া পারে না—কোথাও বনফুল মনস্তত্ত্বের ছাঁচে ফেলিয়া জীবন দেখিয়াছেন, কোথাও জীবনের রূপে মনস্তত্ত্বের মিল দেখিয়াছেন। এই কারণেই—'সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিজম' প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও বনফুল পুরোদস্তুর 'রিয়েলিষ্ট' হইতে পারেন নাই। পারেন নাই—অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু কেন পারেন নাই—বিচার্য্য বিষয় বটে। না-হইতে-পারার কারণ—মনে হয়—বনফুলের স্বভাবের মধ্যে—'রসিক' স্বভাবের মধ্যে—নিহিত আছে। মনস্তত্ত্ব-প্রসক্তি একটা কারণ বটে, কিন্তু কারণের সবটা নয়। যে যে কারণের সংযোগে বনফুল 'হাস্য-রসিক' (হিউমারিষ্ট) হইয়াছেন তাহার সব কয়টি নির্দ্ধারণ করিতে না গিয়া, সংক্ষেপে এখানে বলা যাইতে পারে—বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতা, চার্বাক-পন্থী দর্শনের দৃষ্টি এবং ফ্রয়েডপন্থী মনোবিজ্ঞানের সমীক্ষণ-শক্তি, মিলিতভাবে, বনফুলের মনোভঙ্গীটিকে (attitude) হিউমারিষ্টের মনোভঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে। বনফুলের শিল্পি-সত্তার কেন্দ্রে আছেন এক **হিউমারিষ্ট**—"**রসিক-পুরুষ**"—জগৎ ও জীবনকে স্বরূপে দেখিবার অনাসক্ত অথচ সন্ধানী দৃষ্টি তাঁহার চোখে, জৈবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির শক্তি-ক্ষেত্র রূপে জীবনের লীলাকে পর্যবেক্ষণ করায় তাহার আনন্দ, মনোবিজ্ঞানীর সমীক্ষণ-শক্তি লইয়া মানসিক ক্রিয়াকলাপের রহস্য, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করায় তাঁহার আমোদ। একদিকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞতা, অন্যদিকে অনাসক্ত কৌতূহলী দৃষ্টি আর

সঙ্গে চতুর্দিকে জীবনাদর্শের বিকৃতি ও অস্বীকৃতি—সকলে মিলিয়া বনফুলকে যেন এক 'laughing philosopher'-এ পরিণত করিয়াছে। এক রসিকের চোখে উগ্রশক্তিসম্পন্ন ত্রিশির আতস কাচ (প্রিজম্)। খোলা চোখে দেখিতে যাহা শাদা, এই কাচের সম্মুখে পড়িয়া তাহা সাতরঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। জীবন-রসিক বনফুল এই কাচের ভিতর দিয়া জীবনের রূপ ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছেন ফলে তাহার দৃষ্টিতে, শাদা হাসিকে ঘিরিয়া কান্নার এবং কালো কান্নার চারিপাশে হাসির বর্ণালী ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি-কান্নার শাদা-কালো বর্ণের সংমিশ্রণ করিয়া, বর্ণবিচিত্র রসশবল জীবনের রূপ আঁকিবার শক্তি, এই মনঃ সমীক্ষণের উৎস হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। করুণের মধ্যে হাস্যকর এবং হাস্যকরের মধ্যে করুণ আবিষ্কার করিবার শক্তি উচ্চাঙ্গের রসিকের মধ্যেই দেখা যায়। বনফুলও সেই শক্তির অধিকারী। মনস্তত্ত্বের পাকা জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি—দুয়ে মিলিয়েই বনফুলের এই অধিকারকে পাকা করিয়াছে। বনফুল স্বভাবে—রসিক বলিয়াই এমনটি ঘটিয়াছে।

তবে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে দেখিলে দেখা যাইবে—রসিকতার জন্মভূমি অবচেতন মনের অবদমিত প্রদেশ। উইট বা হিউমারের সহিত অবচেতন মনের নিকট সম্পর্ক আছে (জিজ্ঞাসু পাঠক—ফ্রয়েড রচিত "wit and its Relation to the unconscious"-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন)। বনফুল যদি রসিক হইয়া থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহার অবচেতন মনে অবদমন ঘটিয়াছে বলিয়াই হইয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে—একদিকে বনফুলের দার্শনিক বিজ্ঞতা এবং চতুর্দিকে জীবনাদর্শের বিকৃতি বা অস্বীকৃতি বনফুলকে হিউমারিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন—কায়মনোবাক্যের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তিনি কামনা করেন সেই সব বাসনা পরিপূরণ করিতে না পারিয়াই, বোধ হয়, বনফুল 'হিউমারিষ্ট'। প্রত্যেক অবদমনের সহিত, বেশী কম ব্যথা ও জ্বালা মিশিয়া থাকে। জীবনের নিরুপায় অথচ হাস্যকর আচরণ দেখিয়া বনফুল যেমন ব্যথিত

হইয়াছেন, তেমনি ভণ্ডামি ন্যাকামি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার এক হাতে মার্জনী, এক হাতে সম্মার্জনী। যেমন সরল পাপীকে বা বোকাকে স্নেহ করিতে তাঁহার কুণ্ঠা নাই, তেমনি ভণ্ড ন্যাকাকে ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করিতেও তিনি বিগতকুণ্ঠ। অনাসক্তি-যোগ হইতে রসিক মাঝে মাঝে ভ্রষ্ট না হইয়াছেন এমন নহে। উদার সমবেদনার গণ্ডী মাঝে মাঝে অতিক্রম করিয়াছেন এবং শ্লেষ-ব্যঙ্গের স্তরে নামিয়া আসিয়া আঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বনফুল স্বভাবে রসিক হইলেও লঘু রসিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। সেই জাতীয় রসিক তিনি—যাঁহারা জীবনের বিচিত্র রস-রূপটি সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—বস্তুরূপকে রসরূপে মিলাইয়া লইবার সাধনায় যাহারা সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিক বিষয়বস্তু বা প্লটের অভাব কাহাকে বলে তাহা বনফুল জানেন না। ভস্মকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিবার যাদু যেন তাঁহার করায়ত্ত। ধূলিকে ফুঁ দিয়া চিনি করিতে তাঁহার মতো আর কে পারিয়াছেন? জীবনের 'ভূয়োদর্শন', 'বিন্দু-বিসর্গ' কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতা—সব কিছুকেই যিনি রসরূপ দিতে পারেন, তাহাকে সহজ রসিক বলা গেলেও সামান্য রসিক বলা যায় না। 'গল্পে', 'আরও গল্পে' ও 'বাহুল্যে'—বনফুলের এই যাদুকরী নিদর্শন ছড়ানো রহিয়াছে। সত্য বটে, এই রসিকতা করিবার ঝোঁক বনফুলের স্বভাবের অঙ্গ কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পী বনফুল রসিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। জীবনের রূপকে যেমন রসিক-চিত্তের রস-রূপের আদর্শে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন—বিষয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন; তেমনি আবার জীবনের রূপের কাছে, জীবনের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শুধু রসিকের দৃষ্টিতে নয়, বিষয়ানুরাগী শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনের রূপ আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মাকে যথাসম্ভব বিষয়সাৎ করিয়া দিয়াছেন। তাই জীবনের বিকৃতি, অসামঞ্জস্য প্রভৃতি পরিহাস্য বিষয় লইয়া সদয় বা নির্দয় রসিকতা করিবার প্রবণতার পাশেই জীবনের আবর্ত সঙ্কুল গুরু-গম্ভীর ও

দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ রূপটিকে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছে। 'তৃণখণ্ডে'র মতো জীবন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই স্রোতে কত আবর্ত, কত বাঁকা স্রোতের এলোমেলো সর্পিল গতি! "রাত্রি"র জীবনের মতো গভীর অন্ধকার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমাট বাঁধিয়া আছে। "সেও আমি"র বুঝাপড়া করিতে গিয়া জীবনের হয়রানি, "বৈতরণী তীরে"র যবনিকার উপরে তৃষ্ণাতুর জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার-সংগ্রাম, 'দ্বৈরথে'র দ্বন্দ্ব, 'মানদণ্ডে'র উঠানামা, 'অগ্নি'র শিখা এমনি কত 'স্থাবর' 'জঙ্গম' জীবনের রূপ, কত 'স্বপ্নসম্ভব' অনেক কিছু বনফুলের কবিকল্পনায় স্থান করিয়া লইয়াছে। জীবনকে কমেডি-কারসুলভ রসিকতার দৃষ্টিতে দেখিয়াই বনফুল ক্ষান্ত হন নাই, ট্র্যাজেডি লেখকের গাম্ভীর্য্য বেদনা লইয়াও তিনি জীবনের গভীর রহস্য ও বেদনাবিধুর রূপ অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে মনস্তত্ত্বরসিকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শ যে সর্বত্রই আছে রীতি ও চরিত্র সৃষ্টি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। পূর্বেই এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে বনফুলে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদিতার প্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু মনস্তত্ত্ব প্রবণতার ফলেই, উপন্যাসরীতিতে বাস্তবিকতা অপেক্ষা সাংকেতিকতাই বেশী মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'সে ও আমি' 'বৈতরণী তীরে' 'অগ্নি' প্রভৃতি উপন্যাসের রচনা রীতি লক্ষ্য করিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। অবশ্য 'সে ও আমি' বা 'বৈতরণী তীরে' উপন্যাসে যে বিষয়বস্তু উপস্থাপ্য হইয়াছে তাহাতে সাংকেতিক রীতিই শরণ্য হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আসংজ্ঞানকে (নির্জ্ঞানকেও) 'সে' ব্যক্তির ভূমিকায় দাঁড় করাইতে গেলে এইরূপ রূপক জাতীয় প্রকাশরীতি অনিবার্য্য। তারপর বৈতরণী তীরেও যাহারা সমবেত হইয়াছে তাহাদের আনাগোনার জন্য লেখকের স্মৃতিপট দিবাস্বপ্ন এবং সিনেমেটোগ্রাফিক রীতি আবশ্যক। 'অগ্নি' উপাসক অংশুমানও 'দিবাস্বপ্ন' যোগে বিগত অগ্নি সাধকদের সহিত বারবার মিলিত হইয়াছেন এবং অংশুমানের নিভন্ত অগ্নিতে তাঁহারা তেজ সঞ্চার করিয়াছেন। দিবাস্বপ্ন বাস্তব ব্যাপার হইলেও বিশেষ অবস্থা বা মাত্রার সীমা ছাড়াইয়া গেলে, অবাস্তবিক না হইয়া

পারে না। মনস্তত্ত্বের নানা ব্যাপার—যেরূপ স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন, ভাবানুষঙ্গ ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি প্রভৃতি বনফুলের রচনা রীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। **ফলে শিল্পী বনফুল খুবই রীতি-সচেতন স্রষ্টা।** অদ্ভুত পরিস্থিতি অদ্ভুত চরিত্র এবং অদ্ভুত রীতি রচনার দিকে তাঁহার বিশেষ প্রবণতা রহিয়াছে। মনস্তত্ত্ব রসিকতার উৎস হইতেই যে এই প্রবণতার জন্ম হইয়াছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বনফুলের রচনার বাস্তবতা মাঝে মাঝে অনেকটা **স্যুররিয়েলিজমের রিয়েলিজম** এর স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। গল্প যেন গদ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। ('কবচ' গল্পটি দ্রষ্টব্য) গল্পে-উপন্যাসে 'সাবজেকটিভিটি'র রস-রূপ সঞ্চার করিবার তথা নানা রূপরীতি প্রবর্তন করিবার জন্য বনফুল স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় চিরকাল প্রতিষ্ঠিত ও স্মরণীয় থাকিবেন।

বনফুলের রচনার তালিকা

[ক] **কবিতা** (ব্যঙ্গকবিতা)

বনফুলের কবিতা (১৩৩৬)

অঙ্গারপর্ণী (ইং ১৯৪০)

করকমলেষু (বনফুলের কবিতার পরিবর্তিত আকার) (১৩৫৬)

কবিতা (গম্ভীর কবিতা)

আহবণীয় (ইং ১৯৪০)

চতুর্দশী (১৩৪৭)

[খ] **উপন্যাস**

১। তৃণখণ্ড (১৩৪২)

২। বৈতরণী তীরে (১৩৪৩)

৩। দ্বৈরথ (১৩৪৪)

৪। কিছুক্ষণ (১৩৪৪)

৫। নির্মোক (১৩১৭)

৬। মৃগয়া (১৩৪৭)

৭। রাত্রি (১৩৪৮)

৮। সে ও আমি (১৩৫০)

৯। স্বপ্ন-সম্ভব (১৩৫০)

১০। জঙ্গম [৩ খণ্ড] (১৩৫০-৫২)

১১। সপ্তর্ষি (১৩৫১)

১২। অগ্নি (১৩৫৩)

১৩। ডানা (১ম খণ্ড) (১৩৫৩)

„ (২য় খণ্ড) (১৩৫৭)

„ (৩য় খণ্ড) (১৩৬২)

১৪। মানদণ্ড (১৩৫৫)

১৫। নবদিগন্ত (১৩৫৬

১৬। স্থাবর (১৩৫৮)

১৭। কোষ্টিপাথর (১৩৫৮)

১৮। পিতামহ (১৩৬১)

১৯। পঞ্চপর্ব (১৩৬১)

২০। লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬১)

[বিদেশী বই হইতে 'এডাপ্‌টেশন']

২১। নঞতৎপুরুষ (১৩৫৩)

[ডষ্টয়ভ্‌স্কির Eternal Husband হইতে]

২২। ভীমপলশ্রী

Ben Traversএর Cuckoo in the Nest হইতে

২৩। নিরঞ্জনা (১৩৬২)

[আনাতোল ফ্রান্সের 'থেইস' হইতে]

[গ] **ছোটগল্প**

১। বনফুলের গল্প

২। বনফুলের আরও গল্প (১৯৩৮)

৩। ভূয়োদর্শন (১৯৪২)

৪। বিন্দুবিসর্গ (১৩৫২)

৫। অদৃশ্যলোকে (১৯৪৬ ?)

৬। আরও কয়েকটি (১৩৫৭)

৭। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (চয়নিকা) (১৩৫৫)

৮। কিশোর-কিশোরী (ছোটদের গল্প) [১৩৫৮]

৯। তন্বী (১৩৫৯)

১০। নবমঞ্জরী (১৩৬১)

১১। বনফুলের সম্পূর্ণ গল্প সংগ্রহ (১৩৬২)

১২। বাহুল্য [?]

[ঘ] **প্রবন্ধ**

উত্তর (১৩৬০)

শিক্ষার ভিত্তি (১৩৬২)

[ঙ] **নাটক**

মন্ত্রমুগ্ধ (চিত্রনাট্য (১৯৩৮)

শ্রীমধুসূদন (১৩৪৬)

বিদ্যাসাগর (১৩৫৮)

রূপান্তর (১৩৫২)

দশভাণ [১৩৫১]

মধ্যবিত্ত (?)

বন্ধনমোচন [১৩৫৫]

কঙ্কি [১৩৫৩] (দ্বিতীয় সংস্করণের কাল)

"সিনেমার গল্প" [১৩৫১-৫২] দ্বৈরথ গল্পের নাট্যচিত্র—
"সিনেমা ড্রামা" জাতীয়।

* [তালিকা প্রস্তুত করিতে শ্রদ্ধেয় 'বনফুল' আমাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এইরূপ একটি পরিপাটি তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিতাম না।]

নাট্যকার বনফুল

'বনফুল' বলিতে, প্রথমেই আমাদের মনে **কথা-সাহিত্যিক** বনফুলের মূর্তিটি জাগিয়া উঠে—বনফুলের **মনস্তত্ত্বরসিক-হাস্যরসিক-জীবনরসিক** ব্যক্তিমানসটি ভাসিয়া উঠে। 'কবি-বনফুল'কে বা 'নাট্যকার-বনফুল'কে এমন করিয়া 'কথা-সাহিত্যিক' আচ্ছন্ন করিয়া আছেন যে, কথা-সাহিত্যিকের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া যেন কবিকে বা নাট্যকারকে দেখিতে হয়। অথচ কবি বনফুলের বা নাট্যকার বনফুলের স্বকীয় মহিমাও কম নয়। কথা-সাহিত্যিক বনফুলের মতো, তাহাদেরও স্বকীয়ত্ব আছে। কাব্যের ও নাটকের বনফুলী সৌরভ যথেষ্টই আছে। তবে সেখানেও সেই একই জীবন-দেবতা। বনফুল যেখানে প্রকৃতিস্থ—স্বরূপে অবস্থিত সেখানে তিনি পূর্বোক্ত রসিক-রূপেই প্রকাশিত অর্থাৎ যেখানে তিনি **আপনাকে** প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে তাহার মনস্তত্ত্ব-রসিক বা হাস্য-রসিক সত্তাই বেশী করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর যেখানে তিনি অপর কোন সিদ্ধবস্তুকে রূপ দিয়াছেন সেখানে "রসিক" বিষয়-রসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়—খাঁটি মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে বনফুল **মন্ত্রমুগ্ধ** নামক প্রহসন (১০-৩-৩৮ নিবেদন-কাল) "**কঞ্চি**" নামক একখানি প্রহসন-ঘেঁষা কমেডি, **বন্ধনমোচন** (কমেডি), **মধ্যবিত্ত** (কমেডি) এবং "**দশভাণ**" নামক দশটি একাঙ্কিকা (১০-৬-৪৪ উৎসর্গকাল) লিখিয়াছেন। "**সিনেমার গল্প**"র সাড়ে পনেরো আনা—বা

প্রায় ষোল আনাই, নাটকাকারে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থখানিকে নাট্য-গ্রন্থের তালিকায় স্থান দেওয়া যায় না। ইহার 'উপক্রমণিকা' ও 'উপসংহার' যত সামান্যই হউক, গ্রন্থখানিকে উপন্যাসই বলিতে হইবে—অবশ্য অতি নূতন এক নাট্য-রীতিক উপন্যাসের শ্রেণী কল্পনা না করিয়া তাহা করা যাইবে না। "**রূপান্তর**"কেও মৌলিক রচনা বলা চলে না। নাট্যকার বনফুলের উল্লেখযোগ্য গুরুগম্ভীর দান—দুইখানি চরিত নাটক—শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯) ও বিদ্যাসাগর (১৮ই পৌষ ১৩৪৮ উৎসর্গকাল)। চরিত নাটকের প্রবর্তক না হইলেও অনতি-অতীত স্মরণীয় সামাজিক ব্যক্তির জীবন-চরিত অবলম্বনে নাটক রচনার চেষ্টা বনফুলই প্রথম করিয়াছেন। শুধু এই হিসাবেই তাঁহাকে চরিত-নাটকের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে।

নাটকের সামান্য পরিচয়

মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩৮)। "এই প্রহসনটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত···একটি কুকুর এই নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায় আছে; প্রধান ভূমিকায় মনুষ্যেতর প্রাণীর আবির্ভাব বাঙলা নাটকে এই বোধ হয় প্রথম।" (নিবেদন) প্রহসন হইলেও নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক চিত্রনাট্য—(৬৩ দৃশ্যে বিভক্ত)। মোহনলাল-চুমকির নূতন প্রণয় এবং হারাধন-শুভঙ্করীর পুরাতন প্রণয়ের দুইটি কাহিনীকে গিঁট দিয়া নাট্যকার নাট্যবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। বৃত্তটি এই :—মোহনলাল চুমকীর সহপাঠী —শীর্ণকান্তি গোঁফদাড়ি-কামানো চক্ষু কোটরগত ভাববিহ্বল—পৌরুষহীন আধুনিক যুবক—চুমকীর সঙ্গে বিবাহবিষয়ে একটা মীমাংসা করিতে ব্যগ্র—মীমাংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। চুমকি এম-এ পাশ না করিয়া এবং নিজের পায়ে না দাঁড়াইয়া বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। মোহনলাল তেমনি অধীর। লেকের নির্জন অংশে সন্ধ্যার পরে আলাপ-প্রলাপ করিবার সখ আছে কিন্তু আত্মরক্ষার শক্তি কাহারও নাই। ঘটনাও একটি ঘটে। গুণ্ডা আসিয়া অধিক

বাক্য ব্যয় না করিয়া মোহনের গালে একটা চড় মারে এবং চুমকির কাণের দুল ছিনাইয়া লয়। ভূশায়ী মোহনলাল আস্ফালন করে প্রচুর—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

এদিকে ঝান্নু মল্লিকের সমস্যা কম নয়। 'রিজিয়া' নাটকে বক্তিয়ারের পার্ট করিতে পারে হারাধন। বিনোদ 'ফেল' করিতেছে। হারাধনই বক্তিয়ার সাজিয়া রিজিয়ার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে বটে কিন্তু হারাধনের সমস্যা আরো ঘোরালো। বাঁজা বউ লইয়া মহা ফ্যাসাদ। হারাধন একাধারে তাহার স্বামী ও সন্তান। স্ত্রী তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, নাওয়াইয়া পুঁছাইয়া জামা পরাইয়া খোকাটি বানাইয়া রাখিতে চায়। অসহ্য আদরে হারাধন জর্জরিত। স্বামীকে কুকুর বানাইয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে—এমন বাতিকের মাত্রা। হারাধন এই ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি চায়। তাই ঝান্নু মল্লিক হারাধনের কাছে স্ত্রীকে জব্দ করিবার প্রস্তাব করিলে হারাধনও রাজি হয়।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঝান্নু হারাধন-পত্নী শুভঙ্করীর কাছে যায়—ব্যোম মহাদেও, শঙ্কর ভোলানাথ·· ছাড়া মুখে কথা নাই। মানুষকে কুকুর করা কুকুরকে মানুষ করার মন্ত্রে সন্ন্যাসী সিদ্ধ। শুভঙ্করী স্বামীর পশুভাব দূর করিবার জন্য স্বামীকে দশ দিনের জন্য কুকুর করিতে রাজি হয়। এক দিকে বন্ধ দুয়ারের বাহিরে শুভঙ্করীর মন্ত্রপাঠ চলে, অন্যদিকে একটি কুকুর ঢুকাইয়া দিয়া হারাধন প্রস্থান করে। শুভঙ্করী দরজা খুলিয়া—কুকুরবেশী স্বামীকে দেখিতে পায় এবং সোহাগ করিতে থাকে।

এদিকে শুভঙ্করী আছে কুকুর-স্বামীর সোহাগে ব্যস্ত, অন্য দিকে ঝান্নুদের এক পোড়ো বাড়িতে আছে হারাধন—সর্বদা দাড়ি আর চুল পরিয়া—আর আছে সেই পোড়ো বাড়ীটারই নিকটবর্ত্তী মেয়ে হোষ্টেলে—চুমকী, হোষ্টেলে মোহনলালের আনাগোনা—তাহার মুখে গুণ্ডাকে শায়েস্তা করিবার আস্ফালন আচরণে ন্যাকামি-বোকামি। সর্বোপরি আছে—দাড়ি-গোঁফ পরা হারাধনকে পোড়োবাড়িতে ঐ ভাবে থাকিতে দেখিয়া—হোষ্টেলের মেয়েদের মধ্যে আতঙ্ক। হারাধনের গান

শুনিয়া তাহারা ভয় পায়—চুমকীর দর্শনপ্রার্থী মোহনলাল পর্যন্ত। হারাধনের 'পার্ট' অভ্যাস করাকে তাহারা ভেংচি কাটা মনে করে। ভীরু মোহনলাল গুণ্ডাকে শায়েস্তা করিয়া, চুমকীর কাছে পুরুষকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

ওদিকে কুকুর-স্বামী চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খায়, গদিতে শোয়, অবিরাম স্ত্রীর সেবা ও সোহাগ পায়। কিন্তু কুকুরের এত সহিবে কেন? জীবন সঙ্কট উপস্থিত হয়। ডাক্তার আসে, ওষুধ আসে, পথ্য আসে—আঙ্গুর বেদানা, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া শুভঙ্করীর কান্নাও আসে এবং প্রতিবেশী নয়নতারা আসে—ভাল মানুষ পাগল হইয়া গিয়াছে দেখিতে। অন্যদিকে হারাধনের অবস্থাও কাহিল। বাহিরে দাড়ি-গোঁফের ঝামেলা, ভিতরে মন-কেমন-করা। আবার মোহনলালও মরিয়া। গুণ্ডা না ধরিলে কথা নাই। চাবি তৈয়ারী করাইয়া হারাধনের ঘরে ঢোকে, হারাধনকে না পাইয়া গোঁফদাড়ি লইয়া পালাইতে যায়, পালাইতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং হারাধনের পরিবর্তে থানায় আবদ্ধ হয়।

চুমকীর ভগিনীপতি বিরাজবাবু—পুলিশ ইন্‌স্পেকটর—ভিতরের খবর জানিতে পারিয়া মোহনলালকে বাড়ীতে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসেন এবং মোহনলালকে চুমকীর জেপাজতে পাকাপাকিভাবেই সঁপিয়া দেন। হারাধনকে ধরিতে গিয়া সিগারেটের ধুমো দেখা যায়—হারাধনকে দেখা যায় না। তাহাকে দেখা যায়—তাহার নিজের বাড়ীতে—বিশেষ এক নাটকীয় মুহূর্তে। ঝানু জানে না যে হারাধন বাড়ীতে গিয়াছে। সে লোকমুখে শোনে—হারাধনের বউ পাগল হইয়া গিয়াছে। ঝানু সন্ন্যাসীর বেশে দেখিতে যায় এবং মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়। কুকুর মানুষ করিতে না পারিলে ছাড়াছাড়ি নাই—শুভঙ্করী কুরুক্ষেত্র না করিয়া ছাড়িবে না। সন্ন্যাসীর কোন চালচলনেই সে ভোলে না। কুকুরকে মানুষ করিতেই হইবে। কিন্তু ঝানু-সন্ন্যাসী জলজ্যান্ত কুকুরকে মানুষ করিবে কি করিয়া? ঘোর সমস্যা। সমস্যার সমাধান করে—হারাধন নিজে—"শয়ন ঘরের কপাট খুলিয়া কাপড়ের কষি গুঁজিতে গুঁজিতে প্রবেশ"

করিয়া। ঝান্নুও দমিবার পাত্র নহে। ঝান্নু হারাধনকে চিনিতেই চাহে না ঝান্নুসন্ন্যাসী ঝান্নু-অভিনেতার মতোই সন্ন্যাসিত্ব বজায় রাখিয়া নাটকীয়ভাবে প্রস্থান করে। হারাধনের বউকে জব্দ করিতে গিয়া ঝান্নুও কম জব্দ হয় না।

পরিস্থিতি, কার্য, চরিত্র এবং সংলাপ সবকিছুর সংযোগে হাস্যরস যথেষ্ট মাত্রায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ ভীরু মোহনলালের বীরত্বের আস্ফালন—ন্যাকামি ও বোকামি এবং শুভঙ্করীর কুকুর-সোহাগ, ঝান্নুর সন্ন্যাসীর অভিনয় খুবই হাস্যোদ্দীপক। মোহনলালের উপরে ব্যঙ্গের কটাক্ষপাত সামান্য থাকিলেও, রঙ্গ-কৌতুকই প্রহসনখানির প্রধান লক্ষ্য।

২। **কঞ্চি**। ত্রিনাঙ্ক কমেডি নাটিকা। অঙ্কে কোন দৃশ্য-বিভাগ নাই। নাটিকার বিষয়বস্তু—এক কথায়—অসবর্ণ-বিবাহ বা "একজন শিক্ষিতা সাবালিকার সুস্থ, স্বাধীন সমাজ-সঙ্গত ইচ্ছা"র পক্ষ সমর্থন। দ্বন্দ্ব-পরিকল্পনা এইরূপ:—গোবর্ধন চাটুয্যের কন্যা "কঞ্চি"—ভাল নাম 'সুলতা'—ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক ক্ষিতীশ দাশগুপ্তকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্পিত। ক্ষিতীশ এম. এ. পি. এইচ. ডি.। সেও মনোমত পাত্রী হিসাবে সুশিক্ষিতা হেডমিস্ট্রেস কঞ্চিকেই পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতা গোবর্ধন চাটুয্যে এবং ছেলের বাপ পুরন্দর দাশগুপ্ত উভয়েই এ বিবাহের ঘোর বিরোধী। গোবর্ধনের স্পষ্ট কথা—"কোন সময়েই আমার মেয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে পারবে না"…"আমার আইন মানতে হবে তাকে—**আমি তার বাবা**।" পুরন্দরেরও সুস্পষ্ট সঙ্কল্প ও শাসানি "এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। আমি তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করব, তোমার চাকরী খাবো, যতদিন না তোমার মত বদলায় ততদিন তোমায় জেলে বন্ধ করে রাখব"। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। গোবর্ধন ও পুরন্দর, বিবাহ ঠেকাইবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও পরাজিত হন। গোবর্ধন মেয়েকে ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখেন বটে, কিন্তু সেই ঘরেই যে টেলিফোন আছে তাহা খেয়াল করেন না। কঞ্চি পুলিশ ডাকিয়া—পুলিশের সাহায্যে ক্ষিতীশের কাছে পৌঁছিয়া যায়।

ক্ষিতীশের বাবা পুরন্দর, নায়েব শ্রীকান্ত মাইতির সাহায্যে, ক্ষিতীশকে আংটি চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট—স্থলতার সহপাঠী। শেষ পর্যন্ত তিনিই বিবাহের কর্তা সাজেন—সব বাধা মিলাইয়া যায়। পুরন্দর পরাজিত হইয়াও, বেশ একটু উল্লসিত হন।

প্রথম অঙ্কে—ক্ষিতীশের ডাক্তার-বন্ধু যতীন, যজ্ঞেশ্বর মুনসেফ্ এবং মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারী জনার্দন চক্রবর্তী তিনটি উল্লেখযোগ্য পারিপার্শ্বিক চরিত্র। ডাক্তার যতীনের মুখে বনফুলই যেন কথা বলিয়াছেন। তিনি—শিক্ষিতা অশিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না—টিয়াপাখী টিয়াপাখীই। বাঁধাবুলি কপচাতে শিখলেও টিয়াপাখী, না শিখলেও টিয়াপাখী। শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও যতীন এক বিষয়ে ছাড়া কোনো পার্থক্য দেখেন না। অশিক্ষিত—"রামাকে একটা কড়া কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ তার পাঁচ-টাকার মাইনের চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে—তোমার ঐ প্রফেসারের মুখে লাথি মারলেও তিনি তা পারেন কি না সন্দেহ।" শিক্ষিত—'আমরা বড় বড় বই পড়ছি বড় বড় বুলি আওড়াতে পারি—আর কিছু পারি না। আমরা স্বাধীনতার বক্তৃতা করি ন'টায়, সায়েবদের গিয়ে সেলাম করি সাড়ে ন'টায়।" যতীন বিশ্ববন্ধু 'কুমড়োগাছ' যজ্ঞেশ্বর মুনসেফদেরও বিশ্ববন্ধুত্ব বে-আবরু করিয়াছেন—যেখানে এতটুকু স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানেই যজ্ঞেশ্বর বন্ধুত্ব করেন। জনার্দন চক্রবর্তী চরিত্রটি মেয়েস্কুলের সেক্রেটারী—তবে অন্য অর্থে—অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে চরিত্রহীন চরিত্র। রাত্রে ছাড়া প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা বলার সময় হয় না। 'দাইয়ের মারফৎ প্রণয় নিবেদন' করিতেও লজ্জা হয় না।

দ্বিতীয় অঙ্কে—পাড়ার ঠাকুরদা, বিপত্নীক—যিনি কঙ্কিকে বিবাহ করিতে মনে মনে অনেকদূর আগাইয়াও গিয়াছেন এবং 'একটা মীমাংসায় আসতে' ব্যগ্র, মিস দত্ত প্রভৃতি হাস্যোদ্দীপক চরিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। **শ্রীমধুসূদন** (১৯৩৯) একুশটি দৃশ্যে বিভক্ত। কোন অঙ্ক বিভাগ নাই। মাঝে মাঝে **বিরতি** আছে। ষষ্ঠ দৃশ্যের পরে 'প্রথম বিরতি', নবম দৃশ্যের পর—

'দ্বিতীয় বিরতি', একাদশের পর 'তৃতীয় বিরতি', দ্বাদশ দৃশ্যের পর—'চতুর্থ বিরতি' ষোড়শ দৃশ্যের পর 'পঞ্চম বিরতি'। সপ্তদশ দৃশ্যের পর 'ষষ্ঠ বিরতি'—একবিংশতির পরে—'যবনিকা'। মহাকবি মধুসূদন দত্তের জীবনের নব আলেখ্য—মধুসূদনের উদ্দাম জীবনাবেগ, মধুর ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় কীর্তি খ্যাতি এবং সব থাকা সত্ত্বেও অশান্ত জীবনের হাহাকার ও শোচনীয় পরিণতি—এই নাট্যের উপস্থাপ্য বিষয়। (বিশেষ আলোচনা :—দ্রষ্টব্য)

৪। **বিদ্যাসাগর** (১৯৪১)॥ পঞ্চাঙ্ক চরিত-নাটক। "প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য একটি নাটকে অঙ্কিত করা শক্ত"—বলিয়া নাট্যকার "তাঁহার জীবনের **একটি কার্যকে** মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়া **বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে** ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।" নাট্যকার স্বীকার করিয়াছেন—"ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্য রক্ষা করি নাই, একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি এবং বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসসম্মত করিতে পারি নাই।" যে "একটি কার্য"কে নাট্যকার মূলস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা **বিধবা-বিবাহ** এবং যে বিদ্যাসগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার প্রকাশ পাইয়াছেন—সে কোমলপ্রাণ-বিদ্যাসাগর, বজ্রদৃঢ়-বিদ্যাসাগর, অটল-সঙ্কল্প বিদ্যাসাগর—যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর—স্ত্রী-শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর। চরিত-নাটকে "কার্য-ঐক্য" অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নাট্যকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। এই কার্যকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যাসাগরের মহীরুহকল্প ব্যক্তিত্বটির পরিচয় নাটকে সন্তোষজনক মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। রস-রূপের যে আদর্শ এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা—ট্রাজি-কমেডির আদর্শ। বিদ্যাসাগরের সাধনা—বিধবা জীবনের দুঃখ দূর করার সাধনা, ষোল আনা সফল হয় নাই বটে—কিন্তু একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। বিদ্যাসাগর যে মুহূর্তে হতাশ হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছেন, সেই মুহূর্তে আশার আলো দেখিয়াছেন এক পুনর্বিবাহিত সুখী বিধবার মধ্যে। দিগন্তবিস্তার মরুভূমির মাঝখানে···একটি সবুজ শিষ দেখিয়া আবার আশায় উদ্দীপিত হইয়াছেন।

দশভাগ ॥ (১০-৬-৪৪—উৎসর্গপত্রের কাল)

(ক) **শিক-কাবাব**। মাংস-লোলুপ পুরুষ সমাজের লেলিহান জিহ্বা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভদ্রঘরের একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বালিকা কিভাবে সংগ্রাম করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়া আত্মমর্যাদা বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা করিয়াছে তাহারই করুণ কাহিনী, জমিদারের বাগান বাড়ীর একটি কক্ষে—মদ-মাংসের টেবিলের সম্মুখে, উদ্ঘাটিত হইয়াছে। করিম বাবুর্চি শিক-কাবাব তৈয়ার করিয়া টেবিলে হাজির করিয়াছে আর পান্নালাল সৌদামিনীকে জীবন্ত শিক-কাবাব করিয়া পর্দার আড়ালে হাজির রাখিয়াছে। মাংসলোলুপ জীবনধনের, কাঁচা মাংস চিবাইবার ফলে ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া রক্ত ঝরিয়াছে, তাহাতে জীবন্ত —মাংস-লোলুপের পৈশাচিক নিষ্ঠুর মূর্তিও প্রতিফলিত হইয়াছে—জমিদারেরও ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া সৌদামিনীর রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে। শিক-কাবাব সার্থক একখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক একাঙ্কিকা নাটিকা।

(খ) **লেহ্য**। ব্যঙ্গরসাত্মক একাঙ্কিকা। বিহারের উগ্রপ্রাদেশিকতার পটভূমিতে, বাঙালী যুবকদের চাকরী সমস্যা লইয়া ইহা রচিত। "যুবক সমিতি" নামক বাঙালী ক্লাবের এক সান্ধ্য মজলিসে (তাসের)—চাকরী সাধনায় সিদ্ধি লাভের মোক্ষম উপায়টুকু, হরেনের সিদ্ধি-খাওয়া নেশার-চোখে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। ভগ্নীপতি সবডিভিশনাল অফিসার বা জ্যাঠা মুনসেফ্ থাকিলে "ইন্টারভিউ" পাইতে কষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু চাকরী পাইতে হইলে অবশ্যই চাই—কুকুরেরও অধিক **লেহন-শক্তি**। 'চপ্লাকান্ত্' বাবুর পা চাটিবার পরে হরেন কুকুরের মুখোস পরিয়া যে গান গাহিয়াছে তাহাতেই চাকরের সিদ্ধি লক্ষণ পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে।

(গ) **জল**। জল একটি মিশ্র পদার্থ। দুইভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেন, তড়িৎশিখার যাদুস্পর্শে জল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। (H_2O)—এই বৈজ্ঞানিক সূত্রটিকে রূপক আকারে এই নাটিকা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। তবে রূপের আরোপে, আর্য-অনার্যের—হিন্দু-মুসলমানেরও—সাম্প্রদায়িক অভিমান,

সেই অভিমানে লম্ফঝম্ফ করা, দাঙ্গা বাধানো, নারীধর্ষণাদি পাপাচারণ করা—যাহার সহিত একসঙ্গে থাকিতেই হইবে তাহার সহচর্যে অসহিষ্ণু হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করা এবং অন্য শক্তিমানের কাছে 'জল' হইয়া যাওয়া—এই সব উপাদান মিশিয়া রহিয়াছে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের দ্বন্দ্বে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বই যেন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। (বিজ্ঞান রসিক বনফুলের সামান্য পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।)

(ঘ) **অবাস্তব**॥ ভূতে বিশ্বাস না থাকিলেও "ভূতুড়ে বাড়ী" এবং দশজনের আশঙ্কা—এবং ভূতের অস্তিত্বের ও উপদ্রবের কাহিনী কেমন করিয়া একটা লোকের মধ্যে দিবাস্বপ্নের ঘোর বা ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে—ফলে তাহারই উৎকল্পনা মূর্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসা-যাওয়া করিতে পারে এবং তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া আত্মঘাতী করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই এই একাঙ্কিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত এই ভাবেই, নিজের পিস্তলের গুলিতে নিজেই মরিয়াছেন। ভূদেববাবুর ভূতুড়ে কাণ্ডের কাহিনী শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন বটে—আপনি অবশ্য যা বললেন তার থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। এ বাড়ীতে উপর্যপরি কয়েকটা মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা না একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে।··· এসবের দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ভূতুড়ে বাড়ি।" কিন্তু সংস্কার বলবান—কল্পনায় মূর্তি হইয়া উঠিতে চায়। হইয়াছেও তাহাই। যে কাফ্রি চাকরটিকে এবং মিস চৌধুরীকে মিস্টার চৌধুরী গুলি করিয়া মারিয়াছিলেন, তাহারাই আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। ভয়ে-উত্তেজনায় অস্থির ও বিভ্রান্ত অশোক দত্ত ভূত মারিতে গিয়া নিজেকেই মারিয়া বসিয়াছেন। এইভাবেই 'অবাস্তব' বাস্তব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (এখানে, মনস্তত্ত্বরসিক বনফুল ভৌতিক কাণ্ডের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।)

(ঙ) **নব-সংস্করণ**। একাঙ্কিকা প্রহসন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-অব-পুলিশ মিষ্টার রক্ষিতের একমাত্র কন্যা অপর্ণা, জব্বলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে

একেবারে ঠিকঠাক এমন বিয়ে উপেক্ষা করিয়া পালাইয়াছে। রক্ষিত রীতিমত আগুন। কলেজের যে সব ছেলে অপর্ণার কাছে প্রেমপত্র লিখিয়াছিল তাহাদের তিনি এ্যারেষ্ট করিয়াছেন। বন্ধু অধ্যাপক নিবারণ শিক্ষিতা মহিলাদের স্বাধীনতার পক্ষ লইয়া তর্ক করিয়া রক্ষিতের আগুন নিভাইতে পারেন না—বরং ভর্ৎসনা শোনেন—"O you teachers and professors you are a hopeless lot of hypocrites! রক্ষিত একের পর এক ছেলেদের ডাকেন এবং ধমকাইয়া ভূত ছাড়াইয়া দেন। কিন্তু ফল হয় না। মেয়ের হদিশ পাওয়া যায় না। সেই মুহূর্তেই অপর্ণা এবং অপর্ণার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস প্রবেশ করে। অপর্ণাকে অধ্যাপক দাসই বিবাহ করিয়াছেন—অবশ্য লুকাইয়া—কারণ তিনি জাতিতে "সদ্‌গোপ"। অধ্যাপক ছাত্রীর প্রেম ও গোপন বিবাহ নব-সংস্করণই বটে।

(চ) **বানপ্রস্থ**। প্রাণশ্রেষ্ঠ্য উপাখ্যানেরই একটি নূতন সংস্করণ। ক্ষুধায় টান না ধরা পর্যন্তই রঙ্গ-রসিকতা কবিতা-রস নৃত্য-গীতরস ভাল লাগে কিন্তু টান যখন প্রাণ লইয়া টানাটানি করে তখন সুন্দরী ললনার সুমিষ্ট সংগীতকে "ফাজলামি" মনে হয়। সংসার বিরক্ত বৃদ্ধ বরদাবাবুর নূতন ধরণের বানপ্রস্থ অবলম্বনে নাট্যকার ঐ তত্ত্বটিকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'রঙ্গলাল' নামক জমিদার তনয়ের ইংরেজী-বাংলা-ফার্সি কবিতার আবৃত্তি, শিরোমণির মুক্তিতত্ত্ব আলোচনা, পরমাসুন্দরী নীহারের সুমিষ্ট গান—একাঙ্কিকাটিকে নানা ভাবে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

(ছ) **কবয়ঃ** [Clifford Bax প্রণীত The poetasters of Ispahan অবলম্বনে রচিত] আধুনিক গদ্য ও দুর্বোধ্য কবিতার ব্যঙ্গ। যে কবিতা যত দুর্বোধ্য সে কবিতা তত গভীর—এই যাহারা মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই এই রঙ্গ-ব্যঙ্গ। মোদক-নাপিত-মালী অর্থাৎ যাঁহারা অশিক্ষিত, গদ্যে-পদ্যে একটা কিছু বলিতে পারাকেই যাহারা কবিতা বলিয়া মনে করে তাহারাও খোঁচা খাইতে কম খান নাই। তবে অতি আধুনিক ছদ্মবেশ গুডের—কবিতাকেই—

"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসো পিতৃষসার রিপ্রেশন উঠুক কিম্বা নামুকই
ভলভিউলাসের ফটোমিটার নীটশের যত ফুকুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী—"

বনফুলী হুলের বেশী খোঁচা খাইতে হইয়াছে ॥

(জ) **আকাশ নীল** ॥ "মাথায় ছিট আছে ; তার উপর দারুণ মাতাল সর্বদাই মদ খেয়ে থাকে। সব্বাই ভয় করে···আত্মীয় স্বজনেরা পর্যন্ত ছেড়ে পালিয়েছে, ও একাই থাকে।"—এহেন পাগলা জমিদার জনার্দন রায়ের বাগানে বল খুঁজিতে প্রবেশ করিয়াছে 'অমল'—যে বলে "আমি কাউকে ভয় করি না" ॥ অমল ভিতরে অমল—কখনও মিথ্যা কথা বলে না বলিয়া কাহাকেও ভয় করে না ॥ সে পাগলা জমিদারের সম্মুখে—যমের মুখেই—পড়ে। জমিদার 'আকাশ লাল না বলাইয়া ছাড়িবেন না—অথচ অমলের এক উক্তি—আকাশ নীল ॥ জনার্দন হান্টার দিয়া মারিতে মারিতে অমলকে বেহুঁশ করিয়া ফেলেন কিন্তু আকাশকে লাল করিতে পারেন না ॥ অমলকে 'বেহুঁশ' দেখিয়া জমিদার হান্টার ফেলিয়া দিয়া মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকেন—খুব সম্ভব জীবনে প্রথম তাহার চোখে আকাশের নীলিমা প্রকাশিত হয় ॥ 'খুব সম্ভব' বলিলাম এইজন্য যে তাৎপর্যটি খুব পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

(ঝ) **অন্তরীক্ষে** ॥ অন্তরীক্ষে গ্রীক পুরাণের পরিমণ্ডলে, হিটলারী যুদ্ধোন্মাদনার পরিস্থিতিতে—বিশ্ব কবি-সম্মেলন—পরিকল্পনার সাহায্যে **রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীন উদার দৃষ্টির প্রশস্তি** রচনা ॥ পৃথিবীর কবিদের মধ্যে সার্বজনীন উদার দৃষ্টি একজনেরই আছে এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ—ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয় ॥ "অন্তরীক্ষে"র রস সকলের জন্য নহে। বিশিষ্টদের বিদ্যারসান্বিত জিহ্বাতেই এই রস আস্বাদিত হইবে।

(ঞ) **১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮** ॥ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বার্ষিকী অবলম্বনে —বিদ্যাসাগরের করুণা-কাতর বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বকে, আধুনিক সমাজের

সমালোচনার মধ্য দিয়া, বনফুলী রীতিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে॥ সে যুগে বিধবাদের দু:খ দেখিয়া বিদ্যাসাগর কাতর হইয়াছিলেন—এখন "যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত" অথবা কুমারীদের দুঃখ দেখিয়া কাতর। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিকৃতিকে ধিক্কার দিয়া তিনি বলেন—ইস্কুলের সেক্রেটারি বা হাসপাতালের ডাক্তারের মন যুগিয়ে চলাটা কম অপমানের মনে হয় বুঝি তোমাদের কাছে ?" স্বাধীনতা যদি মুখে প্রসন্নতা না ফুটাইতে পারে তবে কিসের স্বাধীনতা ? বাইরের হাসি খুশির তলে বিষাদের ছাপ ঢাকিয়া বেড়ানোতে জীবনের করুণ দ্বন্দ্বই প্রকাশ পায়॥ পুরুষরাও অপদার্থ এবং তাহার দায়িত্বও মেয়েদেরও কম নহে॥

(৬) **মধ্যবিত্ত** [ট্রাজি-কমেডিজাতীয় তিনাঙ্ক নাটক—[দৃশ্যবিভাগ নাই] মধ্যবিত্ত সংসারে চাপের শেষ নাই—জ্বালারও অন্ত নাই। আয় বা বিত্ত সামান্যই, কিন্তু ব্যয়ের বাবদ ও বরাদ্দ নেহাৎ কম নয়। সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একজন ; সেই একের স্কন্ধে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের ভার ছাড়াও অধিকন্তু থাকে অনাথ আশ্রিত, বেকার আত্মীয় স্বজন—বিধবা বোন ও তাহার ছেলে-মেয়ে, ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ও মেয়ের বিবাহের দায় ; সঙ্গে থাকে বাড়ীভাড়া, রোগের ঔষধ পথ্য, সামাজিকতার ঝামেলা। অল্প একটি আয়ের সূত্রে এত বড়ো ব্যয়ের ভার ঝুলিয়া থাকে। তাই মধ্যবিত্তের কাছে প্রাণের দামের চেয়ে চাকরীর দাম অনেক বেশী। অবস্থাচক্রে সে প্রাণহীন হইয়া পড়ে। নকুল এইরূপ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কেন্দ্র পুরুষ। মাত্র ৬০ টাকা মাহিয়ানার কেরাণী, কিন্তু পোষ্যের সংখ্যা কম নয়। নিজের এক স্ত্রী এবং দুই কন্যা ছাড়া সংসারে আছে ২২ বৎসর বয়স্ক বেকার প্রায় (রেডিওর দালাল) ভাই **সহদেব** (২) ৫৭ বৎসর বয়স্ক দূর সম্পর্কের পিসা, (৩) ৫০ বৎসর বয়স্কা দিদি **দুর্গামণি** (৪) দুর্গামণির অনূঢ়া কন্যা ২০ বৎসরের **কুঙ্কুম**। ছ'মাসের ভাড়া বাকী। দোকানেও টাকা বাকী। তবে বাড়ীওয়ালা ভাল, তাগাদা দেন বটে, কিন্তু তাড়না করেন না।

বাড়ীওয়ালা ফকির বন্দ্যোপাধ্যায় দোতলায় থাকেন। বাড়ীওয়ালা বটে, কিন্তু তিনিও উত্তমবিত্ত নন। ফকিরবাবু অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী। বয়স ৬০ বাড়ীটি পৈতৃক। বাড়ীর গায়ে চূণ বালি ছোঁয়াবার সাধ্য তাঁহার নাই। তাঁহার সংসারেও—(১) ৪০ বৎসর বয়স্ক মাথাখারাপ এক আত্মীয়—বি, এ পাশ শিবাজী আছে (২) প্রথম পক্ষের অনূঢ়া কন্যা ললিতা আছে এবং (৩) দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী ৩০ বৎসর বয়স্কা যমুনা আছে। অধিকন্তু আছে একটি মাত্র ভাড়াটিয়া—সেও নকুল—৬ মাসের ভাড়া তাহার বাকী। তাই বলিয়া সাধ তাহার কম নাই। বড় ঘরে ভাল বরে কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে—চেষ্টাও আছে। যদিও স্ত্রী যমুনার ইচ্ছা অন্যরূপ।—যমুনা ললিতাকে বিনা পয়সায় পার করিতে ইচ্ছুক। এই উদ্দেশ্যেই সে তাহারই বাল্যবন্ধু বেকার-যুবক সঙ্গীতজ্ঞ এম-এ-পাশ পরিতোষকে ললিতার সংগীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছে। গাঁথিয়া তুলিতেও চেষ্টা করিতেছে।

অন্যদিকে নকুলের দিদি দুর্গামণিও একই উদ্দেশ্যে পরিতোষকে নিরীখ করিয়াছেন—কুঙ্কুমকে সেতার শিখাইবার জন্য—অবশ্য বিনা পয়সায়, অনুরোধ করিয়াছেন। পরিতোষও রাজি হইয়াছে। সতীশ ভাল সেতার বাজাইতে পারিলেও কুঙ্কুমের স্বগোত্র বলিয়াই নাকি পাত্তা পায় নাই। নকুল দিদির এই মেয়ে—দিয়ে—ছেলে-ধরা ব্যাপারটিকে পছন্দ করে না। কিন্তু সে নিরুপায়। এক কথা বলিলে দিদি দশ কথা শুনাইয়া দেয়—অর্জুনের কাছে চলিয়া যাইবার ভয় দেখায়। পরিতোষের তাই পোয়াবারো। একতলায় দুর্গামণির আদর দোতলায় যমুনার খাতির—উপরে ললিতার, নীচেয় কুঙ্কুমের—আদর আপ্যায়নে তাহার দুইহাত ভরা। একজনের মনের মতো হইবার জন্য কুঙ্কুম অনেকদিন ইংরেজি-পাঠ লইয়াছে। এখানে সংগীতজ্ঞ পরিতোষের মনের-মতো হইবার জন্য—সংগীতে পাঠ লইতেছে। সে লেখাপড়া বা গানবাজনাকে বিবাহের উপায় হিসাবে ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে দেখে না ও দেখিতে রাজিও নয়।

এইরূপ এক পটভূমিকায় নাটকের আরম্ভ। নকুল মুখোপাধ্যায় মহা-সঙ্কটের সম্মুখীন। ঘরে স্ত্রী মৃণ্ময়ী প্রসব-বেদনায় কাতরা, বড ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই। অটল ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির ফোঁটাই সম্বল। বাহিরে চাকরীটুকুও যায় যায়। রিট্রেঞ্চমেন্টের ধাক্কা সামলানো যাইবে কি না সন্দেহ। সাহেব Explanation—তলব করিয়াছে—সেই explanation টাইপ করিতে নকুল ব্যস্ত। দোতলার এবং একতলার বেকারদ্বয় 'ক্রসওয়ার্ড' মিলাইতে তথা মোটা টাকা বাধাইতে একাগ্রমনা। মাথা খারাপ শিবাজীও মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করে—কখনও সৈন্যদল গড়িয়া তুলিবার তথা টোর্ণা দুর্গ জয় করিবার উদ্দীপনা লইয়া,—কখনও পালাইবার জন্য ঝুড়ি খুঁজিয়া ·· পিসামশায় ফাঁক পাইলেই বনিয়াদী বংশের বোলচাল ছাড়েন। নকুল বিরক্ত হয়—দিদিকে এবং পিসামশায়কে উচিৎ কথা শুনাইয়াও দেয়। স্ত্রীর কাতরানি শুনিয়াও তাহার রাগ হয়। টাইপ না করিয়া উঠিবার যো নাই, অথচ সংসারের দাবী-দাওয়া মিটাইতেই হইবে। মহা সমস্যা।

নকুলের আপিসে না গিয়া উপায় নাই। এদিকে মৃণ্ময়ীকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া বাঁচানো দায়—হাসপাতালে পাঠাইতেই হয়। নকুল আপিসে—সাহেবের মুখে, মৃণ্ময়ী হাসপাতালে—মৃত্যুমুখে। বাড়ীতে ইতিমধ্যে সতীশ—পরিতোষে সতীশ-যমুনাতে রীতিমত একহাত মুখোমুখি হইয়া যায়। পিসামশায় হাসপাতাল হইতে মৃণ্ময়ীর মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসেন, সেইক্ষণে নকুলও তাহার চাকরী যাওয়ার সংবাদ লইয়া প্রবেশ করে।

নকুল শোকার্ত—স্ত্রীর শোকের উপর চাকরীর শোকের আঘাত। ছোট মেয়ের জ্বর। সংসার বিপর্যস্ত। কে জল দেয়? কে ভাত দেয়? দুর্গামণি, পিসামশায় এবং কুঙ্কুম টেলিগ্রাফ পাইয়া অর্জুনের কাছে চলিয়া যায়। ললিতা ছাড়া ভাতজল দেওয়ার কেহ থাকে না। পরিতোষ আসে—আসে বিয়ের নেমন্তন্ন করিতে—চন্দনার সহিত তাহার বিবাহ ঠিকঠাক। ললিতা কুঙ্কুম দুইজনেই হতাশ। নেমন্তন্নের চিঠি দেখিয়া ফকিরবাবুর—ভাল বরের

শেষ আশাটুকু মুছিয়া যায়। ইতিমধ্যে বিনয় সুখবর লইয়া প্রবেশ করে। তাহাদের আপিসে টাইপিষ্টের চাকরী খালি। নকুলকে লওয়া হইবে—সাহেবের ইচ্ছা। নকুল পুলকিত হইয়া দরখাস্ত টাইপ করিতে লাগিয়া যায়। ফকিরবাবু অগত্যা নকুলকেই ললিতাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

(৭) **বন্ধন মোচন** [উৎকাল্পনিক কমেডি]

'নারী-মুক্তি আন্দোলন'—বিষয়ক কমেডি নাটক। অঙ্ক-বিভাগ নাই। "বিরতি"-দ্বারা সন্ধগুলি বিভক্ত। সেই হিসাবে পঞ্চ-"বিরতি" বিভক্ত কমেডি। 'উৎকাল্পনিক' বিশেষণ দেওয়ার কারণ এই যে যদিও বিষয়বস্তু অন্যতম একটি সমাজ সমস্যা, তবু পরিস্থিতি-কল্পনা, চরিত্র-সৃষ্টি এবং ঘটনা-বিন্যাস অধিক পরিমাণে উৎকল্পনা-(fancy) প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। "নারী-রক্ষা-সমিতি", সমিতির অধিনায়িকা উজ্জ্বলা নন্দী, তাহার ভ্রাতা-ভগিনী এবং পিতা সকলেই যেন ভাবে-ভরা ফানুস। বাস্তব জীবনের পাবনগুল হইতে সকলেই বহুদূরবর্তী। এই কারণেই, সমস্যা অবলম্বনে রচিত হইলেও নাটক-খানি সমস্যামূলক নাটকের (problem play) গাম্ভীর্য পায় নাই। যাহা হউক—নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার নিজেকেই লাভ করিতে হইবে··· কোন ফন্দিবাজ ব্যবসায়ীর (জগনলাল ঠিকাওয়ালা) অর্থানুকূল্যে-গড়া সমিতি সে অধিকার দিতে পারিবে না, কোনো পুঁজিপতির দানের উপর নির্ভর করিয়া সে অধিকার আসিবে না···এই উপস্থাপ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই ; উজ্জ্বলার লিখিত অভিভাষণেও অনেক মূল্যবান এবং জোরালো কথা আছে ·· "রাষ্ট্র সমাজ কেহই আমাদের ন্যায্য মূল্য দিবে না যদি না আমরা আত্মবলে বলীয়সী হইয়া স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের দাবী ঘোষণা করি"······"আত্মসম্মানই মনুষ্যত্ব"···উজ্জ্বলার এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উজ্জ্বলার সহপাঠী অনুক্ষণের জীবনদর্শনও উপেক্ষনীয় নয়···"শান্তিই জীবনের সবশ্রেষ্ঠ কাম্য জিনিস"···খুবই বড়ো উপলব্ধি, নিঃসন্দেহ। তারপর উজ্জ্বলার বাবা সিদ্ধার্থ নন্দীর জীবন এবং জীবন-সমালোচনাও কম চিত্তাকর্ষক নয়···

ক্লিফোর্ড ব্যাকসের ষ্টুডিও নাটকের ধরণে লেখা 'বন্ধন-মোচন' নাটিকাতেও নারীর বন্ধনের ইতিহাস এবং মুক্তিপিপাসাও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ...কিন্তু এত সব গুরুগম্ভীর ভাব ও ভাষা মিলিয়াও নাটকখানিকে 'serious-drama'-য় পরিণত করিতে পারে নাই। মূল ভঙ্গীর মধ্যেই গলদ আছে।

(৮) **রূপান্তর** (১৩৫২)

আলিবাবার গল্প অবলম্বনে লিখিত কমেডি।

(এ বই পাওয়া যায় না)

*দেখা যাইতেছে...আজ পর্যন্ত বনফুল যে কয়খানি নাটক-নাটিকা লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে...শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর এই দুইখানি চরিত নাটকই গুরুগম্ভীর (high serious) রচনা এবং অন্যগুলি.. লঘু বা লঘু-গুরুমিশ্র কমেডি-জাতীয়। ট্রাজেডি অপেক্ষা কমেডির প্রতি বনফুলের এই অধিক প্রবণতা...'স্বভাবোহ-তিরিচ্যতে' এই সূত্রটিকেই প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক বনফুলকে "good dramatist" বলা যায়, কিন্তু 'great dramatist' বলা যায় না। দৈহিক মানসিক ও আত্মিক দ্বন্দ্বে মানব-জীবন যেখানে ক্ষত-বিক্ষত ও শোচনীয়, যেখানে বিশ্ববিধানের পটভূমিতে মানুষের নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত, দুঃখ-দুর্ভোগবিড়ম্বিত জীবনের নিস্ফল সংগ্রামের শোচনীয় করুণ রূপ জাগিয়া উঠে, সেই ট্র্যাজেডি-লোকে নাট্যকবি বনফুল সহজ আবেগে প্রবেশ করেন নাই। "সিরিয়াস ড্রামা" বলিতে যে জাতীয় সমস্যামূলক গুরুগম্ভীর রচনা বুঝায় তাহাও নাট্যকার বনফুলের নাট্য-রচনার তালিকায় কম পাওয়া যায়। এই তালিকায় লঘু বা লঘু-গুরুমিশ্র প্রহসনজাতীয় কমেডির সংখ্যাই বেশী। আশা করি, জীবন-রসিক বনফুল...শ্রীমধুসূদন, বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও গুরুতর নাট্যরচনা দ্বারা...আমাদের নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

চরিত নাটক ও শ্রীমধুসূদন

কাহিনী-কাব্য—শ্রব্য বা দৃশ্য যে রীতিতেই রচিত হউক—দেশ-কাল আয়তনে-অভিব্যক্ত জীবনের রূপকেই রসরূপ দান করিয়া থাকে। ভারতের ভাষায় বলিলে বলা যাইতে পারে—'লোকবৃত্তানুকরণম্'—এরিষ্টটলের ভাষায়—'জীবনের অনুকরণ'—"imitation of life"। বলা বাহুল্য, জীবন বলিতে নৈর্ব্যক্তিক কোন সংজ্ঞা মাত্র বুঝায় না—বুঝায় ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত সামাজিক ব্যক্তির জীবন অর্থাৎ যে জীবন বিশেষ কোনো সমাজের মধ্যে দশের সঙ্গে নানারূপ সম্পর্কের সূত্রে জড়িত—যে জীবন অভিযোজন-প্রয়াসে—পুরুষার্থ সাধনায় সতত রত—যে জীবন দৈহিক-মানসিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদাই গতি-চঞ্চল—কায়মনোবাক্যে ক্রিয়াশীল—নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জীবন—যেন বাহ্য ও আন্তর ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা **শক্তিক্ষেত্র**—ঘটনার সমষ্টি ফল এবং জীবনের উপস্থাপনা সংক্ষেপে ঘটনারই উপস্থাপনা। জীবনের রসরূপ রচনা করিতে হইলে রসকেন্দ্রিক বৃত্তের বন্ধনে ঘটনারাজি সাজাইতে হইবেই। সুতরাং বৃত্ত রচনা বলিতে প্রধানতঃ ঘটনা-সংযোজনাই বুঝায় এবং বিশেষত বুঝায় পরিস্থিতি-কল্পনার সাহায্যে একটা রসাদর্শকে ফুটাইয়া তোলা। রস-সৃষ্টি ঘটনা সাপেক্ষ বলিয়াই বৃত্ত-রচনা রসানুকূল ঘটনার সংযোজনা।

রস-নিষ্পত্তির সৌকর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এরিষ্টটল প্রমুখ শিল্প-দার্শনিকরা "কার্য-ঐক্য" (unity of action) অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়াছেন এবং "one action" কথাটির তাৎপর্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তবে এ কথাও সত্য যে বহু ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও, সমালোচকদের মধ্যে ঐক্যের স্বরূপ বিষয়ে অবিসংবাদিত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ কথাও উল্লেখ করা দরকার যে এরিষ্টটলের সময়েও. এরিষ্টটলের 'ঐক্য'—ধারণা এবং অন্যান্য সমালোচকের এবং অনেক লেখকেরও—'ঐক্য-ধারণা' এক হইতে পারে

নাই। অনেকেই যে 'নায়ক-ঐক্য'কে (unity of hero) বৃত্ত ঐক্য (unity of plot) বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং এরিষ্টটলের মতে, ভুল করিয়াছেন—পোয়েটিকস গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নায়ক-ঐক্যকে'ই যাঁহারা 'বৃত্ত ঐক্য' বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহাদের ভুল ধারণার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"Unity of plot does not, as some persons think, consist in the unity of the hero. For infinitely various are the incidents in one man's life which can not be reduced to unity ; and so, too, there are many actions of one man out of which we can not make one action—poetics—VIII—33)। তাৎপর্য এই যে—বৃত্ত-ঐক্য ও নায়ক-ঐক্য এক বস্তু নহে। ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহাদের মধ্যে অন্বয় স্থাপন করা সম্ভব নহে। যে সমস্ত ঘটনা একটা বিশেষ কার্যের সহিত যুক্ত অর্থাৎ আপেক্ষিকতার দিক দিয়া পরস্পর সম্পৃক্ত, তাহাদের সমবায়েই কার্য-ঐক্যের কেন্দ্র গঠন করা সম্ভব। পরস্পর অসম্পৃক্ত ঘটনার সমাবেশ করিলে 'ব্যক্তি ঐক্য' অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু—"কার্য-ঐক্য" অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না—"unity of impression" রস-ঐক্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সৃষ্টি করা যায় না।

তবে সকলেই যে এক দৃষ্টি লইয়া, বিষয়টি- (ঐক্যের বিষয়টি) পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। এরিষ্টটলের সময়েও এমন লোক ছিলেন যাঁহারা বৃত্ত-ঐক্য বলিতে "নায়ক-ঐক্য" বুঝিতেন এবং "দ্বি-সূত্র বৃত্ত" (double thread of plot)—দ্বৈত-বিষয় বৃত্তকে (double theme) ঐক্য-পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন না। যাঁহারা "নায়ক-ঐক্য" ও বৃত্তের-ঐক্যকে এক মনে করিতেন তাঁহাদের বক্তব্যটুকু এরিষ্টটল উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু আমরা অনুমানে খানিকটা বুঝিয়া লইতে পারি। ইঁহারা হয়ত বলিয়াছেন—নাট্য সাহিত্যের উদ্দেশ্য—জীবনের উপস্থাপনা—জীবনের রূপকে যথাযথ অথচ সরসভাবে উপস্থাপিত করা। জীবনের রূপ—খণ্ড এবং অখণ্ড দুই ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন জীবনের বিশেষ একটি কার্যকে (action) সন্ধি-বিভক্ত-

রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তেমনি জীবনের বিভিন্ন কার্যময় রূপটিও উপস্থাপ্য বিষয় হইতে পারে। খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে, বিশেষ একটি কার্য অর্থাৎ ভাবের আস্বাদনের মধ্যেই "রস" (interest) থাকে। আর অখণ্ড অর্থাৎ সমগ্র রূপের প্রকাশ যেখানে হয়, সেখানে রস—সামাজিকের আনন্দ—ব্যক্তির চরিত্র বা কার্য-মহিমা দেখার বাসনা হইতে জন্মে। প্রথম ক্ষেত্রে 'ভাব' লক্ষ্য——ব্যক্তি উপায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি' লক্ষ্য—ভাব উপায়। মোট কথা, যে ব্যক্তির জীবনবিষয়ে দেশের ও দশের ঔৎসুক্য খুব তীব্র—যাঁহার জীবনের ঘটনা এবং কার্যকলাপের মহিমা উপলব্ধি করিবার জন্য দেশবাসী উন্মুখ—এক কথায়, যে ব্যক্তি পুরুষার্থের সাধক হিসাবে জাতির চেতনায় স্মরণীয় হইয়া আছেন সেইরূপ কোন ব্যক্তির বিভিন্ন ঘটনাকে এক বৃত্তের মধ্যে স্থান দিলে—কার্য ঐক্যের হানি হয়ত হয়, কিন্তু ঔৎসুক্যের (interest) হানি হয় না।

'বৃত্ত-ঐক্য' সম্পর্কে রেনেসাঁ-যুগে যে তীব্র বাদ-বিসংবাদ হয় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "রোমান্সি"-কাব্য এবং **মহাকাব্যের** লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া, বাকবিতণ্ডার তুমুল ঝড় বহিয়া যায়। একদল বলেন—কার্য ঐক্য না থাকিলে রচনা কাব্য পদবাচ্যই হয় না, রোমান্সিতে কার্য ঐক্য, কাল ঐক্য নাই সুতরাং উহা কাব্যই নহে। অন্যদল বলেন—আনন্দ পাওয়াই বড় কথা; কার্য-ঐক্য কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য নহে। রোমান্সি-কাব্য আনন্দ দিতে কম দেয় না—সুতরাং রোমান্সিও সার্থক কাব্য সৃষ্টি। মহাকবি ট্যাসো দুই পক্ষের বিসংবাদ মিটাইবার জন্য—দুই প্রকার ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:—এক:—**রাসায়নিক**=মূল উপাদানের সরল ঐক্য Simple unity of a chemical element. দুই—**উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের জটিল ঐক্য**=complex unity of an organism like an animal and plant কাব্য দেহে শেষোক্ত অর্থাৎ জটিল ঐক্যই দেখা যায়। ট্যাসোর বক্তব্য এই যে অঙ্গোপাঙ্গের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাণী যেমন একক, তেমনি বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে কাব্য-শরীর গঠিত হইলেও উহার এককত্বের হানি হয় না। এরিষ্টটলের ঐক্য-

বোধের এবং ট্যাসোর এই জটিল-ঐক্যবোধের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে কি না বিচার্য বিষয়। তবে সমস্যার সমাধান যেভাবে করা হয় তাহাতে দেখা যায় এরিষ্টটলের মতের প্রাধান্যই বজায় আছে। রেণের্ঁাতে, 'হিরোয়িক পোয়েট্রি'কে [শ্রব্য কাহিনী কাব্য] মোট তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে এবং ব্যক্তি ও কার্যের সংখ্যাকেই এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী—**এপিক** ·(মহাকাব্য) = one action of one man—উপস্থাপ্য, কার্য এক—ব্যক্তি এক। দ্বিতীয় শ্রেণী—**রোমান্স** many actions of many men কার্য বহু + ব্যক্তিও বহু। তৃতীয়শ্রেণী• (**চরিতকাব্য**) "**বায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম**" = many actions of one man—[কার্য্য বহু + ব্যক্তি এক]

চরিতকাব্যের বৈশিষ্ট্য এরিষ্টটলের পোয়েটিকস্‌-গ্রন্থে ঐক্য আলোচনা প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাই যেন এখানে সূত্রকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে আমরা যে মীমাংসা পাইতেছি তাহা এই যে—কাহিনীকাব্যের গঠন তিন ধরণের হইতে পারে—প্রথম ধরণে—বিশুদ্ধ 'কার্য-ঐক্য' থাকে। দ্বিতীয় ধরণে—শুধু যে কার্য বাহুল্যই থাকে তাহা নহে, ব্যক্তি-বাহুল্যও থাকে। অর্থাৎ বহু ব্যক্তির কার্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহা রোমান্টিক-গঠন। তৃতীয় ধরণে—ব্যক্তি ঐক্য থাকে বটে কিন্তু ব্যক্তির বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিচিত্র রসের ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়। **ইহাই চরিতধর্মী গঠন**। সংক্ষেপে এখন বলা যাইতে পারে—যে রচনায়—কার্য-ঐক্য লক্ষ্য সেখানে "one action of one man" উপস্থাপিত হয় আর চরিত কাব্যে—উপস্থাপিত হয়—"many actions of one man"। "one action" কথাটির তাৎপর্য আগেই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে। এখানে বলিবার কথা শুধু এই যে—মনে রাখা দরকার—এরিষ্টটল "ঐক্য"-আলোচনা-প্রসঙ্গে ঘটনার **সংখ্যার** উপর নহে, ঘটনার **প্রকৃতির** উপরেই জোর দিয়াছেন এবং একটি **কার্যের** (action) মধ্যে যে অনেক **ঘটনা** (incidents) থাকিতে পারে—এ কথা বলিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই।

তাহার মতে many actions বলিতে ঘটনার বৈচিত্র্য বুঝায় না, কার্যের বিজাতীয়ত্বই বুঝায়। যেখানে একাধিক সমজাতীয় অর্থাৎ রসোপযোগী একাধিক ঘটনা থাকে সেখানে কার্য-ঐক্যের কোনো হানি হয় না, হানি হয় সেখানেই যেখানে বিভিন্নমুখী কার্যের—অসমজাতীয় অর্থাৎ রসানুপযোগী ঘটনার সমাবেশ ঘটে।

তাহা হইলে, চরিতকাব্যের—চরিত নাটকেরও—মূল লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে এই যে—"ইহাতে নানা ব্যক্তিত্ব-যুক্ত ব্যক্তিটিকে প্রধানতঃ উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হয়—ব্যক্তির স্বরূপকে বা জীবনকে, বিভিন্নমুখী এষণা বা কার্যের রূপের মধ্য দিয়া—পারম্পরিক অন্বয়হীন ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে ব্যক্ত করিবার আয়োজন করা হয়। ইহাতে যে ঐক্য থাকে তাহা কার্য-ঐক্য নহে—নায়ক-ঐক্য (unity of hero)—ভাব বা রসের আস্বাদন এখানের মুখ্য কাম্য নহে—মুখ্য কাম্য—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বা জীবন-সাধনা ও পরিণতি।

তবে যদিও চরিত-কাব্যে, ব্যক্তির বহুকালব্যাপী এবং বিভিন্নকার্যময় জীবনের রূপ উপস্থাপিত করা হয় বলিয়া রস-কেন্দ্র গঠন করা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না, তাই বলিয়া রস কেন্দ্র গঠন করা যে একেবারেই অসম্ভব—এ কথা কিন্তু, স্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি-জীবনকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি হয়। যেখানে বহু কার্যময় জীবনের মধ্যেও ট্রাজেডির রসাদর্শ (প্যাটার্ন) ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, নানামুখী কার্যের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াও—অসমজাতীয় ঘটনার সমাবেশ করিয়াও, বিশেষ একটি ভাব-কেন্দ্রের সহিত উহাদের অন্বয় স্থাপন করা সম্ভব হয়—মোট কথা সমগ্র জীবনটিকে একটি সন্ধি বিভক্ত বৃত্তের রূপে প্রকাশিত করা হয়, সেখানে অতি বিশুদ্ধ কার্য-ঐক্য না থাকিলেও—জটিলতর একটা ঐক্য-কেন্দ্রের অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে যেখানে ব্যক্তি-জীবনের বহু কার্যকে, একটি ভাবের সহিত অন্বিত করিয়া রসরূপে পর্যবসিত করার চেষ্টা করা হয় সেখানে চরিত-নাটক সাধারণ রস-নাটকেরই প্রকৃতি লাভ করিতে পারে। এই কথা সত্য বলিয়া মানিলে, চরিত-কাব্যের

মধ্যে দুইটি মেরু কল্পনা করা যায় :—এক মেরুতে—'ব্যক্তি-ঐক্যের' কেন্দ্রে-গ্রথিত পরস্পর অসম্পৃক্ত বহু কার্যের অন্বয়হীন রূপটি, অন্য মেরুতে পাওয়া যায় —'ভাব-ঐক্যে'র কেন্দ্রে-সংগ্রথিত বহু কার্যের অন্বয়যুক্ত (শিথিলবদ্ধ অন্বয়) রূপটি॥ প্রথমটি যেন কোনো জীবন-চরিতেরই প্রত্যেকটি অধ্যায়ের নাট্যরূপ —উক্তি প্রত্যুক্তিবন্ধ রূপ—খণ্ড খণ্ড রসের সংযোগে ব্যক্তিটির সমগ্র বৃত্তের উপস্থাপনা॥ দ্বিতীয়টিতে—চরিত থাকে এবং বেশী করিয়া থাকে জীবন এবং নানাবিধ ঘটনার মধ্যে ভাব-ঐক্যের কেন্দ্র গঠন করিবার—ব্যক্তির গতি পরিণতির সহিত নানামুখী কার্যের যোগস্থাপন করিবার চেষ্টা থাকে বলিয়া **নায়ক-ঐক্যের** পাশেই **ভাব বা রসের একটা ঐক্য-কেন্দ্র** গড়িয়া উঠে—চরিত-নাটক **রসমুখ্য** নাটকের সমগোত্রীয় হইয়া দাঁড়ায়॥ ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, এই জাতীয়—'many actions of one man'—উপস্থাপক রচনাকেই **চরিত** আখ্যা দেওয়া উচিত এবং যে-নাটকে এইরূপ চরিত-ধর্মী গঠন পাওয়া যাইবে, সে নাটককে, উহা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক হইলেও, 'চরিতধর্মী পৌরাণিক' বা 'চরিতধর্মী ঐতিহাসিক' বলিয়া গণ্য করা উচিত॥ কিন্তু চরিত-ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও,—অর্থাৎ 'বহু কার্যে'র স্থলে একটি 'কার্য'কে যেখানে রূপ দেওয়া হয়—স্মরণীয় ব্যক্তির বিশেষ একটি সাধনাকে উপস্থাপিত করা হয়, সেখানেও, আমরা 'চরিত' কথাটি প্রয়োগ করিয়া থাকি॥ বনফুল-রচিত "বিদ্যাসাগর" নাটকখানি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে॥ ইহাতে বিদ্যাসাগরের বহু কার্যময় জীবনের একটি "কার্য"কে **'বিধবাবিবাহ'কে** মূলসূত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর ব্যক্তিটিকে ফুটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে॥ এখানে কার্য এক বলিয়া আমরা বলিতে পারি—"one action of one man" এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং "কার্য-ঐক্য" বিশিষ্ট নাটকের লক্ষণটিই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু এই কার্য বিদ্যাসাগর নামক স্মরণীয় ব্যক্তির জীবনের কার্য, এই নাটককে সাধারণ সামাজিক নাটক বলিয়া মনে করা সঙ্গত কার্য হইবে না॥ বিদ্যাসাগরের স্থানে অন্য কোন অখ্যাত ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া এইরূপ

একটি কার্যকে রূপ দিলে অবশ্যই আমরা নাটকখানিকে 'সামাজিক' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতাম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদিও ধর্মতঃ চরিত নাটক—"এক ব্যক্তির বহু কার্যের উপস্থাপনা," তবু কার্যতঃ অপৌরাণিক ও অনৈতিহাসিক—অথচ—স্মরণীয় ব্যক্তির একটি কার্যের উপস্থাপনাও হইতে পারে॥ পূর্বেই বলা হইয়াছে—এইরূপ ক্ষেত্রে **নায়ক-ঐক্য** অপেক্ষা **"কার্য-ঐক্য"**-র বৈশিষ্ট্যই বেশী ফুটিয়া উঠে এবং রসমুখ্য বা চরিত্র-মুখ্য নাটকের লক্ষণই বেশী পাওয়া যায়॥

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। কথাটির আভাষ আগেই দেওয়া হইয়াছে—বলা হইয়াছে—যে নাটকে চরিতধর্মী গঠন পাওয়া যায়, সাধারণ পরিচয়ে উহা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সামাজিক হইলেও, বিশেষ পরিচয় দিতে উহাদের "চরিতধর্মী পৌরাণিক", "চরিতধর্মী ঐতিহাসিক" এবং "চরিতধর্মী সামাজিক" আখ্যা দেওয়া উচিত। পৌরাণিক কোন ব্যক্তির আংশিক বা সামগ্রিক জীবনকে সেখানে রূপ দেওয়া হইয়াছে ঐতিহাসিক ব্যক্তির বহুকালব্যাপী এবং বহুকার্যময় জীবনকে যেখানে রূপ দেওয়া হইয়াছে, অথবা কোন সামাজিক ব্যক্তির এইরূপ জীবন-কাহিনীকে যেখানে রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে গঠনটি অবশ্যই চরিতধর্মী হইয়াছে সুতরাং চরিত-নাটক বলিতে ব্যাপক অর্থে—পৌরাণিক চরিত-নাটক, ঐতিহাসিক চরিত-নাটক এবং সামাজিক চরিত-নাটক—সব রকম চরিত-ধর্মী নাটকই বুঝায়। মোট কথা চরিত নাটকের মধ্যে "পৌরাণিক" "ঐতিহাসিক" "সামাজিক" প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ করা সম্ভব। যে নাটকে ভীষ্মের সমগ্র জীবনকে রূপ দেওয়া হইয়াছে ("ভীষ্ম"—ক্ষীরোদপ্রসাদ), তাহাকে আমরা অবশ্যই পৌরাণিক চরিত নাটক বলিব; আবার যদি কোন নাটকে ঔরংজীবের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী শাসনকালের কার্যকে রূপ দেওয়া হয় তাহাকে অবশ্যই ঐতিহাসিক চরিত-নাটক বলিতে হইবে—আবার যদি কোন নাটকে "পথের পাচালী"র অপুর জীবনের কাহিনী পাঠশালা হইতে আরম্ভ করা হয়—বহু বৎসরের ঘটনা নাট্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া শেষ করা হয়, তাহা হইলে সেই নাটককে

অবশ্যই আমরা চরিত-নাটকই বলিব। সামাজিক চরিত নাটক ছাড়া আর কিছুই বলা যাইবে না॥ এই প্রসঙ্গেই বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে সামাজিক চরিত-নাটকের মধ্যে দুই ভাগ কল্পনা করা হইতেছে। স্মরণীয় ব্যক্তির চরিত যাহাতে উপস্থাপিত, তাহাই **যথার্থ চরিত** নাটক এবং যাহাতে অখ্যাত ব্যক্তির জীবনের ঘটনাকে চরিতাকারে রূপ দেওয়া হয় তাহা **চরিতধর্মী** সামাজিক নাটক॥

"শ্রীমধুসূদন" একখানি চরিত নাটক॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ইহার উপস্থাপ্য বিষয়। মধুসূদনের জীবনের বিশেষ কোনো একটি কার্যকে (action) রূপ দেওয়া এই নাটকের উদ্দেশ্য নহে; ইহার উদ্দেশ্য—মধুসূদনের বহু কার্যময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে —জীবনের প্রায় সবটুকু—১৮৪৩ খ্রী: হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বৎসর ব্যাপী জীবনকথাকে রূপ দেওয়া॥ ইহাতে ১৮২৪ খ্রী: হইতে ১৮৪২ অবধি —এই ১৮ বৎসরের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় নাই বটে, বলা যাইতে পারে—বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু বাকী—সব প্রধান ঘটনাই যথা সম্ভব সবিস্তারে উপস্থাপিত হইয়াছে—কবির জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত তথ্যই নাটকে স্থান পাইয়াছে। মোট কথা—নাটকে, many actions of one man উপস্থাপিত হইয়াছে॥ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ—বিশপ কলেজে অধ্যয়ন—আশাভঙ্গের মনস্তাপ লইয়া মাদ্রাজ গমন—অধ্যাপনা ও রচনা দ্বারা জীবিকার্জন—'রেবেকা'র,—পরে হেনরিয়েটার পাণিগ্রহণ—পিতার মৃত্যুর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—কোর্টে চাকরী গ্রহণ—কাব্য রচনা—ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন—ইউরোপে অবস্থান—স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ—আবার চাকরী গ্রহণ—শোচনীয় পরিণতি—ক্রমান্বয়ে সব কার্যই বিশেষ বিশেষ ঘটনা-সহ নাটকে স্থান দেওয়া হইয়াছে॥ বলা বাহুল্য উল্লিখিত কার্যগুলি সব **সমজাতীয়** নহে,—শাস্ত্রানুসারে বলিতে হইবে—many actions সুতরাং শ্রীমধুসূদন নাটকখানি শুধু নামতই চরিত-নাটক নহে, ধর্মত চরিত-নাটক। তবে মধুসূদনের জীবনের ঘটনারাজি ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হইলেও, নাটকখানি যে জীবন-চরিতের মামুলি

নাট্যরূপে পর্যবসিত হয় নাই—এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে॥ নাট্যকার মধুসূদনের জীবনের মধ্যে ট্র্যাজেডির একটি রস কেন্দ্র আবিষ্কারের অর্থাৎ মধুসূদনকে ট্র্যাজেডির নায়ক করিয়া তুলিবার জন্য সচেতন ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন॥ তিনি অসমজাতীয় নানামুখী কার্যের সমাবেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মধুসূদনের জীবনের মধ্যে ট্র্যাজেডি-নায়কোচিত গতি ও পরিণতি দেখাইবার দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। নানামুখী কার্যকে একটি ভাব-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করিয়া রূপ দেওয়ার এই চেষ্টা, আপাত অনৈক্যের মধ্যেও একটি "ঐক্যের" ধ্রুব-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে। শিল্পী এই ধ্রুব-কেন্দ্র স্থাপনা করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন্দ্রটির প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকায় মাঝে মাঝে কেন্দ্র দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং রস-বিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। এখানে শুধু এই কথাটাই বলিতে চাই যে নাট্যকার বনফুল চরিত-নাটকের মধ্যে—নায়ক-ঐক্যের পাশেই একটি রস-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন—বিভিন্ন পর্বের ঘটনাকে মধুসূদনের ট্র্যাজেডির উপকরণ হিসাবে প্রয়োগ করিয়া, ভিন্নজাতীয় ঘটনার মধ্যে, কেন্দ্রাভিমুখিতা তথা অন্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন॥ চরিত কাব্যের মধ্যে পূর্বে যে আমরা দুইটি মেরু কল্পনা করিয়াছি, তদনুসারে শ্রীমধুসূদনের স্থান দ্বিতীয় মেরুতে অর্থাৎ "শ্রীমধুসূদন"—'ব্যক্তি ঐক্যে'র কেন্দ্রে-গ্রথিত পরস্পর অসম্পৃক্ত কার্যের অন্বয়হীন ঘটনা পরম্পরা মাত্রই নহে, ইহা—ভাব-ঐক্যের কেন্দ্রে সংগ্রথিত বহু কার্যের অন্বয়যুক্ত—(অবশ্য তত গাঢ়বদ্ধ নহে)—রূপ॥ ফলে 'শ্রীমধুসূদন'কে শুধু চরিত-নাটক বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না; **শ্রীমধুসূদনকে ট্র্যাজেডি রসাত্মক চরিত-নাটক বলাই যুক্তিযুক্ত**॥

বাস্তবিক, মধুসূদনের জীবনই যেন পঞ্চাঙ্ক একখানি ট্র্যাজেডি। নানা দৃশ্যে বিভক্ত হইলেও, নিরন্তর নানা রস থাকিলেও, সমগ্রের মধ্য দিয়া একটি মূল ভাব —একটি অঙ্গী রসই যেন অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিরজীবনের তৃষ্ণায় সমস্ত জীবনটাই তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া মরা—জীবনকে আকণ্ঠ পান করিতে গিয়া

জীবনের বদলে শুধু জ্বালাকেই আকণ্ঠ পান করা—দুই হাতে জীবন ভোগ করিতে গিয়া দুই হাতে হতাশা আর দুর্ভোগ কুড়ানো—সুখের রৌদ্র ঝিকমিক করিতে-না-করিতে বেদনার ও অশান্তির কালো মেঘে সমস্ত আকাশ অন্ধকারে ঢাকিয়া যাওয়া—মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের সুদুর্লভ সম্পদ থাকা সত্বেও জর্জরিত দেহ-মনে অকালে মরণকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের দায় এড়ানো—কীর্তি-খ্যাতির উজ্জ্বল উত্তাপ সত্বেও, আভ্যন্তরীণ উত্তাপের অভাবে শীতল মৃত্যু (Cold death) বরণ করা—এই ট্র্যাজেডিরই যেন লৌকিক দৃষ্টান্ত মধুসূদনের জীবন॥ নাট্যকার বনফুল এই ট্র্যাজেডির ভাব-বীজকেই মধুসূদনের জীবনের-ঘটনা অবলম্বনে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন॥ মধুসূদনের আর্তনাদ শোনা যায় —"সারা জীবন ধ'রে কোন মরীচিকার পেছনে ছুটলাম এতদিন—"কাব্য ? যশ ? টাকা ?" এ সমস্তই তাঁহার চোখে—'মরীচিকা' মাত্র। এই সব কিছু চাওয়ার পিছনে ছিল—**সুখে থাকার বাসনা**—জীবনকে ভোগ করিবার ঐকান্তিক আবেগ—to enjoy life। সেই বাসনাই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে —সব কামনাই বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে॥ কাব্য-যশ টাকার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্তপ্রাণ মধুসূদন—সুখ-শান্তি-হারা মধুসূদন—হতাশ আর্তনাদে জীবনের শূন্যতার বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন—**'আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ জীবনে তা আর হল না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল**।" সুখের সব সামগ্রী থাকা সত্বেও, সব কিছু গোলমাল হইয়া যাওয়া —ইহাই তো মধুসূদনের জীবনের অতিসংলক্ষ্য ট্র্যাজেডি॥ তবে এই ট্র্যাজেডির মূল জীবনের গভীরতম প্রদেশে—বাসনার গভীর স্তরে প্রোথিত; জীবনের মর্মকোষে ইহার বীজ নিহিত। জীবনের সুখ শান্তি-সম্ভোগে সার্থককাম করিবার চেষ্টা—**আত্মপ্রতিষ্ঠার** কামনা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছে॥ জীবের ইহা মৌলিক কামনা॥ জীবনী-শক্তি বলিতে, এই কামনারই সবল অভিব্যক্তি বুঝায়॥ অন্যভাবে বলা যায়, এই কামনার বেগ-বৈশিষ্ট্য জীবনী-শক্তির প্রকৃতি—'অহং'-এর এষণার-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে॥

যে অহং-সত্তায় এই বাসনার বেগ অতি দুর্বল, সেই "অহং" যেমন নিরীহ, তেমনি যে ক্ষেত্রে বাসনা অতি বেগবান—সে "অহং" অস্থির ও অশান্ত। জীবনী শক্তির দৈন্য থাকিলে জীবন যেমন নির্জিত তথা দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে পারে —শোচনীয় পরিণতির আবর্তে ঘুর পাক খাইতে খাইতে তলাইয়া যাইতে পারে, তেমনি এই শক্তির অতিরেকের ফলে জীবন ভারসাম্য হারাইয়া উৎকেন্দ্রিক উৎক্ষেপে কক্ষচ্যুত হইয়া যাইতে পারে—অধিকমাত্রায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আত্মহনন করিয়া বসিতে পারে॥ **সব অত্যন্তই গর্হিত॥** মধুসূদনের ট্র্যাজেডির মূলে আছে এই জীবনী-শক্তিরই (elan vital) আত্যন্তিক অতিরেক॥ **মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তার কেন্দ্রে এই অতিরেক** (excess of life)॥ ইহা একদিকে—জীবন সম্ভোগের অতিকামনা রূপে অন্যদিকে বাধা-বন্ধ-অসহিষ্ণুতার রূপে, অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি রূপে—অবাধ স্বাধীনতা-কামনার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে॥ জীবন সম্ভোগের অতিকামনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ উদ্দীপনায় মধুসূদনকে উদ্‌ভ্রান্ত ও ঊর্ধাকাশচারী করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহার চোখে জাগাইয়া রাখিয়াছে কীর্তি-খ্যাতি-শান্তি-সুখ প্রতিষ্ঠার এক মায়াঘন স্বপ্নাবেশ॥ এক অনির্দেশ্য সুদূরের মোহিনী মায়ার হাত ছানিতে মধুসূদন যেন সম্মোহিত॥ মহাকবি হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষা কেন—দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহার সঙ্কল্পে॥ তাহারই প্রেরণায় মধুসূদন—"sigh for Albion's distant shore—the land of Shakespeare and Milton" কিন্তু তাহাতেই কি আকাঙ্ক্ষার পরিনিবৃত্তি? এ এক অনির্বাণ মহাজ্বালা॥ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে না পারিলে তাঁহার শান্তি নাই—"আমি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে চাই"—(১২১ পৃঃ)—মধুসূদন নিজেই বলিয়াছেন—"আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—I can not rest half way—I must soar up and uptil I am tired and even then I shall soar" জীবনের অতি-আবেগে মধুসূদন যেন সেইরূপ এক নভোচারী বিহঙ্গ যে আকাশের কিনারা না খুঁজিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসিবে না—শ্রান্তি ক্লান্তিতে

শিরা উপশিরা অবশ হইয়া পড়িলেও যে পক্ষ সঞ্চালনে বিরত হইবে না॥ এত দুর্নিবার তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা!

মধুসূদন যদি শুধুই স্বপ্নবিভোর—অলস বাসনাবিলাসী হইতেন তাহা হইলে হয়ত এত করুণ পরিণতি তাঁহার জীবনে ঘটিত না। জীবনের অতিমাত্রা তাঁহার মনে যেমন স্বপ্ন জাগাইয়াছে—উচ্চাশায় তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, তেমনি তাঁহার স্নায়ুতে সঞ্চার করিয়াছে অকম্পিত দৃঢ়তা—ইচ্ছা-শক্তিতে (will) ইস্পাত-কঠিন অনমনীয়তা এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্পর্শকাতরতা ও বাধা-অসহিষ্ণুতা॥ বাধা না মানার মন্ত্রণা রহিয়াছে তাঁহার স্বভাবে—তাঁহার রক্তে॥ তাঁহার স্পষ্ট ঘোষণা—"I won't be ruled over. I shall break through bonds. It is in my nature—it is in my blood" (৩৭ পৃঃ)॥ তাই তো মধুসূদন **জাত-বিদ্রোহী**॥ এক revolutionary"—"rebel" তাঁহার মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াই আছে॥ সেই বিদ্রোহী পিতার "coercion" যেমন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তেমনি সমস্ত অবমাননা ও বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বলে—"I won't be treated shabbily"॥ জীবন-সম্ভোগের-অতিকামনাকে যদি বলা যায় 'অগ্নি'—এই স্বভাবটিকে বলা যাইতে পারে 'বায়ু'॥ এই বায়ুর আনুকূল্যেই অগ্নির পক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলা সম্ভব হইয়াছে।

মধুসূদনের ব্যক্তি-প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা নিহিত। নিয়তি বলিয়া কোন শক্তিকে যদি এখানে স্বীকার করিতে হয়, স্বীকার করিতে হইবে—মধুসূদনের প্রকৃতিই সেই নিয়তি—তাঁহার character-ই 'destiny' তাঁহার "পশ্চাতের-আমি"ই তাঁহার 'সম্মুখের-আমি'কে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। নিজের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে বলিয়াছেন—তিনি—"reckless, tactless, thoughtless, and everythingless" তাহা হয়তঃ সর্বাংশে সত্য নয়। অন্ততঃ everythingless যে তাঁহাকে বলা যায় না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ড

স্বরূপ যে একটি প্রবৃত্তি প্রবল বাসনা-ব্যগ্র অস্মিতা-স্ফীত এবং স্পর্শকাতর ব্যক্তিত্ব আছে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এই জাতীয় চরিত্র, তাঁহাদের স্বভাবেই, ট্র্যাজেডির বীজ বহন করে। ইহাদের জীবনে উত্তাপেরও গতির চাহিদা এত বেশী যে সংযমের এবং নিয়ম শৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জীবন-যাপন করার ধৈর্য ইহাদের থাকে না। উত্তাপ আহরণ করিতে গিয়া সমগ্র বিশ্বকে মুখের মধ্যে পুরিতে চায় এবং অপর জীবনকে--শেষ পর্যন্ত নিজেকেও, একেবারে অঙ্গারে পরিণত করে। গতির আবেগেই, পারিপার্শ্বিক জীবনের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া দেয় এবং সেই দ্বন্দ্ব সংঘাতে অপরকে এবং নিজেকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। জীবন সম্ভোগের প্রবল আবেগে জীবনকেই ইহারা শেষ করিয়া ফেলে—কল্পিত সুখ-শান্তির মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া শুষ্কতালু হইয়া অকালে শুকাইয়া মরে। এই জাতীয় লোকের ট্র্যাজেডিতে, পরিবেশ অপেক্ষা নিজেদের দায়িত্বই সমধিক। মধুসূদনের ট্র্যাজেডিতেও তাঁহার নিজের দায়িত্বই বেশী।

Nature and Nature—সহজাত প্রকৃতি এবং শিশুকালীন শিক্ষা-দীক্ষা মিলিয়া প্রকৃতির গোড়াপত্তন হয়। মধুসূদনের প্রকৃতিও এই নিয়মেই গঠিত হইয়াছে। সহজাত স্নায়বিক গঠন এবং পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষার নিয়ন্ত্রণ মিলিয়াই মধুসূদনের অসাধারণ প্রকৃতির গোড়াপত্তন করিয়াছে এবং তাহারই দ্বারা মধুসূদনের ভাবী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এ কথা সত্য—ইংরেজের আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে,—ইংরেজ জাতির এবং ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার উপরে বাঙালীর বিস্ময়মিশ্র শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে—তাহাদের সম্মুখে নূতন এক আকাশের অবকাশ উন্মুক্ত হয় এবং সেই আকাশের আলোক-রশ্মি আসিয়া অনেকের চোখেই ধাঁধা লাগায়। বহু উদ্‌গতপক্ষ বিহঙ্গমের পক্ষবিধূনন ও কূজন শোনা যায়। কিন্তু সেই আলো মধুসূদনের চোখে এমন এক সুখ-শান্তি-মুক্তির মোহ বিস্তার করে যে তিনি নীড়ের মায়া ত্যাগ করিয়া সেই আলোর পিছনে পতঙ্গের মতো অন্ধ

আবেগে ছুটিয়া যান। ইংরেজীতে কাব্য লিখিয়া তিনি **পৃথিবীর কবি** হইবেন,—পৃথিবীর কবির সহধর্মিনী হইতে পারে এমন শিক্ষিতা **রুচিমতী কন্যাকে** বিবাহ করিবেন, অক্ষয়কীর্তি, অফুরন্ত অর্থ-প্রতিপত্তি সুখ, শান্তিতে জীবন কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে—এইভাবে জীবনকে তিনি নিঙড়াইয়া ভোগ করিবেন—ইহাই তাঁহার জীবনের স্বপ্ন হইয়া উঠে। যে অহং পুরুষের (ego) চোখে এই স্বপ্ন জাগে, তাহার প্রকৃতি—পূর্বেই বলা হইয়াছে—অসাধারণ। রক্তে তাঁহার স্বৈরাচারের মন্ত্রণা। অত্যধিক স্নেহের প্রশ্রয়ে তাহা আরো পুষ্ট হয়। প্রবৃত্তির তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাইতেই মধুসূদন অভ্যস্ত। নিবৃত্তি বা সংযম শৃঙ্খলার সহিত পরিচয় একরূপ হয় না বলিলেই হয়। অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া করিয়া মনের এমন অবস্থা হয়—চিত্ত এত স্পর্শকাতর হয়, যে সামান্যতম বাধা পাইতেই তাঁহার অহংবোধ আহত হইয়া পড়ে—ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এইরূপ যাঁহার প্রকৃতি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মানস-বিলাসমাত্রে পর্যবসিত হইতে পারে না; মধুসূদনেরও হয় নাই। মধুসূদনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভীরুস্বভাব বিলাসীর সাধের স্বপ্ন হইয়া থাকে নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছে।

মধুসূদন জীবনের একটা ছক—আদর্শ পরিকল্পনা—যেন আগেই আঁকিয়া লইয়াছেন। মহাকবি হইতে হইলে ইংলণ্ডে অবশ্য যাইতে হইবে—সুতরাং খ্রীষ্টান না হইলে চলিবে না; এদিকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা দেবকীকে পাইতে হইলেও খ্রীষ্টান হইতে হইবে। অতএব; মহাকবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং দেবকীকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা—এই দুই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার প্রাথমিক আয়োজন খ্রীষ্টান হওয়া। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মূল কারণ এখানেই। পিতার 'coercion' তাঁহার জীবনে প্রথম বাধা এবং সেই বাধা তাঁহার অভিমানকে ক্ষুব্ধ করেও বটে, কিন্তু উহা তাঁহার গৃহত্যাগের এবং ধর্মান্তরগ্রহণের নিমিত্তকারণ মাত্র। পিতা বাধা না দিলে ধর্মান্তর গ্রহণে একটু বিলম্ব হইত—এই যাহা পার্থক্য।

কিন্তু জীবন-সম্ভোগের যে যে আশা লইয়া মধুস্থদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তাহা একে একে মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইতে থাকে। পাদ্রীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না—তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যান না। আর "দেবকী"কেও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন না। ইংলণ্ড এবং দেবকী—দুই প্রিয় কামনাই অপূর্ণ থাকে—দুইটি আশাই ভঙ্গ হইয়া যায়। একূল ওকূল দুই কূল হারাইয়া, মধুস্থদন আশাভঙ্গের মনস্তাপ লইয়া মাঝ দরিয়ায় ভাসিতে থাকেন। জীবনের ট্রাজেডি আরম্ভ হয়—শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করে। তিনি তো "dead log of wood" নহেন। পিতা মাতার স্মৃতি—বিশেষতঃ মাতার কাতর দৃষ্টি তাঁহাকে অনুক্ষণ পীড়া দেয়। তাঁহার—"শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না"। প্রীতি ও স্মৃতি কি এত সহজেই মরে? বিসর্জনের বাজনা শুনিয়া তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। সুখ শান্তির আশায় ঝাঁপ দিয়াছেন, কিন্তু 'ঘরেও নহে পারেও নহে'···অবস্থা, যাঁহার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিয়াছেন সেই সুখ-শান্তিই হারাইয়া বসিয়াছেন! কূলহারার কূলে পৌঁছিবার নিষ্ফল সংগ্রামের ট্র্যাজেডিই মধুস্থদনের জীবনের আসল ট্র্যাজেডি।

শান্তি নাই। স্বস্তিও তাঁহার ভাগ্যে নাই। ঐরূপ অহং স্ফীত ভোগ-প্রবণ ব্যক্তির স্বস্তি কোথায়? অসহিষ্ণু প্রতিবাদের আঘাতে বারবার স্বস্তির আবহাওয়া ক্ষুব্ধ করিয়া তুলেন। বিশপ কলেজে তিনি তাহাই করেন। বিদ্রোহী মধুস্থদন—স্পর্শকাতর ও আত্মাভিমানী মধুস্থদন পাদ্রীদের পক্ষপাত ও অবমাননাকে মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে পারেন না। সক্রিয় প্রতিবাদ করিয়া স্বস্তিটুকুর সহিত বাদ সাধেন। কৃষ্ণমোহনের মুখের উপরেও বেয়াড়া কথা বলিতে তাঁহার বাধে না—দেবকীর-পিতাকেও ছাড়িয়া কথা বলেন না। আবার প্রায়শ্চিত্তের খিড়কি দরজা দিয়া হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্তিলাভ করিবেন, সে ধাতুতেও তিনি গঠিত নহেন। তাই বিশপ কলেজে পড়া বন্ধ হইলে, অগত্যা তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া, জীবিকার্জনের জন্য মাদ্রাজ যাইতে

হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রাজার দুলালকে জীবিকার্জন করিতে হইয়াছে। জীবনে যিনি টাকা পয়সা গুনিয়া বকশিষ দেন নাই—হাতে যাহা উঠিয়াছে তাহাই দিয়াছেন—সেই "রাজনারায়ণের ছেলে"কে অবিরাম পাওনাদারদের কড়া তাগাদা সহ্য করিতে হইয়াছে—নিত্য অভাবের কুণ্ড বুকে জ্বালাইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন এই অভাবের তাড়নার হাত তথা যন্ত্রণা (suffering) এড়াইতে পারেন নাই। চাকরী করিয়া এবং বই লিখিয়া টাকা পাওয়া সত্ত্বেও, অর্থাভাব তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়াই রহিয়াছে। যিনি "দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে" চাহেন—"রাশি রাশি টাকা মুঠো মুঠো খরচ করতে" চাহেন—যিনি simple hate to live in close atmosphere, ঐরূপ অবস্থায় যাঁহার দম আটকাইয়া যায়—সেই বৈশ্বানর সম্ভোগী কি এক আধ চামচে ঘি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? মধুসূদনের পক্ষে এই অর্থাভাব যে কত বেদনাদায়ক, মধুর হিন্দুকলেজের সহপাঠী ছাড়া আর কেহই তেমন উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।—"a five hundred rupees per month are too inadequate for a poet of my calibre"—পরিহাস-বিজল্পিত নহে—অন্তরের কথা। তাই দেখা যায়—অভাব-তাড়িত কবি-মধুসূন অনেক ক্ষোভে ব্যারিষ্টার হইতে ইংলণ্ড ছুটিয়াছেন—অর্থ চাই—"I must have more money"।

কিন্তু এই "more money"র মুখ জীবনে তিনি আর দেখেন নাই। ইউরোপে অকথ্য অভাবের যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা সহিয়া দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে, ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধ ও সাধ্যের সামঞ্জস্য কোন দিনই স্থাপন করিতে পারেন নাই। সাধ মিটাইতে যাওয়ার ফলে, টেবিলে বিলের উপর বিল জমিয়াছে—পাওনাদারদের সংখ্যা এবং দেনার পরিমাণ এবং ঋণ, হুহু করিয়া বাড়িয়াছে। সাধ্য না থাকায়, পাওনাদারের গঞ্জনা মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে—দশের সম্মুখে মাথা হেঁট করিতে হইয়াছে—মরণেরও অধিক হইয়াছে। "লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল"।

শোচনীয় আর্থিক ও মানসিক অবস্থার সহিত শারীরিক অবস্থা যোগ দিয়া, মধুসূদনের শোচনীয় পরিণতিকে শোচনীয়তর করিয়া তুলে। প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে কার্পণ্য করে না। যকৃৎ আর কত সহিবে? নানাবিধ ব্যাধিতে মধুসূদনের শরীর ভাঙিয়া পড়ে।

তাঁহার গলায় ঘা পেটে জল পিলে-লিভার, সঙ্গে আছে রক্তবমি, সেই নিত্যসঙ্গী অভাবের তীব্র তাড়না—পাওনাদারদের 'গালাগালি'। আর সব জ্বালার উপরে মর্মান্তিক জ্বালা—**অনুগ্রহের নিগ্রহ।** রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র—মাইকেল মধুসূদন দত্ত—যাঁহার মুখে 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়'—লাগিয়াই থাকিত, সেই মধুসূদন দত্ত আজ সকলের অনুগ্রহের পাত্র। উত্তর পাড়ার জয়কেষ্ট মুখুজ্যে তাঁহাকে বিনা ভাড়ায় থাকিবার জন্য আহ্বান জানান! পাওনাদার গোবর্ধন পর্যন্ত তাঁহাকে অনুগ্রহ দেখায়! মধুসূদনের পক্ষে—মৃত্যু কি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ আরামদায়ক নহে? নিভু নিভু প্রাণ-শিখাটি তিনি যেন ফুঁ দিয়া নিভাইতে পারিলেই বাঁচেন—"out out brief candle!"—তাঁহার অতিদুঃসহ জীবনেরই অন্তিম আর্তনাদ।

মধুসূদনের এই মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিকেই নাট্যকার রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও নাট্যকার বলিয়াছেন—"মধুসূদনের জীবন চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু"—অর্থাৎ মধুসূদনের নানা ব্যক্তিত্বকে রূপ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য, তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে মধুসূদনের **ট্র্যাজেডিকে** রূপ দেওয়াই মুখ্য লক্ষ্য হইয়াছে এবং রচনার মধ্য দিয়া সেই রসই ব্যক্ত হইয়াছে। শেষ দৃশ্যের—"মধুসূদন মরেনি—মরতে পারে না—অসম্ভব"—বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি যত সত্য, "ভদ্রলোকে"র উক্তিটি—"এত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন শুনলে চোখের জল রাখা যায় না"—ততোধিক সত্য। কবি অমর হইয়াছেন সত্য কিন্তু সুখ-শান্তিহারা কবির জীবন-সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণতি খুবই শোকাবহ॥

সমালোচনা

(গঠন)

নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন—"ইহা ইতিহাস বা জীবনচরিত নহে—নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।" নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে এই নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে এবং কথোপকথনে ঐতিহাসিক যাথাযথ্য অর্থাৎ মধুসূদনের কার্যাবলীর স্থানগত, কালগত এবং পাত্রগত নিখুঁত সত্যতা খুঁজিতে গেলে যেমন ভুল করা হইবে তেমনি এই নাটককে মধুসূদনের জীবন-সম্পর্কিত তথ্যরাজির বিবরণমাত্র মনে করিলেও ভুল করা হইবে। ইহা নাটক অর্থাৎ মধুসূদনের জীবনের রসরূপ। প্রত্যেক চরিত-নাট্যকারের মতই নাট্যকারের উদ্দেশ্য—একদিকে মধুসূদনের **সমগ্র-ব্যক্তিত্বকে** ব্যক্ত করা, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গেই, মধুসূদনের জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতিকে রূপায়িত করা। বলা যাইতে পারে, চরিত নাট্যকার বনফুলের লক্ষ্য সম্পূর্ণ একাগ্র নহে। এক অগ্র মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দিকে—জীবনের ও যুগের তথ্য পরিবেষণের দিকে প্রবণায়িত অন্য অগ্র—ট্র্যাজেডি-পরিণাম দেখাইবার দিকে নিয়োজিত। অতএব সূত্র করা যাইতে পারে, এই দুই প্রবণতার নির্বিরোধ সামঞ্জস্য যে পরিমাণে ঘটিতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণেই নাটকের গঠন প্রশংসনীয় হইয়াছে। আর তথ্য-প্রবণতা যেখানে রস-চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—রস হইতে বস্তু যেখানে দূরবর্তী বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই স্রষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। গঠন বিচারে এই সূত্রটিকে আমরা মূল সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি।

অবশ্য গঠন-বিচার বলিতে বুঝায় সাধারণতঃ সমগ্র বৃত্ত-কল্পনাটির বিচার এবং বিশেষতঃ বুঝায়—সন্ধি-বিভাগ এবং অঙ্ক-দৃশ্য-পরিকল্পনার বিচার;

আরো বিশেষতঃ—সমগ্র কার্যকে (action) কিভাবে সন্ধি-বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার বিচার যে-অঙ্ক বা দৃশ্যপরিকল্পনার দ্বারা কার্যকে ব্যক্ত করা হইয়াছে, উহার ঘটনা-যোজনার উপযোগিতার এবং কৌশলের বিচার সেই সমস্ত ঘটনার স্থানকালপাত্র-গত ঔচিত্যের বিচার। সুতরাং 'শ্রীমধুসূদন' নাটকখানির গঠন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার আগে আমাদেরও সমস্ত দৃশ্য-পরিকল্পনার দোষ-গুণ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—যে সমস্ত ঘটনার (incidents) সংযোগে নাট্যকার এক একটি দৃশ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের আবশ্যকতা, সংযোগ গ্রন্থির সবলতা-দুর্বলতা, সংশ্লেষ-বিশ্লেষের দোষ-গুণ এবং সর্বোপরি তাহাদের কার্যানুবন্ধিতা (necessary for action) বিচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, যে দৃশ্য-পরিকল্পনার সাহায্যে নাট্যকার মধুসূদনের জীবন—তাঁহার ব্যক্তিত্ব আচার-আচরণ এবং শেষ-পরিণতি, রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক। আমরা দেখি—শ্রীমধুসূদন নাটকে নাট্যকার—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—৩০ বৎসর-ব্যাপী কার্যকে (action) রূপ দিয়াছেন এবং এই রূপকে ছোট-বড় মোট একুশটি দৃশ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অঙ্ক-বিভাগ নাই বটে, কিন্তু বিরতি দ্বারা অঙ্ক-বিভাগের প্রয়োজন মেটানো হইয়াছে। এইরূপ বিভাগের কৈফিয়ৎ ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই দিয়াছেন।

(ক) প্রথম হইতে ষষ্ঠ দৃশ্য অবধি :—প্রধান ঘটনা—মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ। খ্রীষ্টধর্মে-দীক্ষিত মধু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন এখানেই ষষ্ঠদৃশ্যের শেষে প্রথম বিরতি। (খ) সপ্তম হইতে নবম তিন দৃশ্যের পর দ্বিতীয় বিরতি। এখানকার প্রধান উপস্থাপ্য মধুসূদনের বিশপ কলেজের জীবন, দেবকীর প্রতি অনুরাগ, পাদ্রীরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মধুসূদনের ক্ষোভ ও আশাভঙ্গ এবং দেবকীর সহিত মধুসূদনের বিবাহে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের অনিচ্ছা, দেবকীর সহিত মধুর বিচ্ছেদ।—

ইংলণ্ডে গমন এবং দেবকীর পাণিগ্রহণ—দুই আশাই ভঙ্গ। (গ) **দশম-একাদশ** দুই দৃশ্যে মাদ্রাজ প্রবাসের প্রথম পর্যায়—অর্থাৎ মাতৃবিয়োগ পর্যন্ত মাদ্রাজ-জীবন, মাতৃবিয়োগের পর কলিকাতা আগমন উপস্থাপিত। একাদশের পরে **তৃতীয় বিরতি**। (ঘ) দ্বাদশ দৃশ্যের পরেই—**চতুর্থ বিরতি**। এই দৃশ্যে—মাদ্রাজ প্রবাসের পরিসমাপ্তি—রেবেকার সহিত বিচ্ছেদ—হেন্‌রিয়েটার সহিত প্রণয় ও পরিণয় রূপ দেওয়া হইয়াছে। (ঙ) ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ দৃশ্য অবধি—চার দৃশ্যে কলিকাতার এবং কাব্য-সাধনার জীবন—ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবার প্রস্তুতি প্রদর্শিত। ষোড়শ দৃশ্যের পরে **পঞ্চম বিরতি**। (চ) সপ্তদশ দৃশ্যে—মাত্র একটি দৃশ্যেই ইউরোপ প্রবাসের জীবন উপস্থাপিত। এই দৃশ্যের পরেই—**ষষ্ঠ বিরতি**। (ছ) অষ্টাদশ হইতে একবিংশতি বা 'শেষ দৃশ্য' পর্যন্ত চারিটি দৃশ্যের পরে 'যবনিকা-পাতে শেষ বিরতি। এই কয়টি দৃশ্যে বিলেত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার মধুসূদনের অর্থোপার্জনের সংগ্রাম—নিষ্ফল সংগ্রাম এবং শোচনীয় পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"বিরতি"-বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই এই কথাটা মনে আসে যে—বিরতিগুলির মধ্যে সমপরিমাণ ব্যবধান নাই। ৬ দৃশ্যের পরে প্রথমে বিরতি, প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে ৩ দৃশ্যের ব্যবধান, দ্বিতীয়-তৃতীয়ের মধ্যে—২ দৃশ্যের, তৃতীয়-চতুর্থের মধ্যে ১ দৃশ্যের, চতুর্থ-পঞ্চমের মধ্যে—৪ দৃশ্যের, পঞ্চম-ষষ্ঠের মধ্যে ১ দৃশ্যের, এবং ষষ্ঠ এবং শেষ বিরতির মধ্যে—৪টি দৃশ্যের ব্যবধান। এইরূপ বিষম "বিরতি"-বিভাগের ফলে অভিনয়ের সাবলীল গতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। এক বিরতির পরে অপর বিরতি অতি বিলম্বে বা অতি-দ্রুতভাবে উপস্থিত হইলে দর্শক-চিত্তের প্রত্যাশা আহত হইতে পারে—দর্শকচিত্তে বিরক্তি দেখা দিতে পারে। অঙ্ক বা "বিরতি" বিভাগের সৌষম্যের অভাব গঠন-সুষমার দৈন্যই সূচিত করে। অবশ্য নাট্যকার এ বিষয়ে অনবহিত নহেন। ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা

করা সম্ভব হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথামত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই। অভিনয়কালে—যদি অবশ্য কখনও অভিনীত হয়—যে যে দৃশ্যের পর বিরতি দিলে শোভন হইবে তাহাই কেবল লিখিয়া দিয়াছি।"

তারপর, একুশ-দৃশ্য-বিভক্ত নাটকখানির অভিনেয়ত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠিতে পারে। নাট্যকারের নিজেরও ধারণা ছিল—যদিও তাহা ভ্রান্ত ধারণা—"এ নাটক কখনও অভিনীত হইবে না"। এই ধারণার কারণ বোধ হয়—নাটকখানির ১৭৯-পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃতি। গড়ে ১০ মিনিট করিয়া প্রতি দৃশ্যের জন্য লাগিলে, ২১ দৃশ্যের অভিনয়ে—২১ × ১০ = ২১০ মিনিট সাড়ে তিন ঘণ্টা—"বিরতি" লইয়া সাড়ে চার ঘণ্টা লাগিবার কথা। এদিকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—২॥ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া ব্যবসায়ের খাতিরেই সম্ভব হয়না। দুইবার অভিনয় করিতে না পারিলে তাহাদের ব্যবসায় ভাল জমে না। ফলে সিনেমার চাপে, অভিনেয়ত্বের কাল-মাত্রাও এই ২॥ বা ৩ ঘণ্টায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলিয়া এ কথা বলিলে ভুল হইবে—নাটকখানি অভিনেয় নহে। শুধু অভিনয়ের কালব্যাপ্তি দ্বারা অভিনয়ত্ব যাচাই করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না।

দৃশ্য-পরিকল্পনার বিশেষ পরিচয়

প্রথম দৃশ্যে—মুখ্যভাবে মধুসূদনের চারিত্রিক প্রবণতাগুলি—বীজাকারে স্থাপিত হইয়াছে এবং কার্যারম্ভের সূচনা করা হইয়াছে। **প্রবণতাসমূহ :**—[ক] পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে বিলাসিতা [খ] শিক্ষিতা এবং পরিণতবয়স্কা মেয়ে—(দেবকীকে বা ইংরেজের মেয়ে) বিবাহ করিবার ইচ্ছা [গ] প্রাণঢালা বন্ধু-প্রীতি [ঘ] পিতার প্রশ্রয়ে—ধূমপানে ও মদ্যপানে আসক্তি। [ঙ] সংগীতে ও সাহিত্যে রতি—মহাকবি হওয়ার প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা—তত প্রবলতম ইংলণ্ডে যাওয়ার বাসনা [চ] বাধা-অসহিষ্ণু স্পর্শকাতর চিত্ত। **কার্যারম্ভ :**—

বিবাহ-ব্যাপারে রাজনারায়ণের জিদ—"Coercion"—এবং মধুসূদনের প্রতিক্রিয়া। **ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথ্য ঃ**—মধুসূদনের বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা—অবশ্য চরিত্রদ্যোতক—অসাধ্যসাধন করিবার প্রবৃত্তির ও শক্তির দ্যোতক। ঘটনা :—[ক] ভায়ের সঙ্গে ভাব করিবার জন্য পোষা পাখীর ছানা কাটিয়া ফেলা [খ] পাঠশালায় পড়িবার কালেই রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বই পড়া। **অন্যান্য তথ্য ঃ**—হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ—বিশেষতঃ গণিত অধ্যাপক রিজ সাহেব, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতির সংবাদ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মুখ্য উপস্থাপ্য ঘটনা—মধুসূদনের গৃহত্যাগ এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণের উদ্যোগ—মুন্সী রাজনারায়ণের প্রতিক্রিয়া। এই উপস্থাপনার জন্য, গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে 'দৃশ্য' স্থাপনা করা হইয়াছে এবং রাজকৃষ্ণ বসাকের চরিত্র ও সংলাপ দ্বারা, পটভূমি হিসাবে, হিন্দু ধর্মের সঙ্কটের রূপটি আঁকা হইয়াছে। রূপটি এই—একদিকে পাদ্রিদের প্রচার—কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো'র দুর্মতি—ছেলে ধরিয়া খ্রীষ্টান করার চেষ্টা, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের প্রচার। এক দিকে ডিরোজিও অন্যদিকে রামমোহন—সনাতন হিন্দুধর্মের মহাসঙ্কট।

এই দৃশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে—[১] হেয়ার সাহেবের ছাত্রপ্রীতি [২] কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যোর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের আবেগ [৩] খিদিরপুরের —মধুর বাড়ীর পাশেরই—নবীন মিত্রের খ্রীষ্টান হওয়া [৪] রামগোপাল ঘোষের জর্জ টমসনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বক্তৃতা দান [৫] ফৌজদারী বালাখানায় বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগ [৬] দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসনকে এদেশে আনিয়া মহোপকার করিয়াছেন [৭] চক্রবর্তী ফ্যাক্‌সন [৮] 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মন্তব্য [৯] মধুর আর দুই বড় ভাই ··প্রসন্ন ও মহেন্দ্র অকালে মৃত। [১০] তত্ত্ব-বোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতাপ। [১১] "চন্দ্রিকা-প্রকাশে"-প্রকাশিত কেষ্ট বন্দ্যোর ছেলে-ধরার কাহিনী।

তৃতীয় দৃশ্যে—মধুসূদনের বন্ধু—বন্ধু, ভোলানাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব

প্রভৃতির কথোপকথনের সাহায্যে—বিশেষতঃ রক্ষণশীল ভূদেবের সমালোচনা দ্বারা এবং প্রগতিশীল বন্ধু, ভোলানাথ প্রভৃতির সমর্থন দ্বারা, মধুর প্রকৃতি ও আচরণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে—মধুর খ্রীষ্টান হওয়ার অটল সঙ্কল্প এবং পিতার "coercion"এর বিরুদ্ধে—মিলিটারি মেজাজের বিরুদ্ধে —মধুর ততোধিক মিলিটারি মেজাজ। মধু "পয়েন্ট ওয়ানের দলে"—টাকা-পয়সা লেনদেন ব্যাপারে মধুর দরাজ হাত।

চতুর্থ দৃশ্যে—প্রধান ঘটনা—জাহ্নবীর অনুরোধে রাজনারায়ণকে লাঠি শড়কির সাহায্যে মধুকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প ত্যাগ করা—প্যারীচরণের মুখে কয়েকটি সংবাদ পরিবেষণ করা:—(ক) গৌরদাস—ভূদেবকে পাদ্রিরা দেখা করিতে দেয় নাই। (খ) ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। [এই দৃশ্যে—ভিখারিণীর মুখে গুপ্ত কবির একখানি গান দেওয়া হইয়াছে। জাহ্নবীর যে মানসিক অবস্থা তাহাতে গান শুনিবার বা শোনাইবার অবকাশ নাই বলিয়াই মনে হয়। কালক্ষেপের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু গানের সাহায্য লওয়া ঠিক হয় নাই।]

পঞ্চম দৃশ্যে—ডাঃ কোরবাইনের বাড়ীতে মধু ও গৌরদাসের সাক্ষাৎকার —মধুর নিজের মুখেই আত্মবিশ্লেষণাত্মক কথা শোনা যায়। এখানেই প্রথম মধুসূদনের অন্তর্দ্বন্দ্বের—Private feelings-এর আভাস পাওয়া যায়—জানা যায়, মধুসূদনের মনে মায়ের জন্য কত গভীর ও তীব্র আবেগ। একদিকে তাঁহার "Principle"—অন্যদিকে মায়ের আকর্ষণ। মায়ের মূর্তি দিনরাত তাঁহার চোখে ভাসে—"She haunts…" শান্তি কোথায়? 'তথ্য' পাওয়া যায়—দীক্ষার সময় যে গানটি গাওয়া হইবে তাহা মধুর নিজেরই রচিত।

ষষ্ঠ দৃশ্যে—প্রধান ঘটনা—মায়ের অনুরোধে, পিতার দেওয়া টাকা লইয়া বিশপ কলেজে পড়িতে মধুর সম্মতি। **আনুষঙ্গিক ঘটনা:**—পুনর্বার বিবাহ করিতে **রাজনারায়ণকে জাহ্নবীর অনুরোধ—রাজনারায়ণের মৌন সম্মতি—মায়েরপ্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাবে মধুর দৃঢ় অস্বীকৃতি। (মাতা পুত্রের সাক্ষাৎকারের করুণ দৃশ্য)।***

*[রাজনারায়ণের চরিত্র এখানে একটু লঘু হইয়া পড়িয়াছে। জাহ্নবীর উক্তি—"ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি…[৪৩ পৃষ্ঠা]—এবং রাজনারায়ণের উক্তি—"অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না আমি; সে অনুরোধ আমায় করো না" রাজনারায়ণের চরিত্রের গাম্ভীর্যহানি ঘটাইয়াছে।]

(প্রথম বিরতি)

সপ্তম দৃশ্যে—মুখ্য উপস্থাপ্য ঘটনা স্বাধীনচেতা মধুর বিশপ কলেজের কীর্তি—দেবকীর সহিত মধুর মধুর সম্পর্ক—দেবকীকে বিবাহ করিবার জন্য মধুর ব্যাকুলতা।—[ট্র্যাজেডির সূচনা]—গৌরদাসের কাছে মধুর স্বীকৃতি—"আমি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারব না ভাই তোকে। ভাই গৌর বলিতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়। আমার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার।" …"…I am studying Greek, Latin and Sanskrit—কিন্তু শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছল ভাই। আবার হিন্দু হওয়া যায় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না।" [-দৃশ্যের প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কমলমণির আলাপ—পরিহাস রসাত্মক। আলাপ একটু দীর্ঘ হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও দেবকীর আলাপ দিয়া দৃশ্যটি আরম্ভ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।]

অষ্টম দৃশ্যে—রাজনারায়ণের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎকার—এবং "heathen rascals" কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ—অবশ্য পিতার-উত্তেজনাই সমধিক প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজনারায়ণের চাপা বাৎসল্য এবং আহত অভিমান—আর মধুর মায়ের প্রতি টান—দুইটির সংস্পর্শে এবং সংঘর্ষে দৃশ্যটির রসোজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

নবম দৃশ্যে——মধুসূদনের দ্বিতীয় আশা ভঙ্গ হইয়াছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন মধুর মত 'উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে দেবকীকে দিতে' অসম্মত হইয়াছেন। এই দৃশ্যে এই সকল তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে:—(ক) মধুর গ্রীক-ল্যাতিন-

ইংরেজি সাহিত্য আবৃত্তি করার ক্ষমতা (খ) "বিবিধার্থ সংগ্রহ"—পত্রিকা (গ) বিশপ্‌ কলেজে স্বাধীনচেতা মধুর দ্বিতীয় কীর্তি—মদ দেওয়া ব্যাপারে শাদা চামড়া কাল চামড়ার পার্থক্য করায় খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করা (ঘ) বই বাঁধা দিয়া টাকা ধার করা—[অমিতব্যয়িতা]। (ঙ) মধুসূদনের বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করিবেন।

(দ্বিতীয় বিরতি)

বিঃ দ্রঃ—[যে দুইটি আশায় মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই দুইটি আশাই ভাঙিয়া গিয়াছে। আশাভঙ্গের অন্তর্দাহ শান্তিহারা জীবনের যন্ত্রণাকে আরো বাড়াইয়া দিয়াছে।]

দশম দৃশ্যে—মাদ্রাজ জীবনের ঘটনা। [ক] অরফ্যান স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ভদ্রভাবে থাকা যায় না বলিয়া "টিমথি পেনপোয়েম" ছদ্মনামে 'সার্কুলেটর', 'এথিনিয়ম', 'স্পেক্‌টেটার' প্রভৃতি পত্রিকায় "ক্যাপটিভ লেডী" এবং অন্যান্য কবিতা রচনা। [খ] ঋণের উপর ঋণ করিয়া চাল বজায় রাখার চেষ্টা। [গ] হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, লাতিন, ইংলিশ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা। অন্যান্য তথ্য :—[ব্যক্তিগত]—বাংলা শিক্ষা—রেবেকার সহিত সম্পর্কের অবনতি—হেনরিয়েটার সহিত নূতন সম্পর্ক। গৌরদাসের পত্রে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ। [বাংলার খবর] [ক] "হরকরা" পত্রিকার সংবাদ :—"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান" প্রতিষ্ঠা। [খ] ব্ল্যাক এ্যাক্ট ব্যাপারে চটিয়া সাহেবরা রামগোপাল ঘোষকে 'এগ্রিহরটিকালচারাল সোসাইটি'র সহকারী সভাপতির পদ হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন।

একাদশ দৃশ্যে—মায়ের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর মধুর কলিকাতা আগমন [১৮৫১ খ্রীঃ অঃ]। —রাজনারায়ণের মৃতা জাহ্নবীর জন্য শোচনা,—অসাক্ষাতে মধুর জন্য পিতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, সাক্ষাতে মধুসূদনের সহিত কর্কশ ব্যবহার—দৃশ্যটিকে খুব রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বাদশ দৃশ্যে—মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্ব। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের হাতে গৌরদাস যে পত্র দিয়াছিলেন সেই পত্রে মধু পিতার মৃত্যু-সংবাদ পান এবং মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। এই দৃশ্যে নিম্নলিখিত তথ্যরাজি প্রয়োগ করা হইয়াছে [১] বাংলা গদ্য সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চ-বিংশতির আবির্ভাব [২] বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার উপরে মধুসূদনের অভিমান [৩] বেথুন সাহেবের 'ক্যাপটিভ লেডী' কাব্যের প্রশংসা—বেথুনের মৃত্যু [৪] বাংলায় লেখার জন্য বেথুনের নির্দেশ [৫] রেবেকার ডাইভোর্স।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ

ত্রয়োদশ দৃশ্যে—'রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করিবার জন্য মধুসূদনকে আহ্বান, মথুর কিশোরীচাঁদের ইণ্টারপ্রেটরের পদ—১২০ টাকার চাকরী গ্রহণ—বাংলায় ভাল নাটক রচনার এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ—মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। সমসাময়িক কালের তথ্য :—[১] কালী প্রসন্ন কর্তৃক 'বিক্রমোর্ব্বশী' অনুবাদ [২] ক্ষেত্র গোঁসাই ও যদুপাল কর্তৃক প্রথম দিশি orchestra গঠন।

চতুর্দ্দশ দৃশ্যে—কাব্য-রচনায় প্রথম সিদ্ধি—'তিলোত্তমা', 'শর্মিষ্ঠা'।

পঞ্চদশ দৃশ্যে—স্থান—৬ নং লোয়ার চিৎপুরের বাসা। কাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। 'শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, তিলোত্তমা' লেখা শেষ হইয়াছে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, মেঘনাদ বধ' তিনখানা একসঙ্গে শুরু করা হইয়াছে। পণ্ডিতদের সাহায্যে একসঙ্গে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করা অন্যতম মুখ্য ঘটনা। অভাবের তাড়না লাগিয়াই আছে—সঙ্গে বাড়ীওয়ালার তাগাদা।

ষোড়শ দৃশ্যে—বিদ্যাসাগরের বাসা। বাড়ী বিক্রয় করিয়া এবং বিদ্যা-সাগরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবার উদ্যোগ এই দৃশ্যের মুখ্য ঘটনা। নিম্নলিখিত তথ্যও পরিবেষিত

হইয়াছে : [ক] বীরাঙ্গনা কাব্যখানি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা। [খ] মধুসূদনের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনা ও সম্পাদনা ত্যাগ [গ] গিরিশ হরিশের স্মৃতিচিহ্ন হিন্দু পেট্রিয়ট [ঘ] নীলদর্পণের অনুবাদ করায় ওপর-ওয়ালার গুঁতো খাওয়া—লং সাহেবের কীর্তি [ঙ] কালীপ্রসন্নের লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া—মহাভারতের অনুবাদ [চ] মহাভারত অনুবাদে বিদ্যাসাগরের প্রেরণা ও সহায়তা—মেরি কারপেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের উত্তরপাড়ায় যাওয়া [ছ] Hudson কর্তৃক বিদ্যাসাগরের মূর্তি অঙ্কন [জ] বিদ্যোৎসাহিনী সভার অভিনন্দন ও রূপোর মদের গেলাস উপহার দেওয়া [ঝ] চীনাবাজারের জনৈক দোকানদারের 'মেঘনাদবধ' পাঠের ঘটনা [ঞ] জগদ্বন্ধু ভদ্র লিখিত—"ছুছুন্দরী বধ" কাব্য। [ট] ভূদেবের ফরমাসে—ব্রজাঙ্গনা রচনা [ঠ] বিদ্যাসাগরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া তারাচাঁদ চক্রবর্তী আর মাধব ধরের ট্রেনিং স্কুল খোলা [ড] হীরাবুলবুল বলিয়া এক বেশ্যার ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা লইয়া কাণ্ড—রাজেন দত্ত কর্তৃক সিন্দুরে পটিতে কলেজ স্থাপন। **(পঞ্চম বিরতি)**

এই দৃশ্যে—বিদ্যাসাগরের চরিত্র দেখানোর দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এতখানি ঝোঁক অনাবশ্যক। তথ্য পরিবেষণের ঝোঁকটাই বেশী।

সপ্তদশ দৃশ্যে—উপস্থাপ্য বিষয়—ভার্সাই শহরের একটি দৃশ্যে, মধুসূদন-মনোমোহন ঘোষের আলাপে ইউরোপ প্রবাসী মধুসূদনের দুরবস্থা, অভাবের অসহ্য তাড়না—সনেট রচনার সংবাদ—বিদ্যাসাগরের অর্থ সাহায্য। **(ষষ্ঠ বিরতি)**

অষ্টাদশ দৃশ্যে—কলিকাতার স্পেনসস্ হোটেল। ব্যারিষ্টার মধুসূদন,—সর্বোপরি বন্ধুবৎসল ও উদারচেতা মধুসূদনের রূপ উপস্থাপিত। ব্যক্তিগত ও অন্যান্য তথ্য :—[ক] মধু-বিদ্যাসাগর সংবাদ—[খ] ভূদেবের নিমন্ত্রণ (গ) বিলের উৎপাত [ঘ] দ্বারকার হাইকোর্টের জষ্টিস হওয়া [ঙ] জ্যাকসন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া [চ] লিভারে ব্যথা [ছ] বিনা পয়সায় সখীসংবাদ গায়ক ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা পরিচালনা করা [জ] পাঠশালার পণ্ডিতের প্রতি মধুর শ্রদ্ধা

ভক্তি [ঝ] লণ্ডনে বই বাঁধা দেওয়ার সংবাদ [ঞ] মনোমোহনের মক্কেলের মোকদ্দমায় 'ফি' গ্রহণে আপত্তি [ট] সিংহল বিজয় রচনার আরম্ভ। [ঠ] নিজের মুনসির সঙ্গে এক সঙ্গে মদ্যপান [ড] মাসিক ভাড়া ৪০০'০০ টাকার লাউডন ষ্ট্রীটে বাসা ভাড়া করা।

ঊনবিংশ দৃশ্যে—ভূদেব-গৌরদাসের আলাপের সাহায্যে মধুসূদনের অবস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তথ্য : [ক] আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, সব দিক দিয়াই মধুর অবস্থা শোচনীয়। [খ] ঋণের দায়ে পঞ্চকোট রাজার ম্যানেজারি করিতে যাওয়া—কিছুদিন পরেই চাকরী ছাড়িয়া দেওয়া [গ] ঋণে জর্জরিত হইয়া অসুখে ভোগা [ঘ] বেনেপুকুর রোডে অবস্থান—বাড়ী ভাড়া অনেক বাকি [ঙ] উত্তর-পাড়ায় জয়কেষ্ট মুখুজ্যের লাইব্রেরীতে লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ।

বিংশ দৃশ্যে—মধুসূদনের শেষ জীবনের দুঃখ—দুর্ভোগ। পাওনাদারদের গালাগালি—নির্জলা ব্রাণ্ডি পান—অবিরাম অন্তর্দাহ এবং শেষ আঘাত অনুগ্রহের নিগ্রহ :—উত্তরপাড়ার রাজা জয়কেষ্টর আমন্ত্রণ—গোবর্ধনের অনুগ্রহ। তথ্য :—[ক] রেভারেণ্ড গোপাল মিত্তিরের গ্রীক বইখানা হারানো [খ] নিজের স্মৃতিস্তম্ভের লেখ্য কবিতাকারে লেখা।

শেষ দৃশ্যে—১৮৭৩ খৃঃ অঃ ২৯শে জুন রবিবার, বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের আবেশ—পটে মধুসূদনের মৃত্যু সংবাদ প্রতিফলিত করা হইয়াছে; মৃত্যুর পরোক্ষ উপস্থাপনা—বঙ্কিমচন্দ্রের দিবাস্বপ্নের সাহায্যে। দৃশ্যটি সাংকেতিকতাময়। মধুসূদনের যুগের পর বঙ্কিমযুগের আরম্ভ এবং মধুসূদনের কীর্তি অমর এই দুইটি বিষয় সুন্দরভাবে সংকেতিত হইয়াছে। স্বভাবো অতিরিচাতে—মনস্তত্ত্বরসিক বনফুল দিবাস্বপ্নের সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু উপস্থাপনার বাস্তবতাও খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নাটকখানি চরিত নাটক অর্থাৎ শ্রীমধুসূদন ব্যক্তিটির নানা ঘটনা উপস্থাপিত করা তথা ব্যক্তিত্বের নানা দিক এবং সমগ্র তাৎপর্য্যের রূপ দেওয়া এই নাটকের উদ্দেশ্য।

'দৃশ্য পরিকল্পনার সমালোচনা'

প্রথম দৃশ্য—সম্পর্কে বক্তব্য এই যে (ক) দৃশ্যটিতে মধুসূদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং নাটকের 'কার্য' ও (action) সূচিত হইয়াছে, কিন্তু ঘটনা সমাবেশ খুব অনবদ্য হইয়াছে, কয়েকটি কারণে সে কথা বলা যায় না। (ক) মধুসূদন—"কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন"—এই ঘটনা এবং গৌর-বঙ্কু-ভোলানাথের আগমন, দুইয়ের মধ্যে যেটুকু সময়ের ব্যবধান প্রত্যাশিত তাহা নাই। "এক্ষুনি আসবে তারা"—বলিয়া নাট্যকার সতর্ক হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না—গৌর-বঙ্কু-ভোলানাথ কলেজেরই বন্ধু। কলেজ হইতে আসিলেই এক সঙ্গে আসার কথা, বাড়ী হইতে আসিলে—"এখুনি আসবে" কি করিয়া? (খ) মধুর সহিত জাহ্নবীর সংলাপে—মধুসূদনের বাল্য-কালীন ঘটনা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যই বেশী প্রকটিত হইয়াছে। (গ) যিনি জুতার ফিতায় হাত দেন না, তিনি নিজে মদের বোতল ও গেলাস তুলিবেন কি? (ঘ) যে প্রয়োজনে মধুকে দিয়া মদের বোতল ও গেলাস তোলানো হইয়াছে, সেই প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে খাইতে যাইবার ঠিক মুখেই রাজনারায়ণ মধুর সহিত বিবাহ-সম্পর্কে কথা বলিবেন—ইহা স্বাভাবিক নহে।

চতুর্থ দৃশ্য—পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য এই যে—জাহ্নবীর অশান্ত মানসিক অবস্থায় "গুপ্ত কবির গান" যোজনা অনুচিত হইয়াছে। গান বাদ দিলে দৃশ্যটি ছোট হয় বটে, কিন্তু নাট্যকারের মান বাড়ে বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য—পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কয়েকটি কথা চরিত্র-পরিপন্থী হইয়াছে; যেমন জাহ্নবীর—"ঠিকই বলছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি"—রাজনারায়ণ চরিত্রের পরিপন্থী হইয়াছে। রাজনারায়ণের—"অবাধ্য ছেলেকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারব না"—ও আপত্তিকর।

সপ্তম দৃশ্যের গোড়ার দিকটা নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করিলে অভিনয়-কালের মাত্রা একটু কমিতে পারে।

দশম দৃশ্যের শেষাংশ খুবই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। হেনরিয়েটার ব্যাগ ভুলিয়া যাওয়া, মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পরে হেনরিয়েটার উপস্থিতি, মধুসূদনের উক্তি—Henrieta, I have lost my mother সাংকেতিকতায় পরিপূর্ণ। হেনরিয়েটা একধারে জায়া ও জননীর অভাব পূর্ণ করিবে—ইহাই সংকেতিত।

একাদশ দৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্য এই—রাজনারায়ণ মধুসূদনের চিঠি না পাওয়ায়, দুইবছর পরে হঠাৎ একদিন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা স্বাভাবিক ঘটনা নহে। দু'বছর চিঠি লেখেনি কাউকে—অথচ তিনিও কোন খোঁজ খবর করেন নাই, ইহা হইতে পারে না। এই হঠাৎ উদ্বেগ রাজনারায়ণের আবেগকে একটু খেলো করিয়া দিয়াছে। তবু রসোজ্জ্বলতার দিক দিয়া দৃশ্যটি খুবই চিত্তাকর্ষক।

দ্বাদশ দৃশ্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে হেনরিয়েটা ও মধুসূদনের আলাপ-আলোচনা দিয়া দৃশ্যটি আরম্ভ করিলে এবং কথার মধ্য দিয়া কালের গতি সংকেতিত করিতে পারিলে, কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন এবং পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ এই দুই ঘটনার মধ্যে যে কাল-ব্যবধান প্রত্যাশিত তাহা পাওয়া যাইতে পারে। 'বিরতি'র পরে থাকিলেও মনে হয়—মাতার মৃত্যুর পরে পিতার মৃত্যু অব্যবহিত ভাবেই ঘটিতেছে।

ষোড়শ দৃশ্যে নাটকের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়াও দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব এবং করা উচিত। বিদ্যাসাগরের প্রতি ভক্তি থাকায়—কথার পিঠে কথা বাড়িয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ দৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্য এই যে—ষোড়শের পরেই সপ্তদশ অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়াছে। ঘটনা যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে। লণ্ডনের একটি দৃশ্য অপেক্ষিত বলিয়া মনে হয়। অগত্যা এই দৃশ্যের গোড়াতেই লণ্ডন-জীবনের পরোক্ষ অবতারণা করা উচিত ছিল। একটি দৃশ্যে ইউরোপ-প্রবাসের (৫ বৎসর ব্যাপী) জীবন দেখাইতে গেলে, দৃশ্যটিকে একটু দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।

বিংশ দৃশ্যেই নাট্যকার মধুসূদনের ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখানেই নাটকের প্রকৃত উপসংহার করিয়াছেন। 'জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম—' বলিয়া 'শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চেয়ারে এলাইয়া' পড়া—মৃত্যুরই সংকেত বহন করিয়াছে।

শেষ দৃশ্যটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে (ক) দৃশ্যটিতে নাট্যকারের মনস্তত্ত্ব-রসিকতার ঝোঁকটি বেশী প্রকাশ পাইয়াছে (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের দিবাস্বপ্নের আবেশ-পটে মৃত্যু-সংবাদ প্রতিফলিত করিবার মধ্যে যতই নূতনত্ব বা কৌশল ফুটিয়া উঠুক, বঙ্কিমচন্দ্রের দিবাস্বপ্ন দেখিবার হেতু না থাকায় এবং মধুসূদন সশরীরে উপস্থিত হওয়ায়, ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে। এই জাতীয় রীতি, উপস্থাপনার বাস্তবিকতার গুরুত্ব কমাইয়া দেয় এবং তাহা দেয় বলিয়াই প্রশংসনীয় নহে। তবে দৃশ্যটির সাংকেতিকতা প্রশংসনীয়। মধুসূদনের যুগের পরে বঙ্কিম-যুগের আবির্ভাব এই কথাটি যেমন সংকেতিত হইয়াছে, তেমনি ঘোষিত হইয়াছে—"মধুসূদন মরেনি"—মরতে পারে না—"অসম্ভব"—এই বক্তব্যটি। এ সব সত্ত্বেও দৃশ্যটির অবাস্তবতা অমার্জনীয়।

[রস-বিচার]

জাতি-পরিচয় নির্ধারণ করিবার কালে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে "শ্রীমধুসূদন" ট্র্যাজেডি রসাত্মক একখানি চরিত-নাটক, অর্থাৎ নাটকখানির "অঙ্গী"-রস **বিশেষ জাতীয় করুণ রস**—আমাদের নূতন পরিভাষা অনুসারে—**'ট্র্যাজেডি-রস'**। সুতরাং রসবিচারে আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য—ট্র্যাজেডি-রসের নিষ্পত্তি বা অভিব্যক্তি যথেষ্ট মাত্রায় হইয়াছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনা করা। এই আলোচনা করিতে গেলে, যেহেতু রসনিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগ আবশ্যক এবং সংযোগের সৌষ্ঠবের উপর রসের প্রকৃতি নির্ভর করে, বিভাব-অনুভাবাদির প্রকৃতির এবং সংযোগেরই বিচার করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই বিচার ট্র্যাজেডির আলম্বন-বিভাব অর্থাৎ নায়ক হিসাবে শ্রীমধুসূদনের ব্যক্তিগত

যোগ্যতা আছে কি না, তাঁহার আচরণ ও অবস্থা, জীবনের সংগ্রাম ও পরিণতি ট্র্যাজেডি-সংবিদ (tragic impression) জাগাইতে সমর্থ কি না—এই সব প্রশ্নেরই মীমাংসা।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার হিসাব লইতে গেলে দেখা যায়—শ্রীমধুসূদন বিশিষ্ট ধনী ও মানী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র—ঐশ্বর্যের কোলে লালিত-পালিত রাজার দুলাল, হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র—মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের অশেষ গুণে গুণী—দুর্লভ কবি-প্রতিভার অধিকারী। শুধু বংশেই অভিজাত নহে, গুণেও। আসলে মধুসূদন এমন একজন লোক যিনি 'ধনে-মানে-গুণে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন' বিশেষতঃ শ্রীমধুসূদন বাঙালী হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছেন।

তবে মধুর সবটুকুই যে মধুময়—মধু যে 'too good' তাহা নহে। মধুর মধ্যে 'নিম'ও কিছু মিশ্রিত আছে। মধু বড় প্রবৃত্তি-প্রবল, অমিতচারী ; অনাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধুর সবই একটু অমিত। জ্ঞান অনুভব—ইচ্ছা, তাঁহার ব্যক্তিত্বে সব বৃত্তিরই যেন অমিত স্ফূর্তি। জ্ঞানস্পৃহা অমিত, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা বা আবেগপ্রবণতা এবং ভাবালুতা অমিত, ইচ্ছার (will) একাগ্রতা ও দৃঢ়তাও অমিত। আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা অভ্রভেদী উচ্চাশা হইয়া উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত, ভোগবাসনা সহস্রবাহুতে চেষ্টিত—সর্বভুকের সহস্রজিহ্বায় লেলিহান। বৃত্তির সামঞ্জস্য নাই। মধুসূদনের মধুর ব্যক্তিত্বের গোড়াতেই এই মারাত্মক গলদ এবং সেই গলদ এখানেই **অমিত বাসনার** মধ্যেই। মধুসূদন অতিশয় 'self-willed', বড় স্বেচ্ছাচারী, বড় অমিতাচারী। তাঁহার জীবনে যত দুঃখ দুর্ভোগ আসিয়াছে, যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে·· সকলেরই মূলে আছে এই প্রবৃত্তি-অসমঞ্জস অহং (ego)।

অমিত-ভোগী মধুসূদন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্ররোচনায় এমন একটি কাজ করিয়া বসেন যাহা তাঁহার সমস্ত স্বস্তির মূলে কুঠারাঘাত করে—যাহাকে আমরা ভুল পদক্ষেপ বা বিচার, error of judgment, বলিয়া মনে করিতে পারি। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাই ভুল পদক্ষেপ। জগৎ-জোড়া কবি-খ্যাতি এবং মনোমত,

দেহে-মনে-সুন্দরী পত্নী লাভ করিবার লোভে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মের অগ্নি সাগরে ঝাঁপ দেন কিন্তু 'সকলই গরল ভেল'। যে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ কল্পনা করিয়া মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, নিজের চরিত্রদোষে এবং অনেকটা খ্রীষ্টান পাদ্রিদের এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বিরূপ আচরণে, প্রতিশ্রুতিভঙ্গে, তাহার কোনটিরই পূরণ হয় না। এই আশা-বিপর্যয়ের বেদনা বিক্ষোভের মধ্যেই মধুসূদনের জীবনের ট্র্যাজেডির প্রারম্ভ।

মধুসূদন আশার ছলনায়, অতুল ঐশ্বর্যের সমস্ত উপচার দূরে ঠেলিয়া দিয়া, পিতামাতার স্নেহ-শীতল আদর আলিঙ্গন উপেক্ষা করিয়া, অভাব-তপ্ত, সংগ্রাম-কঙ্কর এবং অনাত্মীয়-নিঃসঙ্গ মরুপথের পথিক হন। একূল ছাড়েন কিন্তু ওকূলে পৌঁছিতে পারেন না—অকূলে ভাসিয়া বেড়ানই সার হয়। কিন্তু একূল ছাড়িলেও একূলের মায়া তো কাটাইতে পারেন না—মায়ের স্মৃতি বার বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—ব্যথা হইয়া বাজে, বিসর্জনের বাজনা শুনিয়া চোখে জল আসে, রাত্রে ঘুম নাই—মনে শান্তি নাই। এপারে ফিরিয়া আসিবেন সে উপায়ও নাই—স্বভাব বিবাদী। শুধু আশাই যে বিপর্যস্ত তাহা নহে, মধুসূদন অন্তর্দাহেও দগ্ধ হইতে থাকেন। প্রথম দৃশ্য হইতে নবম দৃশ্য পর্যন্ত, নাট্যকার মধুসূদনের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতির রূপকে এই অবধিই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্যে মধুসূদনের চারিত্রিক প্রবণতাগুলি এই দৃশ্যের শেষাংশে ভুল পদক্ষেপের সূচনা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে ভুল পথে পদক্ষেপ—মধুর গৃহত্যাগ। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যেও দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়া, দেখানো হইয়াছে। পঞ্চম দৃশ্যে বাহ্য গতিবেগ ঠিকই আছে, কিন্তু এখানেই অন্তর্দাহের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। গৌর মায়ের কথা বলিতেই মধু বলে—Do you know she haunts me; ষষ্ঠ দৃশ্যে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত মধু প্রায়শ্চিত্ত করিতে—ভুল সংশোধন করিতে, মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিতে অসম্মত—ভুল আঁকড়াইয়া থাকিতেই প্রস্তুত। সপ্তম দৃশ্যে—ভুলের ফসল ফলিতে আরম্ভ করে। গৌরের কাছে মনের অবস্থা যাহা ব্যক্ত

করেন তাহাতে দেখা যায় পাদ্রি 'rascals'দের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ, কারণ বিলেত নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে—'They are very cold' বড বড় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসা ছাড়া খ্রীষ্টান হইয়া বিশেষ কোন লাভ হয় নাই, লাভের মধ্যে কোন শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না। প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া হিন্দু হওয়া সম্ভব হইলে হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতে প্রস্তুত কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নহে। মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদে—গৌরকে অনুরোধ করেন, "তুই মাকে একটু দেখিস ভাই, বুঝিয়ে বলিস, যাস মাঝে মাঝে, বুঝলি ?" অষ্টম দৃশ্যে—মায়ের ব্যথায় ব্যথিত মধুসূদনের ব্যথা-কাতর রূপটি এবং পিতার, ক্ষুব্ধ-বাৎসল্যের অভিমান-নিষ্ঠুর আঘাতে মর্মাহত মধুসূদনের অন্তর্দাহ অর্থাৎ suffering-এর রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। নবম দৃশ্যে—আশাভঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেবকীকে 'Thoughtless and penniless young man'এর সহিত বিবাহ দিতে কৃষ্ণমোহন অসম্মত হইয়াছেন—মধুসূদন যে দুইটি আশায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, দুইটিই বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

ইহার পরেই দশম দৃশ্যে মাদ্রাজপ্রবাসের জীবন—আশাহত মধুসূদনের শান্তি-হীন শ্রান্তির জীবন। জীবিকার্জনের জন্য কঠোর সংগ্রামের জীবন। 'tight corner'-এ আবদ্ধ অভাব-পীড়িত জীবন। এখানে মধুসূদনের ট্র্যাজেডির যে রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা এই যে রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র—রাজার দুলাল—স্বভাব-দোষে অভাবের তাড়নায় অস্থির। ঋণ করিয়া সংসার চালান। তবে অনুভাবের ক্রিয়া তেমন তীব্রভাবে দেখানো হয় নাই। আর একটা কথা। এই দৃশ্যেই মাতৃ-বিয়োগের আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু এই আঘাতকে ট্র্যাজেডি-রসোদ্দীপক করিয়া তুলিবার জন্য যে আয়োজন আবশ্যক তাহা করা হয় নাই। অতীত সুখস্মৃতির চর্বনা দ্বারা অন্তর্দাহ দেখাইতে পারিলে মায়ের স্মৃতিকে সক্রিয় রাখিলে, ট্র্যাজেডি-রসের সংবেদনা বেশ জোরালো হইত।

একাদশ দৃশ্যে—মধুসূদন মাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া পিতার কাছে গিয়াছেন নিঃসঙ্গ পিতাকে সমবেদনা জানাইতে, নিজের কাছে লইয়া যাইতে,

কিন্তু পিতার মুখের মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এখানে এই suffering-এর মধ্যেই ট্র্যাজেডির ধারা রক্ষা করা হইয়াছে।

দ্বাদশ দৃশ্যে—মধুসূদনের বুকে পিতৃবিয়োগের আঘাত বাজিয়াছে। কিন্তু এখানেও আঘাত নিছক আঘাত মাত্রই—ট্র্যাজেডি সংবিদের পরিপোষক হয় নাই। রেবেকার কন্যা দ্বারা মধুসূদনের জীবনের নূতন ক্ষত ও দাহ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বপ্রস্তুতির অভাবে চেষ্টা খুব সফল হয় নাই। ত্রয়োদশ দৃশ্য হইতে ষোড়শ দৃশ্য অবধি—মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা আগমন (১৮৫৩) এবং ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ড গমন (১৮৬২) পর্যন্ত, মধুসূদনের কবি-সত্তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাল। এই পর্বে মূল রসের ধারা অক্ষুন্ন রাখা খুবই কঠিন কাজ। বাহিরের কীর্তি-খ্যাতির সমান্তরালে, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্দাহ বা দুঃখ-দুর্দশার রূপ উপযুক্ত পরিমাণে উপস্থাপিত করিতে না পারিলে রসের ধারা স্তিমিত ও বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য। চরিত্রের দিকে অধিকতর ঝোঁক পড়ায় রসের ধারাটি এখানে একটু স্তিমিত বা আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাই বলিয়া নাট্যকার রস-সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন তাহা নহে। মধুসূদনের আর্থিক দুর্যোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা না করিয়াছেন এমন নহে। ত্রয়োদশ দৃশ্যে গৌরদাসের মুখে জানাইয়াছেন—আর সব খবর অতিশয় শোচনীয়। "বাবা মারা গেছেন, বিষয়সম্পত্তি বেদখল, পকেটে একটি পয়সা নেই মাথা গোঁজবার জায়গা নেই"—একশো কুড়ি টাকার মাইনের কথা শুনিয়া মধুসূদন বলিয়াছেন—"It won't keep me in ডাল-ভাত even ;" এই পর্যন্তই। রসোদ্দীপক উদ্দীপন বিভাব বা অনুভাব কিছু নাই। তথ্য সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের পীড়িত অন্তরের রূপটি দেখানো উচিত ছিল। চতুর্দশ দৃশ্য সম্পর্কেও একই কথা, রস হইতে 'বস্তু' অতি দূরবর্তী। পঞ্চদশ দৃশ্যে—"অর্থাভাব ছাড়া কোন অভাব নাই" দেখাইবার চেষ্টা আছে—পাওনাদারদের নির্বাক বা সবাক তাড়নাও অল্পস্বল্প দেখানো হইয়াছে, কিন্তু মুখ্য রস ব্যক্ত হইতে পারে নাই।

ষোড়শ দৃশ্যে—অভাবগ্রস্ত মধুসূদনের দৈন্য—"রাজকীয় necessity"—সাধ্যের

বৈষম্য, আভাষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথ্য-পরিবেষণের প্রবণতাই প্রবল, রসধারা অতি ক্ষীণ—বিচ্ছিন্ন বলাও চলে।

সপ্তদশ দৃশ্যে—ভার্সাই শহরে মধুসূদনের অভাবের তাড়না চরমে পৌঁছিয়াছে। চারদিকে কেবল ধার আর ধার, শোধ করতে না পারলে ফ্রেঞ্চ জেল অনিবার্য। Gray's Inn হইতে 'সাসপেণ্ডেড'। পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির। কড়ানাড়ার শব্দে ভীতত্রস্ত অসহায় মধুসূদনের আত্মরক্ষার করুণ সংগ্রাম। মধুসূদনের দুর্দশা সুন্দরভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কৈশোরের স্বপ্নবিভোর জীবনের সহিত বর্তমান জীবনের বৈষম্যকে বেদনা-বিক্ষোভের বা ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারিলে রস-সংবেদনার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাইত।

অষ্টাদশ দৃশ্যে কলিকাতার স্পেন্সেস্ হোটেলে ব্যারিষ্টার মধুসূদনের সুসজ্জিত ড্রইংরুম, এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের অমিতাচার এবং নিত্যসঙ্গী অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। পাওনাদারদের তাগাদা এড়াইবার জন্য মধুসূদন পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখানেও নাট্যকারের চরিত্র-চেতনা রস-চেতনা অপেক্ষা প্রবল।

উনবিংশ দৃশ্যে পরোক্ষভাবে ভূদেব-গৌরদাসের কথোপকথন দ্বারা অমিতাচারী মধুসূদনের "আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, সব দিক দিয়ে শোচনীয় অবস্থা", মধুসূদনের দেহ-মনের যন্ত্রণার terrible suffering-এর রূপটি ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং পূর্ণমাত্রায়ই তাহা করা হইয়াছে। নাট্যকার উদ্দীপন-বিভাব পরিস্থিতি এবং অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের—জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ার দুইমাস আগের ঘটনা। নানাবিধ ব্যাধিতে মধুসূদন আক্রান্ত। গলায় ঘা, পেটে জল, পিলে-লিভার, সঙ্গে রক্তবমি। কত কথাই মধুসূদনের মনে হয়! অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। মনে পড়ে সাগরদাঁড়িকে, যে বটগাছটার তলায় বসিয়া ছেলেবেলায় রামায়ণ পড়িতেন সেই বটগাছটিকে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—প্রাণরসে টলমল উহার সতেজ শ্যামল পাতাগুলি আর

তাহারই সঙ্গে নিজের নিঃশেষিতপ্রায় শুকিয়ে যাওয়া জীবনকে—মর্মভাঙ্গা আর্তনাদ জাগে—সব ঠিক আছে—আমি ফুরিয়ে গেলাম। An end so quickly." বিষাদবিধুর নির্বেদে মধুসূদন পরিপূর্ণ। আর ভাবিবেন না, যতই মনে করেন—ভাবনার হাত এড়াইতে পারেন না—This brain is a terrible machine!

মনে হয় সংগ্রাম তো জীবনে তিনি কম করেন নাই, বিলাত গিয়াছেন, ব্যারিষ্টার হইয়াছেন, হাইকোর্টে চাকরি লইয়াছেন, আবার ব্যারিষ্টারি করিয়াছেন, পঞ্চকোটে চাকরি লইয়া গিয়াছেন—আবার ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। কিন্তু সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। হেনরিয়েটার 'সব ঠিক হয়ে যাবে আবার'—সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহার হাসি আসে; তবু জীবনের হিসাব নিকাশ ফুরাইতে চাহে না। হেনরিয়েটার জন্য তাঁহার দুঃখ হয় কিন্তু নিজের দুঃখে কাঁদিবার অবসরটুকু পর্যন্ত তাঁহার ভাগ্যে নাই। বিল লইয়া পাওনাদাররা হানা দেয়—গালাগালি দেয়। অপমানে অপমানে মধুসূদন জর্জরিত হন—উত্তেজিত হইয়া পাওনাদারদের সম্মুখে যাইতে চাহেন এবং তাহাদের বলিতে চাহেন—'এক কপর্দকও আমার কাছে আর নেই—তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও, মেরে ফেল—অপমান আর করো না—আর সহ্য করতে পারি না আমি।"

অসহায় মধুসূদন, ব্যাধিজর্জরিত বেদনা-কাতর মধুসূদন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকেন। যখন মুখ তুলেন অদ্ভুত সঞ্চারিভাব মুখে বিচিত্র হাসি, করুণতম অসহায় হাসি, আত্ম-ধিক্কারের করুণ আর্তনাদের হাস্যময় রূপ। সহসা ভাবান্তর ঘটে। মধুসূদন রুক্ষ হইয়া উঠেন। ব্র্যাণ্ডির বোতল এবং দান্তের ইনফারনো (নরক) দিতে হেনরিয়েটাকে আদেশ করেন। হেনরিয়েটা ভয়ে ভয়ে তাঁহার আদেশ পালন করেন এবং গহনা কাপড় আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ শুনিয়া মধুসূদন বিরক্ত, মিনতি করিয়া হেনরিয়েটাকে চলিয়া যাইতে বলেন। মধুসূদন সোডার অভাবে নির্জলা ব্রাণ্ডি পান করেন এবং ইনফার্নো খানা খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে থাকেন। নির্জলা ব্রাণ্ডি এবং ইনফার্নো তাঁহার আর্থিক ও আত্মিক উভয় দৈন্যকেই সংকেতিত করে।

ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত যে কথোপকথন তাহা আরও করুণ রসাত্মক। মনোমোহন প্রবেশ করিতেই মধু বলিয়া উঠেন—I hope you have not come to remind me of my debts! বিদ্যাসাগর, উমেশ আর স্বর্ণময়ীর ঋণ শোধ করিতে না পারায় তাঁহার লজ্জা ক্ষোভের অন্ত থাকে না। নির্জলা ব্রাণ্ডি খাইয়াই যেন আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। গলায় ছুরি বসাইয়া না মরিয়া ব্রাণ্ডি খাইতেছেন—জানেন "this is a process equally sure but less painful." "সব ঠিক হয়ে যাবে"—সান্ত্বনা বাক্যের অর্থ বুঝিতে তাঁহার বাকী নাই। সে সব যে কত বড় nonsense তাহা তিনি জানেন। মরিতে তিনি চাহেন না—সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহেন না, কিন্তু যাইতে হইবেই—"The fact is there is no way out of it." দুর্বহ জীবনের ভার বহিয়া, দশের কৃপাপাত্র হইয়া কোন রকমে টিকিয়া থাকার চেয়ে—অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই ভাল।

কাব্য, যশ, টাকা··· সবই মরীচিকা মনে হয়। এই সমস্ত চাওয়ার পিছনে ছিল সুখে থাকিবার কামনা। নিজেই স্বীকার করেন—"আমি তো টাকা চাইনি আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম।" কিন্তু কোথায় সে সুখ? "এ জীবনে তা আর হলো না—কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল"

আঘাতের পর আঘাত—চরম আঘাত আসে অনুগ্রহের রূপ ধরিয়া—সকলেই মধুসূদন দত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতেছে! এই জ্বালাই আরো অসহ্য। উত্তরপাড়ার জয়কেষ্ট মুকুজ্যের সাদর আহ্বান বা অনুগ্রহ—তবুও যদিবা সহ্য করা যায়—পাওনাদার গোবর্দ্ধনের অনুগ্রহের চেয়ে অসহ্য নিগ্রহ আর কি হইতে পারে? শেষ আর্তনাদ শোনা যায়—Out, out brief candle"। মধুসূদনের মৃত্যু সম্পূর্ণ।

মধুসূদন—নিজের কবর নিজেই খুঁড়িয়াছেন—তাই স্মৃতিস্তম্ভের লেখাটুকুও নিজেই লিখিয়া রাখিয়াছেন—সেই লেখাটি আবৃত্তি করিতে করিতে চেয়ারে *এলাইয়া পড়েন।*

বাকী শুধু মৃত্যু সংবাদ। শেষ দৃশ্যে শুধু সেই সংবাদটি জানাইয়া দেওয়া

হইয়াছে। যে ভদ্রলোক সংবাদ দিয়াছেন—তাঁহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং আমাদের হৃদয়—**কত বড় একজন কবি—কি কষ্টেই যে মারা গেছেন, শুনলে চোখের জল রাখা যায় না।** এই দৃশ্যটিতে নাটকের এবং রসের ও উপসংহার ঘটিয়াছে। কিন্তু যে ভাবের "নির্ব্বহনেহদ্ভুতম্—থাকিলে চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পায় সেইরূপ চমৎকারিত্ব এখানে নাই। বিংশ দৃশ্যে রসের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহার তীব্রতা এখানে কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। যাহা হউক, রসের অভিব্যক্তি সমধারায় না হইলেও অর্থাৎ দুই একটি দৃশ্যে ধারা স্তিমিত বা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও সাকল্যে যে ট্র্যাজেডিরস নিষ্পন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য রসের মধ্যে—উল্লেখযোগ্য জাহ্নবী ও রাজনারায়ণের বাৎসল্য, হেনরিয়েটার পতিভক্তি, বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব বা দানবীরত্ব এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন-আশ্রয়ী কৌতুকরস ও বঙ্কুবিহারী প্রভৃতি আশ্রয়ী হাস্যরস। **জাহ্নবীর** বাৎসল্য অভিমানহীন সহজ ও কোমল। তাঁহার কাছে সব কিছুর ঊর্দ্ধে পুত্রের মঙ্গল। পুত্র-বিচ্ছেদের আঘাতে, মায়ের প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়—এক মাত্র সন্তান জননীর, আকুল আগ্রহে সন্তানকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে চাহেন। তাহার মধ্যে পুত্রের প্রতি অভিমান নাই, ভর্ৎসনা নাই, রুক্ষ আচরণ নাই, শুধু আছে বুকভরা স্নেহ আর আঘাতের বেদনায় তিলে তিলে ক্ষয়। **রাজনারায়ণ** পিতা—পুরুষের মত পুরুষ—অভিমানী পুরুষ। তাহার স্নেহ বাধা পাইয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। বঞ্চনার আঘাতকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করে নাই, যত আহত হইয়াছে তত নিষ্ঠুরের মত আঘাত করিয়াছে। রাজনারায়ণ চরিত্রে, অভিমানের পাত্রে স্নেহ পরিবেষণ করা হইয়াছে এবং করুণাবাৎসল্যের সুন্দর আলম্বন সৃষ্টি করা হইয়াছে। বাৎসল্যের বিগলিত রূপটি দেখা যায়—জাহ্নবী চরিত্রে আর এখানে দেখা যায় অভিমান-রুক্ষ, শুষ্ক বাৎসল্যের করুণ রূপটি। **অষ্টম দৃশ্যে ও একাদশ দৃশ্যে** *এই রূপটিই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভিমান ও বাৎসল্যের দ্বন্দ্বে* রাজনারায়ণ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। (মধুসূদনেরও সমান অবস্থা)। [অষ্টম

দৃশ্যের শেষাংশ—৬৮-৭০ পৃষ্ঠা, এবং একাদশের শেষাংশ—৯৪ ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]
হেনরিয়েটার মধ্যে সেই সর্বংসহা একান্তব্রতা সতী সাধ্বী পতি-পরায়ণা নারীর সনাতন মূর্তি প্রকাশিত। রেবেকা-চরিত্রে ইহারই বিপরীত কোটি প্রদর্শিত। হেনরিয়েটা স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী—স্বামীর মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া সে চরিতার্থ।

নাটকে লঘু রস অর্থাৎ হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে মোটামুটিভাবে মধুসূদনের বন্ধুবান্ধবদের রহস্যালাপের দ্বারা। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক চরিত্রের উগ্র হিন্দুসংস্কার এবং সংলাপ দ্বারা, কিছুটা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাট্যবার্তিক দ্বারা, কিছুটা জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কমলমণি এবং দেবকীর সহিত কৌতুকালাপের দ্বারা। প্রথম দৃশ্যে—গৌরদাসের বচন, বিশেষতঃ বঙ্কবিহারীর বচন, বাচন ভঙ্গী এবং আচরণ বেশ হাস্যোদ্দীপক। বৈষ্ণবের ছেলে গৌরদাসের রোজ রোজ মাংস খাওয়া সত্ত্বেও জাত বাঁচাইবার মৌখিক প্রচেষ্টা এবং বঙ্কবিহারীর —কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে "With your permission মধু" বলিয়া গ্লাসের পর গ্লাস খালি করা এবং মদ খাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়,—সহাস্যে 'Don't fear—I am Banku Bihari দু'এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না'—বলা, চমৎকার উদ্দীপক। দ্বিতীয় দৃশ্যে—বৈষ্ণব রাজকৃষ্ণ বসাকের—পাদ্রি আক্রোশ এবং ব্রাহ্ম-বিরাগ—এক কথায় হিন্দুধর্মকে তথা জাত বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা—বাচনিক প্রতিরোধ—রক্ষণশীলতার নিদর্শন বলিয়াই হাস্যকর হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে—বঙ্কু, ভোলানাথ হাস্যরসের অবলম্বন হইয়াছে। বঙ্কুই অবশ্য প্রধান। মদ, মাংস-নিষ্ঠায় চরিত্রটির মজ্জা গঠিত। চাল-চলনে ও বচনে বঙ্কু বেশ রাশভারী। বঙ্কু যত গম্ভীর তত হাস্যোদ্দীপক।

সপ্তম দৃশ্যে—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের শিক্ষিত-পটু শ্লিষ্ট এবং কৌতুককর-বচন, পরিহাসরসের চমৎকার উদ্দীপক। নবম দৃশ্যেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন রসিক প্রকৃতিতেই প্রকাশিত। দশম দৃশ্যে—মধুসূদন এবং নটবর ঘোষের উক্তির প্রত্যুত্তরে মধুসূদনের উক্তি হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত :—নটবরের—"মিষ্টার দত্ত বাড়িতেই

আছেন দেখছি।"—এই কথার উত্তরে মধুসূদন হাসিয়া বলিয়াছেন—"Can't help it"—মধুসূদন না হাসিলেও—উক্ত পরিস্থিতিতে—Cant help it শুনিয়া সকলেই হাসিবেন।.

ত্রয়োদশ দৃশ্যে—যতীন্দ্রমোহনের কয়েকটি উক্তি—বিশেষতঃ Fixity of purpose (নাট্য-বার্তিক ?) এবং তাহাতে বার বার বাধা হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে এবং পঞ্চদশ দৃশ্যের শেষাংশে—পণ্ডিতদের আচরণেও সামান্য একটু আভাস আছে। অষ্টাদশ দৃশ্যে—নিম্নলিখিত অংশটুকু উল্লেখযোগ্য।

[গৌরদাস। মদটা একটু কমানো দরকার এবার, লিভারে ব্যথা হয়েছে।

মধু। (স্মিত মুখে এক চুমুক পান করিয়া) হরিশ মরেই গেল !

ভোলানাথ। হরিশের যে মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

মধু। (বেশ বড়গোছের একটা চুমুক দিয়া) হ্যাঁ মাত্রাজ্ঞান থাকাটা দরকার—বিশেষতঃ গৌরের—দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, কচি বউ।]

কথা ও কাজের অসঙ্গতি দ্বারা চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে।

চরিত্র সমালোচনা

শ্রীমধুসূদন নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা—বহু। পুরুষের সংখ্যা—ছোট বড় মিলাইয়া—চৌত্রিশ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা—এগার—মোট (৩৭+৮) পঁয়তাল্লিশ। এই হিসাব দাখিল করায় কেহ যেন মনে না করেন যে অধিক সংখ্যক পাত্র-পাত্রী উপস্থাপিত করাতেই চরিত্র স্রষ্টার বড় কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে ইহাই আমি বলিতে চাই। স্রষ্টার কৃতিত্ব—ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করায়। এই আরোপের মাত্রার উপরেই ব্যক্তির আকর্ষণ—শক্তি বা প্রাণবত্তা নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্যক্তি যে পরিমাণে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, সেই পরিমাণে উহা দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—দর্শকের কৌতূহল জাগ্রত রাখিতে পারে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রধান চরিত্র দুইটি—মধুসূদন এবং মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত। পারিপার্শ্বিক চরিত্রের মধ্যে মধুসূদনের সহপাঠিগণ, বিশেষতঃ গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কুবিহারী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, নটবর ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **গৌরদাস** চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য,—বন্ধু বাৎসল্য। তাহা ছাড়া তাঁহার নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। **ভূদেব** ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য লইয়া যথাসম্ভব সুব্যক্ত। **বঙ্কুবিহারী** উপস্থিতির সঙ্গেই আপন ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত করিতে সমর্থ। (বঙ্কুবিহারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আগেই আলোচিত হইয়াছে)। **কৃষ্ণমোহনের** চরিত্র খুব পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হয় নাই; ভিন্নকার মানুষটির তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। **জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর** রসিক চরিত্র, সুতরাং সহজেই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। **ঈশ্বরচন্দ্রের** দয়ার সাগর এবং একাধারে করুণা-কোমল এবং সঙ্কল্প-দৃঢ় রূপটিকে রেখারূপের আকারে আঁকা হইয়াছে। **যতীন্দ্রমোহনের** ব্যক্তিত্ব, সুপরিস্ফুট না হইলেও অলক্ষ্য নহে—নাট্যগত প্রাণ, সাহিত্য-রসিক যতীন্দ্রমোহন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। মাদ্রাজ প্রবাসী বাঙালী **নটবর ঘোষ** মহাশয়ের হাবভাবেও বৈশিষ্ট্য আছে। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে—জাহ্নবী

ও হেনরিয়েটাই প্রধান ; রেবেকা, দেবকী প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্র অপরিস্ফুট।—বিশেষতঃ রেবেকা ও দেবকী বেশ একটু উপেক্ষিতাই বটে।

প্রধান প্রধান চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকার কতখানি দক্ষতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন—চরিত্রগুলি সম্যক বিশ্লেষণ না করিয়া তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। নায়ক-চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথা আগেই বলা হইয়াছে। শ্রীমধুসূদনের চরিত্রে—প্রধান প্রধান প্রবণতা কি এবং সেই সকল প্রবণতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, কি ভাবে তাহার জীবন শোচনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে চরিত্রটিকে আরো একটু বিশ্লেষণ করা হইতেছে। নাট্যকার নাটকের প্রধান দৃশ্যেই মধুসূদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।—ক্রমানুসারে এবং তালিকাকারে সেইগুলি নিম্নলিখিতভাবে সাজাইয়া দেওয়া যাক।

১। আলালের ঘরের দুলাল—নিজের হাতে জুতোর ফিতেটা পর্যন্ত খোলেন না।

২। মধুসূদন পোষাক-পরিচ্ছদ বিলাসী—

৩। বন্ধু-বৎসল [বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানোতে, জিনিসপত্তর দেওয়ায় আনন্দ]

৪। ইংরেজের মেয়ে বিবাহ করিবার প্রবল বাসনা—[দেবকীও মনের মতো]

৫। ভারতীয় সংস্কৃতির ও বাংলা-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা—[শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক]

৬। হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—['genius']

৭। ভীষণ একগুঁয়ে—['rebel']

৮। খুব মডার্ণ—[মা-বাপের জ্ঞাতসারেই তামাক ও মদ খান]

৯। কবি প্রতিভার অধিকারী [already a Pope]

১০। প্রবলতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা—['মহাকবি হব'—]

১১। ইংলণ্ড যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল

১২। মাতৃভক্ত— [I love my mother in my own way and no less]

১৩। অসহিষ্ণু।

পারিবারিক প্রশ্রয়ে মধুসূদনের স্বভাবে যে যে প্রবণতা প্রকাশ পায় তাহাদের মধ্যে—পরিচ্ছদ বিলাসিতা অন্যতম এবং এই **পোষাক-পরিচ্ছদ বিলাস**—মধুসূদনের শেষ অবধি ছিল। তিনটি চারটি পোষাক লইয়া তিনি কলেজে যাইতেন এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক বদলাইতেন। রাজনারায়ণ (৮ম দৃশ্যে) উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ তুলিলে মধুসূদনকে বলিতে দেখা যায়—"পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে হয়ত আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, I prefer to be clad like a gentleman. I spent a penny too much perhaps on dress." অতি অভাবের মধ্যেও দামী পোষাকের অর্ডার দিতে তাঁহার কুণ্ঠা আসে নাই। বাড়ী ভাড়া বাকী, পণ্ডিতদের দেয় টাকা তিন মাস বাকী, তবু হেনরিয়েটার জন্য সুদৃশ্য ও দামী গাউন বানাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ব্যাধি-জর্জরিত অবস্থায় জীবনের হিসাব নিকাশ করিতে করিতে, শর্মিষ্ঠার প্রসঙ্গ আসিতেই **সহসা** তাহার মনে পড়ে—স্বর্ণময়ীর দেওয়া—দামী গাউনটার কথা—"মহারাণী স্বর্ণময়ী কি সুন্দর গাউনটা দিয়ে ছিলেন শর্মিষ্ঠাকে—It was lovely"—এই পরিচ্ছদ-বিলাস তাঁহার ঋণের বোঝা ভারীই করিয়াছিল। পিতামাতার অত্যধিক স্নেহের ফলেই এই বিলাসিতার জন্ম।

পারিবারিক প্রশ্রয়ের দ্বিতীয় কুফল—**মদ্যপানাসক্তি**। পিতার অনুচিত প্রশ্রয়ে, মধুসূদন পিতার সম্মুখেই তামাক খাইতেন এবং জ্ঞাতসারেই মদ্যপান করিতেন। মডার্ণ অর্থাৎ সাহেব বানাইবার অভিলাষ এবং মডার্ণ বা সাহেব বনিবার চেষ্টা—দুই ইচ্ছা মিলিবার ফলে, মধু আঠারো বৎসর বয়সেই—নেশাগ্রস্ত। এই নেশার খরচ তাঁহার "রাজকীয় necessity"র অনেকখানি দখল করিয়াছিল এবং নেশার চাহিদা মিটাইতে গিয়াই তাঁহাকে অকালে প্রাণ দিতে হইয়াছিল—অত শোচনীয়ভাবে শেষ বিদায় লইতে হইয়াছিল। অমিতা-

চারের খেসারৎ দিতে দিতেই মধুসূদন দেহে-মনে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। মদ খাওয়াকে 'মডার্ণিজমের' সহিত এক করিয়া দেখাতেই এই বিপত্তি ঘটিয়াছিল।

পারিবারিক প্রশ্রয়ের আর একটি কুফল—অত্যুগ্র-অস্মিতা—**একগুঁয়ে স্বভাব**। এই স্বভাবেরই ক্রমপরিণতি—বাধা-অসহিষ্ণুতা—বিদ্রোহিতা। তাঁহার কোন আবদারই অপূর্ণ থাকে নাই, ফলে প্রবৃত্তির অনুশীলন যে পরিমাণে হইয়াছিল নিবৃত্তির অনুশীলন সে পরিমাণে হয় নাই।

প্রবৃত্তিই তাঁহার একমাত্র পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। যেখানেই অস্মিতা বাধা পাইয়াছিল সেখানেই মধুসূদন অসহিষ্ণু হইয়া বাধার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিবাহে বাধা পাইতেই—"Coercion! By Gosh!" বলিয়া মধু বিদ্রোহ করিয়াছিলেন—খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্মিতার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের দরজা দিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে চাহেন নাই, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষের মুখের উপর বলিতে পারিয়াছিলেন—"either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on our national dress, I wont be treated shabbily. I don't care for the rules of this Bishop's College". মদ দেওয়ার ব্যাপারে কালো-চামড়া সাদা-চামড়ার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করায়—খাবার টেবিলে গ্লাস চুরমার করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁহাকে "উচ্ছৃঙ্খল মাতাল" বলিলে (৯ম দৃশ্য)—মধুসূদন হবু হবু শ্বশুর মহাশয়ের মুখের উপর বলিয়াছিলেন—"Is it not a fact that you yourself drank, ate beef, and were turned out of your own home" এবং "জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না"—এই প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—"I am too green a Christian yet to make such a false promise"। এই অস্মিতাই বারবার মধুর স্বস্তি কাড়িয়া লইয়াছিল বটে তবে মধুকে যেমন ইহা উদ্ধত তেমনি অকপটও করিয়া তুলিয়াছিল। এই

'rebel' বা 'revolutionary in him' মধুর ট্র্যাজেডির জন্য—নাটকেরও বটে—অনেকখানি দায়ী।

কিন্তু মধুসূদনের ভোগবাসনা এবং আত্মাভিমান ও মেজাজ যত প্রবলই থাকুক, মধুসূদনের হৃদয় ছিল স্পর্শকাতর। "you have enough of sentiments no doubt" গৌরদাসের এই কথাই সত্য। মধুসূদনও স্বীকার করিয়াছেন My sentiments are my principles। এই সেন্টিমেন্টের এক ধারা—বন্ধুবাৎসল্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এক ধারা—মাতৃ-অনুরাগের রূপ লইয়াছে, একধারা—মহাকবি হওয়ার passion বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার (ambition) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মধুসূদনের হৃদয় ছিল যেমন স্পর্শকাতর তেমনি মস্তিষ্ক ছিল কল্পনাপ্রবণ। "private feelings"এর হাত এড়াইবেন তিনি কি করিয়া? কল্পনার চোখের সম্মুখে মায়ের করুণ মূর্তি বার বার আসিয়া হানা দিয়াছিল। গৌরদাসের কাছে মধু স্বীকার করিয়াছিলেন Do you know she haunts me? এই স্পর্শকাতর চিত্তই মায়ের মৃত্যুর পরে পিতাকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং আহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। এই স্পর্শকাতর চিত্তই রেবেকার ছেলে মেয়ে ছিনাইয়া লইয়া রেবেকাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, "unprotected lone stepmother-কে দেখিয়া crest fallen—dumbfounded" হইয়াছিল। একদিকে ভোগ-বিলাসিতা, অমিতাচারিতা, আত্মাভিমানিতা অপরদিকে সমবেদনশীল চিত্তের স্পর্শকাতরতা (বন্ধুবৎসলতা মাতৃভক্তি 'পিতৃভক্তি' সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতিতে ব্যক্ত) অন্যদিকে মধুসূদনের মেধা বা মনস্বিতা এবং কল্পনা-শক্তি ও সহৃদয়তা। শেষোক্ত—হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের ক্ষমতাই (Genius) মধুসূদনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি গঠন করিয়াছিল। মধু কলেজে 'already a Pope' ছিলেন। এই কবি শক্তির আবির্ভাবই তাঁহার মধ্যে ক্রমে মহাকবি হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবল আবেগে পরিণত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যাওয়া ইংরেজ-মেয়ে বিয়ে করা—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষারই অনুপান বিশেষ। ইহারই উর্ধ্বচাপে মধুসূদন উৎকেন্দ্রিক হইয়া কক্ষচ্যুত হইয়াছিলেন।

এতখানি ভোগবিলাসিতা অমিতাচারিতা এবং অস্মিতা যাঁহার বাসনায়, এতখানি স্পর্শকাতরতা ও ভাবাবেগ যাঁহার হৃদয়ে এবং এত বড় কল্পনাশক্তি ও মেধা যাঁহার মস্তিষ্কে—আর সব কিছুর উপরে উদগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাঁহার প্রাণে, তাঁহার জীবনে ট্র্যাজেডির অবকাশ যথেষ্টই আছে।

এইরূপ ব্যক্তির জীবনে বৃত্তির সামঞ্জস্য-জনিত ভারসাম্যের অভাব অনিবার্য; স্বস্তি শান্তি—সুখের সহিত ইহাদের বিবাদ না ঘটিয়াই পারে না। অস্মিতা মধুসূদনকে বারবার আশ্রয়চ্যুত করিয়াছে, ভোগবিলাসিতা অভাবের ও ঋণের চাপে স্বস্তির নিশ্বাস লইতে দেয় নাই, অমিতাচারে—দেহ রোগ-জর্জরিত করিয়াছে, স্পর্শকাতর চিত্ত প্রতি পলে পলে আঘাত পাইয়াছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া হতাশা জাগাইয়া রাখিয়াছে, প্রতিভা স্বস্তিতে স্ফূর্ত হইতে পারে নাই—আত্মাভিমান মর্মান্তিক আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে—এই ভাবেই মধুসূদনের দুঃখ-দুর্দশার পাত্র নানা দিক দিয়া পূর্ণ হইয়াছে।

নাট্যকার মধুসূদনের সমস্ত সত্তাই কম-বেশী ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অস্মিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্পর্শকাতর চিত্তের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখাইবার চেষ্টাও মন্দ করেন নাই। তবে এই চেষ্টা সর্বত্র সমান সফল হয় নাই।

অনুভাব-সঞ্চারিভাব সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। অষ্টম দৃশ্যের শেষে—রঘু প্রবেশ করিয়া জানাইয়াছে —"মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন।" এই সংবাদের পর, মধুর প্রশ্নটি "কি হয়েছে মায়ের?" যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া বলা যায় না। তারপর—রাজনারায়ণ পথ রোধ করিবার পরে মধুর মধ্যে যে বাচনিক ও সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি দেখানো হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট বলা যায় না।

একটি ত্রুটি বেশী করিয়া চোখে পড়ে এবং তাহা এই যে—মধুসূদনকে আরো সচেতন, আরো মননশীল (introspective) আরো ভাবুক (brooding) করিবার যে সুযোগ ছিল, তাহা নাট্যকার গ্রহণ করেন নাই। ভাবে ও ভাবনায় মধুসূদনকে

আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ আছে। মাতাপিতার স্মৃতি, মধুসূদনের পিতৃসত্তা, অপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য হা-হুতাশ প্রভৃতি দ্বারা মাদ্রাজ প্রবাসী মধুসূদনকে আরো রসভাবসমুজ্জ্বল করা যাইত। পরবর্তী জীবনে, কবি-মধুসূদনে বা ব্যারিষ্টার মধুসূদনে শুধু অভাবের তাড়নাই দেখানো হইয়াছে—গভীর কোন দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠে নাই। অবশ্য বিংশ দৃশ্যে নাট্যকার চক্রবৃদ্ধি হারে এই দ্বন্দ্বের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকখানি কৃতকার্যও হইয়াছেন॥

রাজনারায়ণ

অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতার এবং তীব্রতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সমগ্র নাটকের মধ্যে 'রাজনারায়ণ চরিত্রটিই সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। **'মুন্সী-রাজনারায়ণ', 'পিতা-রাজনারায়ণ' 'পত্নী-অনুরাগী রাজনারায়ণ'**—এই তিনটি সত্তার সমবায়ে রাজনারায়ণ চরিত্রটি গঠিত হইয়াছে এবং মুন্সী-রাজনারায়ণ এবং পিতা-রাজনারায়ণের তীব্র দ্বন্দ্বই চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। পত্নী-অনুরাগী রাজনারায়ণকে একটি দৃশ্যে (একাদশ দৃশ্যে) পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বের পটভূমি করা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে পটভূমিটুকু জোরালো উদ্দীপক হইতে পারে নাই। পত্নী-অনুরাগ এবং আরো তিনবার বিয়ে—এই দুইটি ব্যাপারকে মূল রসের সহিত সমন্বিত করিতে হইলে রাজনারায়ণ-কে যেভাবে গাঁথিয়া তুলা দরকার, সেভাবে গাঁথিয়া তুলা হয় নাই। নাট্যকার এ বিষয়ে সচেতন বটে, কিন্তু খুব সতর্ক হন নাই। সতর্ক হইলে ষষ্ঠ দৃশ্যে—বংশরক্ষার আবেগকে আরো তীব্র রূপে প্রকাশ করিতেন এবং জাহ্নবীর মুখে "ঠিকই বলেছি—তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি"—এই উক্তিটি বসাইতেন না। উক্তিটি গাম্ভীর্যের হানি ঘটাইয়াছে। তারপর জাহ্নবীর প্রায়শ্চিত্ত করাইবার প্রস্তাবে রাজনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন উল্লিখিত উক্তির পরে তাহাকেও শুধু স্নেহাভিমানের প্রতিক্রিয়া বলিয়া উপলব্ধি হয় না। পিতা-রাজনারায়ণ এবং পত্নী-অনুরাগী রাজনারায়ণের সত্তা অক্ষুণ্ন রাখিতে আরো সতর্কতা আবশ্যক। বংশ রক্ষার জন্য বিয়ের পর বিয়ে, অকৃত্রিম পত্নী-অনুরাগের (জাহ্নবী অনুরাগের) পটভূমিতে এবং বংশ রক্ষার উদভ্রান্ত

আবেগের সহিত দেখাইতে না পারিলে, পিতা-রাজনারায়ণের গুরুত্বও সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নহে।

মুন্সী-রাজনারায়ণ—স্বভাবে—দৃঢ়চেতা এবং খুব অহংপুষ্ট ব্যক্তি, আর্থিক অবস্থায়—ধনী, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়—সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত এবং রুচিতে—প্রগতিপন্থী। মধুর সাহেবিয়ানা—(পোষাকে এবং আচারেও বটে) তামাক খাওয়া, মদ খাওয়া প্রভৃতি "Common punctilios" তিনি কালের ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন,—কেষ্টবন্দ্যো, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিতদের রক্ষণশীলরা "আচার ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার" "মানুষ তো নয় মদের পিপে এক একটি" বলিয়া ধিক্কার দিলেও তিনি তাঁহাদের "শিক্ষিত বলিয়া দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী" বলিয়াই মনে করেন। পিতা-রাজনারায়ণ এক মাত্র বংশধর—ছেলের মতো ছেলের—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—মধুর সব আবদারই পূরণ করেন, কিন্তু তাই বলিয়া পুত্র পিতাকে 'অমান্য' করিবে—রাজনারায়ণের মাথা ডিঙ্গাইয়া যাইবে 'মুন্সী-রাজনারায়ণ' তাহা বরদাস্ত করিতে নারাজ। মধুর বিবাহ—"রাজনারায়ণ যখন ঠিক করেছে, তখন আর 'যদি'র স্থান নেই"। তাঁহার কথার দাম—ষোল আনা; সেখানে পাই পয়সা এদিক ওদিক হইতে পারিবে না। তাঁহার কথার ও মতের কাছে—"ওসব চলবে টলবে না"......। মুন্সী-রাজনারায়ণ শক্ত মানুষ।

এই শক্ত-মানুষটির সহিত মধুর প্রথম সংঘাত বাধে এবং বাধে বিয়ের ব্যাপারে। মধু বলে—'পারব না' মুন্সী রাজনারায়ণ বলেন—"you must" "আমি কাল তোমার জবাব চাই definitely." দুই গোঁয়ে ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। বাপ্‌কা-বেটা মধু খ্রীষ্টান হইবার জন্য গৃহত্যাগ করে। রাজকৃষ্ণ বসাকের বাড়ীতে এই মুনসী-রাজনারায়ণের উগ্র মূর্তি দেখা যায়, তাঁহার ক্রোধ জ্বলিয়া ওঠে—"আমার ছেলেকে খৃষ্টান করবে।...খুন করে ফেলব সব—রাজনারায়ণ মুন্সীকে চেনেনা ব্যাটারা। লেঠেল আর শড়কিওয়ালা এনে আগুন ছুটিয়ে দেয়।"

পিতা-রাজনারায়ণ আর্তনাদ করেন—"সর্বনাশ হয়ে গেল আমার"। কিন্তু

তিনি মুন্সী-রাজনারায়ণ—যত আঘাত পাইয়াছেন তত তীব্র তাঁহার উত্তেজনা —সেই উত্তেজনায় তিনি রীতিমত অপ্রকৃতিস্থ—পুত্রের প্রতি দারুণ অভিমান সেই উত্তেজনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। ভিতরকার জ্বালায় বাহিরে আঘাত হানিতেছেন, জাহ্নবীকে আঘাত দিয়া বলেন—"আদর দিয়ে ছেলেকে মাথায় চড়িয়েছিলে—ছেলে এখন সেই মাথায় লাথি মেরে চলে গেল।" একটি 'উ.' এবং উচ্চৈঃস্বরে প্যাদ্রিকে আহ্বানে তাহার অন্তর্দাহ উৎক্ষিপ্ত হয়। উত্তেজনাব মুখ ফিরে—পাদ্রিদের দিকে —তর্জন গর্জনের রূপে বাহির হয়—"শালাদের দেখাচ্ছি আমি!"…"বাঘের বাচ্চা কেড়ে নিয়ে যাওয়া বরং সোজা, কিন্তু আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত।" কিন্তু জাহ্নবীর ভয়—'চটাচটি করলে তারা যদি বাছার কোন অনিষ্ট করে'। ভয় অমূলক নহে। কারণ ওরা সব পারে। পুড়াইয়া মারিতেও তাহারা পারে। এই ধরণের কথা শুনিয়া পিতা রাজনারায়ণের মধ্যে দুশ্চিন্তাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া —রাগতকণ্ঠে বলিলেও তিনি জাহ্নবীর কাছেই যেন আত্মসমর্পণ করেন—জিজ্ঞাসা করেন "কি করতে বল তুমি!" 'বুজিয়ে সুজিয়ে' ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে মুন্সী-রাজনারায়ণের উত্তেজনা বাড়িয়া যায়* [যাওয়া স্বাভাবিকই কিন্তু— আর্কডিকন ডেনট্রি এবং ব্রিগেডিয়ার পাউনিকে পদিপিসি ও শান্তমাসীর সহিত তুলনা করিয়া রাজনারায়ণ গাম্ভীর্যের হানি ঘটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কারণ ঐ দুইটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গেই হাস্য উদ্রিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; এখানে অভিনয়ের দ্বারা গাম্ভীর্যের ধারা রক্ষা করিতে পারিবেন—এমন অভিনেতা সুদুর্লভ] বুজিয়ে সুজিয়ের মধ্যে মুন্সী-রাজনারায়ণ নাই। তাঁহার সুস্পষ্ট জবাব—"সে আমি পারব না। এই ফিরিঙ্গি পাদরি ব্যাটাদের কাছে হাতজোড় করে আমি বলতে পারব না যে আমার ছেলেকে তোমরা ফিরিয়ে দাও দয়া করে। এ অসম্ভব আমার পক্ষে।" কিন্তু জাহ্নবী পায়ে ধরিয়া কাঁদেন—"প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি—শেষকালে কি মধুকেও হারাবো।" রাজনারায়ণ সহসা দ্রবীভূত হন—জাহ্নবীকে তুলেন—'পিতা-রাজনারায়ণ' একমাত্র বংশধরের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। মধু কি তাঁহারও সন্তান নয়। একদিকে জাহ্নবীর

অনুরোধ, পুত্রের নিরাপত্তা—অন্য দিকে পুত্রের উদ্ধারের জন্য লাঠিয়াল জমায়েৎ। মং। মুসকিলেই তিনি পড়েন।

সমস্যাই বটে। রাজনারায়ণের একমাত্র বংশধর মধু খ্রীষ্টান হইয়াছে শহরময় ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে। মুনসী-রাজনারায়ণের মাথা একেবারে হেঁট হইয়া গিয়াছে। মধুকে ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অগত্যা বিলাত গিয়া খ্রীষ্টান হবার জন্য যে ছেলেকে অনেক টাকা পাঠাইয়াছেন তাহাও মধু ফিরাইয়া দিয়াছে! "একমাত্র ছেলে হলেও খ্রীষ্টান ছেলে ঘরে নেওয়া যায় না।" জাহ্নবীর পায়ে পড়িয়া অবিরাম কান্না। মহাসংকট রাজনারায়ণের। অভিমানে বুক ভরিয়া উঠে। এতবড় আঘাত যে ছেলে দিতে পারে তাহাকে মাপ করিবেন কেন? পুত্রের কর্তব্য বলিয়া কি কিছু নাই? জাহ্নবী যতই কাঁদুক, যতই বলুক—পুত্রের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবেন সে লোক তিনি নহেন। কত বড় আঘাত মধুসূদন তাঁহাকে দিয়াছেন। একমাত্র বংশধর জলপিণ্ডের একমাত্র আশা" আর সেই আশারই সে ছাই দিয়াছে। "যে ছেলে খ্রীষ্টান হয়েছে—ধর্মতঃ তার মৃত্যু হয়েছে।" ক্ষুব্ধ অভিমানে রাজনারায়ণ চীৎকার করিয়া বলেন—"মাপ তাকে আমি করতে পারি না। খ্রীষ্টান হয়ে সে আমার ইহকালের মর্যাদা নষ্ট করেছে—পরকালের সদ্গতির পথ বন্ধ করেছে—সে আমার পুত্র নয়—শত্রু। 'তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি' এ অভিমান খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু জাহ্নবীর বিবাহের প্রস্তাবে—তাহার পরেও—রাজনারায়ণ যে প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন [৭২ পৃষ্ঠা—৭৪ পৃষ্ঠা] তাহা সমুচিত হয় নাই। জাহ্নবীর প্রতি অনুরাগ, মধুর প্রতি স্নেহ এবং বংশ রক্ষার ব্যাকুলতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রত্যাশিত, তাহা নাট্যকার ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। সব দিক বজায় রাখিয়া, আরো দুইবার বিবাহ দিতে হইলে যাহা করা দরকার—বিবাহ ব্যাপারটিকে যেভাবে হতাশ এবং বিক্ষিপ্ত চিত্তের ক্রিয়া রূপে দেখানো দরকার, তাহা দেখানো হয় নাই।

যাহা হউক রাজনারায়ণ আরো দুইবার বিবাহ করেন, কিন্তু যে আশায় করেন তাহা সম্পূর্ণ হয় না। আঘাতে—"কেমন যেন হয়ে গেছেন।" মদের

মাত্রা বাড়িয়াছে। ঘন ঘন বাইনাচ করাইয়া ভিতরের দুর্বলতা ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কিন্তু মধুর মতো ছেলেকে মন হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব. আত্মীয়ের অভিযোগের উত্তরে এই দুর্বলতা বাহির হইয়া পড়ে—"যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তাহলে ত পাগল হয়ে যাব আমি।" এ কথোপকথনে নানা সঞ্চারিভাবের মধ্যদিয়া স্নেহার্ত হৃদয় ব্যক্ত হয়। এখনও যে রাজনারায়ণ মধুকে কতখানি ভালবাসেন—বাহিরের রুক্ষ আচরণের অন্তরালে আজও সেই পুত্রস্নেহাতুর পিতা বসিয়া চোখের জল ফেলেন তাহা দেখা যায়।

অথচ সেই বহুবাঞ্ছিত পুত্র সম্মুখে আসিতেই ক্ষুব্ধ পিতৃ-অভিমান দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—ছোটখাটো দুই একটি শব্দের স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটিয়া যায়। **অষ্টম ও একাদশ দৃশ্যে**—রাজনারায়ণের পুত্রস্নেহকাতর অভিমান-ক্ষুব্ধ রূপটিকে ব্যাভিচারিভাবের সাহায্যেই সঞ্চারিত করা হইয়াছে। সংবেদনার দিক দিয়া এই দুইটি দৃশ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানে রাজনারায়ণ চরিত্রের ট্র্যাজেডি খুব তীব্রভাবেই সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে অনুভাবসঞ্চারি ভাবের—তথা ভাবদ্বন্দ্বের আরো উৎকর্ষ দেখানোর অবকাশ যে আছে—সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আলোচনার উপসংহার। নাট্যকার, নাটকের জাতি এবং নাটকের গঠন, রস ও চরিত্র সম্বন্ধে অল্পবিস্তারে যতখানি বলা সম্ভব, আশা করি, বলিতে পারিয়াছি। নাটকখানি যে সার্থক একখানি ট্র্যাজেডি-রসাত্মক চরিত-নাটক—এ সিদ্ধান্তে স্থির থাকিয়াই আমি তিলতণ্ডুল ন্যায় অনুসরণে গুণ অপেক্ষা দোষের উল্লেখ বেশী করিয়াছি—অর্থাৎ বেশী পরিমাণ তণ্ডুল হইতে অল্পসংখ্যক তিল বাছিয়া শ্রম লাঘব করিয়াছি। এই কারণে দোষের উল্লেখ গুণের উল্লেখের অপেক্ষা বেশী থাকায় কেহ যদি মনে করেন নাটকে গুণ অপেক্ষা দোষের মাত্রাই বেশী, তাহা হইলে নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক উভয়েরই প্রতি অবিচার করা হইবে। আশা করি কোন সহৃদয় পাঠক তাহা করিবেন না।

(সমাপ্ত)

পরিশিষ্ট

মধুসূদন সম্পর্কিত তথ্য—

১। জন্ম—১২ই মাঘ ১২৩০। ইং ১৮২৪ ২৫শে জানুয়ারী, শনিবার।

২। হিন্দু কলেজে শিক্ষা—১৮৩৭-১৮৪২ খ্রীঃ।

৩। পঞ্চদশায় কবিতা রচনা। (জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleaner, Calcutta Literary Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায়)

৪। ১৮৪৩ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই—খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দু কলেজ হইতে অন্তর্হিত। এই সময় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ৯ই ফেব্রুয়ারী খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন।

৫। ১৮৪৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বিশপকলেজের Secular Department-এ প্রবেশ (পিতা ১২০·০০ টাকা পাঠাইতেন)

৬। ১৮৪৭ শেষভাগে রাজনারায়ণ টাকা দেওয়া বন্ধ করেন।

৭। ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রথমেই—মাদ্রাজ গমন।

৮। Madras Male Orphan Asylum-এ ইংরেজী শিক্ষক। (রেবেকা বালিকা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন)

৯। রেবেকার সহিত বিবাহ—(২ পুত্র+২ কন্যা)

১০। 'Madras Circulator or General Chronicle' Spectator Athenaeum—সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। * এথেনিউম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন এবং "হিন্দু ক্রনিকেল" সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা করেন।

১১। মাদ্রাজ মহাবিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক।

১২। (১৮৪৮-৪৯) Madras Circulator-এ 'A Vision'—'Captive Lady'—প্রকাশিত হয়—Timothy Penpoem Esq. ছদ্ম নামে।

১৩। মাতৃবিয়োগ—১৮৫১

১৪। ১৮৫১ খ্রীঃ কার্যানুরোধে কলিকাতা আগমন এবং প্রচ্ছন্নভাবে কিছু দিন অবস্থান করিয়া মাদ্রাজ প্রত্যাগমন

১৫। পিতৃবিয়োগ— ১৮৫৫ খ্রীঃ

১৬। রেবেকার সহিত বিচ্ছেদ— ১৮৫৫ ,,

১৭। বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন ১৮৫৬ ,,

—পুলিশকোর্টে কার্যগ্রহণ ,, ,,

—দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত ,, ,,

—৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে অবস্থান ,, ,,

১৮। রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ— ১৮৫৮ ,,

* * * * *

১৯। **(প্রকাশিত গ্রন্থাবলী)**

১। শর্মিষ্ঠা—১৮৫৯

২। একেই কি বলে সভ্যতা

৩। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

৪। পদ্মাবতী নাটক

৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

৬। মেঘনাদ বধ কাব্য

৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক

৯। বীরাঙ্গনা কাব্য

১০। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

১১। হেক্টর বধ

অসম্পূর্ণ বাংলা রচনা

১। বীরাঙ্গনা (২য় ভাগ)

২। ব্রজাঙ্গনা ,,

৩। সিংহল বিজয় কাব্য

৪। পাণ্ডব বিজয় কাব্য

৫। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্য

৬। সুভদ্রাহরণ কাব্য

৭। মৎস্যগন্ধা (কাব্য)

৮। বিষ না ধনুর্গুণ নাটক

৯। নীতিমূলক কবিতাবলী

১০। রিজিয়া (নাট্যকাব্য)

১১। বিবিধ কবিতাবলী

ইংরাজী রচনাবলী

(1) Captive Lady (Poem)

(2) Visions of the Past (Do)

(3) Rizia (Drama)

(4) Sermista (Drama Translation)

(5) Ratnavali (Do)

(6) Nildarpan (Do)

(7) Tillottama (Poem)

(8) Queen Sita (Do)

(9) Upsori (Do)

(10) Miscellaneous Poems (Do)

* * * * *

২০। য়ুরোপ গমন—১৮৬২

২১। য়ুরোপ-প্রবাস—[১৮৬২-৬৫]

[১৮৬৫—ভার্সাই নগরে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"-রচনা]

২২। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—১৮৬৬

২৩। স্বদেশ-যাত্রা—১৮৬৭, ৫ই জানুয়ারী

২৪। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়—১৮৬৭

২৫। হেনরিয়েটার কলিকাতা আগমন—১৮৬৯, মে মাস

২৬। ৬ নং লাউডন ষ্ট্রীটে দ্বিতল-ভবনে গমন। ৩ বৎসর অবস্থান

[ভাড়া ৪০০'০০]

২৭। ১৮৭২ খ্রীঃ বেনিয়াপুকুর রোডে অবস্থান

২৮। আট মাস পঞ্চকোটে চাকরী—

ঢাকা গমন [সেপ্টেম্বর ১৮৭১, ফেব্রুয়ারী ১৮৭২]

২৯। ১৮৭৩ খ্রীঃ—এপ্রিল, উত্তরপাড়ায় [দেড় মাস]

৩০। বেনিয়াপুকুরের বাসায় প্রত্যাগমন—

জেনারেল হাসপাতাল গমন—মৃত্যু, ২৯শে জুন, রবিবার